A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের সুব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ ও জীবন-নৈপুণ্য গড়ে তোলার জন্য অবশ্যপাঠ্য বই

ইস্কুলে যা পড়ানো হয় না

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

গল্প উপন্যাসের চেয়ে ২০০০ সালের ছেলেমেয়েদের জীবনে বড় হয়ে উঠেছে কঠিন কঠোর রূঢ় বাস্তবতা। তীব্র প্রতিযোগিতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিশ্বায়নের খোলা জানালা দিয়ে ঝড়ের মত হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে অপসংস্কৃতি। অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতিপঙ্কিল সমাজ জীবনে বদ্ধ দমবন্ধকর পরিবেশে রোল মডেল বলতে এখন হয় চিত্রতারকা না হয় ক্রিকেট তারকা।

এই অবস্থায় আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে তাদের জন্য কলম ধরছেন একজন সাংবাদিক লেখক। জীবনসন্ধ্যায় এসে তিনি দেখেছেন, এই নেতিবাদী জীবনধারা থেকে আজকের প্রজন্মকে বাঁচাতেই হবে। তিনি বলছেন আমি বহু ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের মধ্যে হতাশ হইনি, আপনারাও হতাশা হবেন না। যারা বড় হতে চাও তাদের জন্য লেখকের পথনির্দেশ :

ইস্কুলে যা পড়ানো হয় না।

ইস্কুলে যা পড়ানো হয় না

ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের সুব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ ও জীবন-নৈপুণ্য
গড়ে তোলার জন্য অবশ্যপাঠ্য বই

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

Maitreyee
01.07.12

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

41, Aziz Super Market
TAXILA
Tel: 9560158

ISKULE JA PARANO HOY NAA
The subjects which are not tought in School in Bengali
by DR. PARTHA CHATTOPADHYAYA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 70.00

ISBN 81-295-0150-3

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩, ভাদ্র ১৪১০
পঞ্চম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬

প্রচ্ছদ : মিলন বন্দ্যোপাধ্যায়

৭০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার জীবনবাদী আন্দোলনের দুই সহযোগী

শঙ্করশ্রী সুদীপ্ত বিশ্বাস

ও

শ্রীমতী রেবা মুখার্জি বিশ্বাসকে

এই লেখকের বিভিন্ন বই

আত্মবিকাশ গ্রন্থমালা

হতাশ হবেন না (১ম) (হতাশার ঊর্ধ্বে জীবনবাদ প্রতিষ্ঠার বই।)
হতাশ হবেন না (২য়) (ব্যক্তিগত জীবনে অবসাদ ও মনোবেদনা দূর করার উপায়।)
হতাশ হবেন না (৩য়) (দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি।)
হতাশ হবেন না (৪র্থ) (অশান্তি থেকে মুক্তি।)
হতাশ হবেন না (৫ম) (কর্মজীবনে অশান্তি থেকে মুক্তি ও কর্মদক্ষতা অর্জন।)
হতাশ হবেন না (৬ষ্ঠ) (পরিপূর্ণ জীবনের পথ নির্দেশ।)
কেমন করে মানুষ চিনবেন? (মানুষ চেনার ওপর নতুন ধরনের বই।)
কেমন করে বাস্তববাদী হবেন? (বাস্তবজীবনে চলার পথে পথনির্দেশ।)
যারা বড় হতে চাও (বড় হওয়ার পথনির্দেশ। প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর অবশ্যপাঠ্য।)
হতাশ হইনি (১ম)
আপনি ও আপনার ব্যক্তিত্ব
কেমন করে আত্মবিশ্বাস বাড়াবেন
কলেজে যা শেখানো হয় না
বেচো ভাই বেচো

উপন্যাস ও ছোটগল্প

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প / লেখকের ৩০টি জনপ্রিয় গল্পের সংকলন
নির্বাচিত সরস গল্প
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঃ শেষ অমৃত / ঠাকুরের শেষ জীবন অবলম্বনে উপন্যাস
থ্রিলার সমগ্র

সাংবাদিকতার বই

বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (নতুন সংশোধিত ৩য় সংস্করণ)
বিষয় সাংবাদিকতা (সংশোধিত ৫ম সংস্করণ)
গণজ্ঞাপন (২য় সংস্করণ)। বিষয় বিজ্ঞাপন

কিশোর সাহিত্য

ভৌতিক অমনিবাস (লেখকের সমগ্র ভৌতিক ও অলৌকিক গল্প সংকলন)
রাশি রাশি হাসি (ছোটদের হাসির গল্প)
রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য অমনিবাস
মজার মজার গল্প
কিশোর গোয়েন্দা গল্প
মিশন ০০৩
ফেলুমামার সপ্তকাণ্ড
ফেলুমামার আরও কাণ্ড
বাজপাখির চোখ, ভূত-অদ্ভুত

চিন্তামূলক প্রবন্ধ

সাম্প্রদায়িকতা সংস্কৃতি ও জীবন

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

হতাশ হইনি (২য়)
সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা ও লেখালেখি

রস-নাটক

স্বর্ণভিলা
দুশো রজনী অভিনীত। বেতার ও দূরদর্শনে প্রচারিত ও দিশারী পুরস্কারে ভূষিত।
আমেরিকার বহু সাহিত্য সম্মেলন ও কলকাতা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক সম্মেলনে অভিনীত।

লেখকের কথা

গত কয়েকবছর ধরে আমার জীবনবাদী বইগুলি পড়ে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা আমাকে চিঠি নিয়ে অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, তাঁরা আমার কাছে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং বা পরামর্শ নেবার জন্যও এসেছেন। এঁদের একটি বড় অংশ ছাত্রছাত্রী। এঁদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যার কথা শুনে শুধু কলেজ ও ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে পরামর্শমূলক বই লেখার পরিকল্পনা করি। এর মধ্যে কলেজে যা শেখানো হয় না বইটি ২০০২ সালে প্রকাশিত হয় ও বেস্ট সেলার হিসাবে গণ্য হয়। তারপরেই আমি ইস্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বইটি লেখার কাজে হাত দেই। শুনলাম রাজ্য সরকার স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে জীবন-নৈপুণ্যমূলক অতিরিক্ত পাঠ্যসূচি ইস্কুলে প্রবর্তন করতে চলেছেন। এতে আমি উৎসাহ পেলাম। কারণ আমি যে-যে বিষয় এই বইতে আলোচনা করেছি তার মধ্যে অনেকগুলিই রাজ্য সরকারের পরিকল্পিত লাইফ স্কিল পাঠ্যসূচির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

আমার এই বইটি মূলত বয়ঃসন্ধির সমস্যা নিয়ে। এই সমস্যা প্রধানত ভাবগত বা ইমোশনাল। এই বয়সে দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনোজগতে বিরাট আলোড়ন ঘটে। তখন ছেলেমেয়েদের কিছু-না-কিছু মানসিক শক্তি অর্জনের জন্য একজন পথ নির্দেশক দরকার। অনেক কথা তারা বাবা-মা শিক্ষককে বলতে পারে না। তা ছাড়া বহু বাবা-মা সন্তানকে বোঝেন না। হয় বুঝতে চান না, না-হয় বোঝার ক্ষমতা নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠান সিপডাভে পেরেন্টিং বা সন্তান মানুষ করা নিয়ে বাবা-মায়েদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করছে কিন্তু বাবা-মাকে বাদ দিয়েও ছেলেমেয়েদের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সেই জগতে একমাত্র কাউন্সেলরই ঢুকতে পারে। তাই এই বই। আর এই পড়ার পর নানা প্রশ্ন মনে আসতে পারে। ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের হদিশ অনেকেই চাইতে পারে। তাদের জন্য শান্তম কাউন্সেলিং সেন্টার—যা আমি গত এক বছর ধরে আমার বাড়িতে চালাচ্ছি ও নানা বয়সের মানুষজনকে পরামর্শ দিয়ে তাঁদের অনেক ভ্রান্তি দূর করেছি ও কিংকর্তব্যম সেটা বলেছি। এই সেন্টারে আসতে গেলে শুধু আগে থেকে ফোনে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, আমার পূর্ব প্রকাশিত ইস্কুলে যা শেখানো হয় না (প্রকাশক দে'জ নন, অন্য এক প্রকাশক) বইটির সঙ্গে এই বইটির কোনও

সম্পর্ক নেই। ওই বইটি দায়সারা ভাবে ছাপা, জঘন্য প্রচ্ছদ, এমনকী, অসমাপ্ত অবস্থায় বাঁধাই আমাকে আমার পাঠকদের কাছে হেয় করেছে। এ নিয়ে আমার আইনজ্ঞ ওই প্রকাশককে চিঠি দিয়েছেন। আমি চাই না ওই বইটির আর প্রচার হোক।

যে সব ছেলেমেয়ে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে, হয় খুব ছটফটে হয় না-হয় একদম চুপচাপ থাকে, যারা পড়াশোনায় মন বসাতে পারে না, যা পড়ে তা মনে রাখতে পারে না, বাবা-মায়ের ওপর রাগ-অভিমান দেখায়, বাবা-মায়েরা তাদের সম্পর্কে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাদের Problem child বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমি এমন অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তারা আদৌ কোনও সমস্যা নয়। কারণ না-থাকলে কার্য হয় না, তাদের এমন প্রথাবিরোধী ব্যবহারর পিছনে কোনও না কারণ আছে। সেই কারণটা খুঁজে বার করে তার প্রতিকার করতে পারলেই এই সব ছেলেমেয়েরা আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

ক্লাস এইট নাইনে পড়ার সময়ই প্রবণতা অনুসারে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবিকা বেছে নেওয়ার হদিশ দিতে হয়। তাদের একটা লক্ষ্য স্থির করে দিতে হয়। শান্তম কাউন্সেলিং সেন্টার ছেলেমেয়েদের এই পথেরই হদিশ দেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই বই-এর বিষয়গুলি নিয়ে কর্মশালা করতেও পারেন। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শান্তম
বিসি ১১৮ সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৬৪
ফোন ২৩৩৭ ৩৯১২

সূচিপত্র

এক : **আমি বাড়ছি মাম্মি** ৯—১৮
বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা। হঠাৎ আলো। বয়ঃসন্ধির সময় মনের অবস্থা।

দুই : **যারা খুব লাজুক** ১৯—৩১
ছেলেমেয়েরা লাজুক ও মুখচোরা হয় কেন? কেমন করে বক্তৃতা দেবে। ভাল শ্রোতা হবার ট্রেনিং।

তিন : **আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়** ৩২—৪৬
আত্মবিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা পদ্ধতি। ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা—বিশ্বসৃষ্টির রহস্য। বিবর্তনের কথা। অসীম শক্তির প্রতীক সূর্য। আত্মবিশ্বাস থেকে আসে ভালবাসা।

চার : **প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস** ৪৭—৫৫
কীভাবে অনুশীলন করতে হয়; সুঅভ্যাস

পাঁচ : **বাড়ি থেকে পালিয়ে** ৫৬—৬৭
কেন ছেলেরা বাড়ি থেকে পালায়? যারা পড়াশোনায় ড্রপআউট হয়। মনের বয়স ও আসল বয়স।

ছয় : **শাবাশ অমিতাভ বচ্চন**
অমিতাভ বচ্চন ও বড় বড় মানুষের ৬৮—৭৬
বাবা-মায়ের প্রতি ভালবাসা।

সাত : **তুমি ও তোমার বন্ধুরা** ৭৭—৮৭
বন্ধুত্ব কীভাবে করতে হয়। ভাল বন্ধু ও খারাপ বন্ধু।

আট : **কুসঙ্গ ও সুসঙ্গ** ৮৮—৯২
কুসঙ্গ থেকে কিশোর অপরাধী : কয়েকটি ঘটনা।

নয় : **তুমি ও তোমার ভাবমূর্তি** ৯৩—১০৩
কীভাবে তোমার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলবে। সুব্যক্তি গড়ে তোলার টিপস। মূল্যবোধের শিক্ষা।

দশ : **উৎসাহ-উদ্দীপনা** ১০৪—১১২
কীভাবে প্রাণশক্তি অর্জন করবে।
সফল স্বপ্ন দেখতে শেখা।

এগারো : **উদ্দেশ্য ও বিধেয়** ১১৩—১২২
জীবনের উদ্দেশ্য কীভাবে ঠিক করবে ও সেইমতো কীভাবে এগিয়ে যাবে? বই পড়ার নেশা তৈরি করা। অযথা তর্কে জড়িয়ে না পড়া। ছোটখাটো আনন্দের সন্ধানে। ছোটখাটো বিষয়ের মধ্যে প্রাণের আনন্দ খুঁজে নেবে কী ভাবে?

বারো : **আত্মমর্যাদার সন্ধানে** ১২৩—১২৯
আত্মমর্যাদা কীভাবে রক্ষা করবে। আত্মমর্যাদাবোধ বনাম অহংকার। আত্মনির্ভরশীলতা : আত্মমর্যাদার সোপান।

তেরো : **অহংকার থেকে পতন** ১৩০—১৩৯
কয়েকজন অহংকারী লোকের কীভাবে পতন ঘটল। অহংকারী জাতির দর্পচূর্ণ। অন্ধ জাতীয়তাবাদ ছাড়িয়ে মানবতাবাদের পথে।

চোদ্দ : **তোমার চলার পথের কিছু রসদ** ১৪০—১৫৬
এডস সম্পর্কে সচেতনতা। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কিছু একান্ত টিপস।

পরিশিষ্ট ১৫৭—১৫৯

এক

আমি বাড়ছি মাম্মি

> Puberty এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন *Puberts* থেকে। এর অর্থ কৈশোর থেকে পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হবার সময়। একটি জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ কাল। দুই থেকে চার বছর এর সময়সীমা।
>
> —*ডেভলপমেন্ট সাইকোলজি*
> এলিজাবেথ বি. হারলক

একটি পুষ্টিকর পানীয়ের বিজ্ঞাপনটি সবাই দেখেছ। একটি ফুটফুটে ছেলে আর একটি ফুটফুটে মেয়ে মাকে বলছে 'দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি'।

ধরো শোভন আর ঝুমা দুই ভাই-বোন। দুজনেরই বয়স চোদ্দ। ওরা দুজনে পড়ে ক্লাস নাইনে। কোন পুষ্টিকর পানীয় না-খেয়েই তারা কিন্তু বলতে পারে 'আমি বাড়ছি মাম্মি।' সত্যিই তো তারা বাড়ছে আর বাড়ছে। দশবছর বয়স থেকেই তাদের চেহারা বদলাচ্ছে। শোভনের একটু-একটু গোঁফ দাড়ি উঠেছে। বেশ লম্বায় বেড়েছে। দশবছর বয়স পর্যন্ত ওর মায়ের আক্ষেপ ছিল শোভনটা বুঝি আর লম্বা হল না। অথচ তিনি বেশ লম্বা। উচ্চতা পাঁচফুট তিন। মেয়েদের পক্ষে ভাল হাইট বই কী। আর শোভনের বাবা তো পাঁচ-আট। শোভন কিন্তু রোগা ছিল। আর হাইটও তেমন বাড়ছিল না। চোদ্দয় পা দিতে-না-দিতে বেশ লম্বা হতে লাগল। শরীরটাও সারল।

আর ঝুম্পা এখন ফ্রক ছেড়ে শালোয়ার কামিজ ধরেছে। তারও চেহারায় লাবণ্য এসেছে। এখন বেশ সলজ্জ। ছোটবেলায় নিজে থেকেই লোকের সঙ্গে যেচে কথা বলত। এখন একটু চুপচাপ হয়ে গেছে। এর মধ্যে কোথা থেকে শাহরুখ খানের একটি পোস্টার জোগাড় করে সেটা তার পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে। সব সময় সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার হিরো। আগে তার মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগত। তার বন্ধুর সংখ্যা কম নয়। তবে প্রাণের বন্ধু গোটা চারেক। মমিনা, তুলিকা আর সোনালি। ইদানীং যোগ হয়েছে একটি ছেলে। শুভ্র। শুভ্রকে খুব ভাল লাগে ঝুম্পার। রবিবার বা ছুটির দিন পড়লে শুভ্রকে ফোন করে। মমিনা তুলিকা ও সোনালিরও বন্ধু শুভ্র। তবে কেন জানে না ঝুম্পা চায় শুভ্র শুধু তারই সঙ্গে কথা বলুক।

ওরা সবাই এক ক্লাসে পড়ে বলে বেশির ভাগ সময় পড়াশোনা নিয়ে গল্প করে। অন্যান্য সহপাঠী-সহপাঠিনীদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা, ছোটখাটো মজার মজার ঘটনা নিয়েও গল্প হয়।

ওরা ভবিষ্যতে কে কোন কেরিয়র বেছে নেবে সে সম্পর্কে ওদের ভাল ধারণা নেই। শোভনের বাবা-মা তো বলেই রেখেছেন শোভন হবে ডাক্তার।

দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র ছেলে বলে শুভ্র-র দুই মাসি, তিন মামা-মামি, দাদু দিদা সবারই চোখের মণি শুভ্র। কিন্তু ও শুনেছে ডাক্তার হতে গেলে মড়া কাটতে হয়। মরা মানুষ দেখলেই তার ভয় করে ; তার ওপর আবার তাকে কাটা। তা ছাড়া ডাক্তারদের তার পছন্দ নয়। তার বন্ধু চন্দনের বাবা ডাক্তার। কিন্তু চন্দনই বলে, বাবার একদম সময় নেই তার সঙ্গে গল্প করার। সেই সকাল আটটায় হাসপাতালে বেরিয়ে যান। সন্ধের পর চেম্বার-টেম্বার সেরে বাড়িতে ফিরে চান টান করে চলে যান ক্লাবে। শুভ্রর একটি মেয়েকে খুব ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে আলাপ তার মাসির বাড়িতে। মাসির দেওরের মেয়ে তৃণা। সে ক্লাস এইটে পড়ে। ইংরেজিতেই কথা বলে। শুভ্ররও ইংলিশ মিডিয়ম। তবে সে ইংরেজির চেয়ে বাংলায় কথা বলতেই ভালবাসে। বাংলা গল্পর বইও কয়েকটি পড়েছে।

শুভ্রর মনে এখন ধারণা হতে শুরু করেছে তার বাবা-মা মোটেই বুঝতে চান না সে এখন বড় হয়েছে। তাঁরা অকারণে খিটখিট করেন। বিশেষ করে মা। খেলে ফিরতে এত দেরি হল কেন? এত বেলা পর্যন্ত ঘুম কীসের? বারণ করে দিয়েছি না রবিবার ছাড়া টিভি দেখবি না। যা পড়তে বোস। দেখি কী হোম টাস্ক দিয়েছে।

যখন তুমি বাড়ছ

* কৈশোরে দুধরনের গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন নিঃসারিত হয়। এই দুধরনের হরমোন দেহের নানা পরিবর্তন আনে।

* আমেরিকায় মেয়েদের ঋতুমতী হবার গড় বয়স সাড়ে বারো থেকে সাড়ে চোদ্দ। তবে আমাদের মত গরম দেশে মেয়েরা তার আগেই ঋতুমতী হয়ে পড়তে পারে। এজন্য অবাক হবার কিছু নেই। ছেলেদের দৈহিক ম্যাচিওরিটি আসে ১৪ থেকে ১৬ বছরে মধ্যে।

* বয়ঃসন্ধির সময়কার দৈহিক পরিপুষ্টি অনেকটা জলবায়ু ও পুষ্টিকর খাদ্যের ওপর নির্ভর করে। সচ্ছল পরিবারে ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় যারা খুব ভাল খাদ্য খেয়ে বড় হয়ে ওঠে বলে, তাদের ম্যাচিওরিটি বা কৈশোরের পূর্ণতা ঠিক সময় অথবা তাড়াতাড়িই আসতে পারে। তবে বয়স অনুসারে কৈশোরের পূর্ণতা না-এলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া ভাল।

* বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেমেয়েরা খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে। তারা লম্বায় যেমন বড় হয়ে ওঠে, ওজনেও তেমনি বাড়ে। বয়ঃসন্ধির শেষে যৌবনে অর্থাৎ আঠারো বছরের পর থেকে তাদের বাড়ার গতিটা আবার কমতে থাকে।

একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে বাবার সিগারেট-প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল শুভ্র। মা বাড়ি ছিলেন না তখন। ফিরে এসে প্রায় দুঘণ্টা পরে মুখের

গন্ধ শুঁকে ঠিক ধরে ফেলেছেন। তুই সিগারেট খেয়েছিস? ইশ, কী বিশ্রী গন্ধ। তোর এতখানি অধঃপতন হয়েছে! তারপর কেঁদে-কেটে একশা। বাবা ফেরার পরই রিপোর্ট। বাবা সঙ্গে সঙ্গে কষে এমন একটা চড় কষালেন যে অভিমানে চোখে জল এসে গেল শুভ্রর। দাউ টু ব্রুটাস!

সেই থেকে নানা কারণেই বাবা-মায়ের ওপর রাগ। ইচ্ছে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অথবা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে। খবরের কাগজে এমন ঘটনার কথা প্রায়ই বেরোয়।

দেহের মধ্যে একটা পরিবর্তন প্রায়ই লক্ষ করে শুভ্র। স্নান করার সময় নিজেকে বারবার দেখে। সর্বাঙ্গে উত্তেজনা হয়। উত্তেজনা দমনের জন্য স্বমেহন করে। উত্তেজনা সাময়িকভাবে কমে। কিন্তু তারপরই মনে হয় এটা কী করলাম। এতে যদি দেহের ক্ষতি হয়। শরীর খারাপ হয়ে যায়? মা যদি জানতে পারে।

ঝুম্পা সেদিন আতঙ্কে কেঁদে ফেলেছিল যেদিন সে দেখল তার ইজের রক্তে ভিজে গিয়েছে। মনে হয়েছিল তার পেটের মধ্যেই বোধ হয় গভীর ক্ষত হয়েছে। যদিও তার মা বলেছিলেন, একটা বয়স হলে মেয়েদের নাকি প্রতি মাসে এমন হয়। তিন-চারদিন এমন অস্বস্তি থাকে। তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই সময়টা একটু সাবধানে থাকতে হয়। বাইরে না বেরুনোই ভাল। কিন্তু ইস্কুলে তো যেতে হয়। কিন্তু কী লজ্জা কী লজ্জা! আর সব মেয়েরা যদি বুঝতে পারে। কিন্তু তবু ভাল কেউ এ নিয়ে কোনও কথা বলেনি। তবে ঝুম্পা বুঝেছে সব মেয়েই এই সমস্যায় ভুগছে। তবে কেউ কিছু সরাসরি কিছু বলে না।

ঝুম্পার সঙ্গে তার মায়ের যেমন ভাব তেমনি খটাখটিও। মায়ের একটা দামি শাড়ি পরতে ইচ্ছা হলে মা বলবেন, না তুই নষ্ট করে ফেলবি। মা এখনও মনে করেন মেয়ে আমার সেই ছোট্টটি আছে। তা ছাড়া সব সময় টিকটিক। এটা কোর না, ওটা কোর না। একা একা বন্ধুর বাড়িতে যেও না। বাবা পৌঁছে দিয়ে আসবে। কোন বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছ বলে যাও। তার টেলিফোন নম্বর রেখে যাও। ইস্কুলের মেয়েরা সব এক্সকারসানে যাচ্ছে কৃষ্ণনগর। ঝুম্পার বাবা ঝুম্পাকে যেতে দেবে না। সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকা। মেয়ে বড় হচ্ছে।

এ গল্প কম-বেশি সব ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের। যাদের বয়স বারো পেরিয়েছে কি পেরোয়নি, ছেলে হোক মেয়ে হোক তাদের জীবনের নানা সমস্যার শুরু এই সময় থেকে। কারণ এটা নাকি জীবনের একটা বাঁক—ইংরেজিতে বলে টার্নিং পয়েন্ট। শৈশব চলে গিয়ে কৈশোর আসছে। একেই বলে বয়ঃসন্ধি। ইংরেজিতে কত বই, কত গবেষণা-গ্রন্থ লেখা হচ্ছে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা বুঝতেই পারে না। কখন বয়ঃসন্ধি এল, চলে গেল। তারা শুধু টিভির বিজ্ঞাপনের ছেলেমেয়ে দুটির মতো শুধু শরীরের দিক

থেকে বেড়েই গেল।

অথচ এই বয়সটাই হল জীবনের এক সংকটকাল। একে বলে ধারণা ও বোধ জন্মাবার কাল। ছেলেমেয়ে যদি বিপথে যায় বা বখে যায় এই বয়স থেকেই যায়। যদি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে, এই বয়স থেকেই শোনা যায় তার অনাগত পায়ের ধ্বনি। মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে এই বয়সে। ১০ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। ঠিক আঠারো বছরে পড়ার আগে। আঠারো বছরে প্রথম যৌবনের প্রস্তুতি ১০ থেকে শুরু হয়ে যায়। যেমন জ্যৈষ্ঠের ফলের প্রস্তুতি মাঘ থেকেই দেখা দেয় বউলের মধ্য দিয়ে। সেই যে কথায় আছে, সকাল দেখেই বোঝা যায় সারাদিনটা কেমন যাবে। কৈশোর এই বয়ঃসন্ধিরই প্রস্তুতি।

এই বয়সেই দরকার ইস্কুলের সিলেবাসের বাইরে সারা জীবনের জন্য চরিত্র, মন ও মূল্যবোধ গঠনের শিক্ষা।

কিন্তু ইস্কুলে সে শুধু শেখে অর্থকরী শিক্ষা অর্থাৎ যা ভাঙিয়ে ভাল চাকরি-বাকরি পাওয়া যায়। বাবা-মা পাড়া-প্রতিবেশী থেকে ইস্কুলের মাস্টারমশাই ও দিদিমণিরা সবাই বলেন, এমন লেখা-পড়া শেখো যাতে সঙ্গে সঙ্গে মোটা মাইনের চাকরি জুটে যায়। যথার্থ মানুষ হবার শিক্ষা তাই ছেলেমেয়েদের নিজেদেরই নিতে হয়। কারণ এ শিক্ষা আর কেউ দেবার নেই। এসব তো ইস্কুলে পড়ানো হয় না। তাই নিজেদেরই পড়ে নিতে হয়।

ওরে ও খেয়ালি

তোমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে খামখেয়ালি ভাব জাগে অর্থাৎ মাঝেমাঝেই এক একটা খেয়াল চাপে এই কাজটা করব অথচ সে কাজটার সঙ্গে তোমার স্বাভাবিক ব্যবহারের কোনও সম্পর্ক নেই। অথবা সে কাজটায় বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যও নেই। এটা কিন্তু বয়ঃসন্ধির ধর্ম।

বয়ঃসন্ধি প্রথম শুরু হয় দশ-এগারো বছর বয়সে। তুমি যখন ক্লাস ফোরে অথবা ফাইভে পড়ো তখন থেকেই। এই বয়সটা তোমরা সবাই পেরিয়ে এসেছো। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত যে বয়সটা সেটা প্রাথমিক বয়ঃসন্ধির কাল।

এই সময়টায় খামখেয়ালি ভাবটা একটু বেশি থাকে। হঠাৎ ইচ্ছে হল ঘুড়ি ওড়াবে। কিছুদিন ঘুড়ি ওড়ানো নিয়েই মেতে থাকলে। এই বয়সটায় বেশির ভাগ সময় বাইরে টো-টো করে ঘুরতে ভাল লাগে। গ্রামের ছেলেদের স্বাধীনতা একটু বেশি। তারা এই বয়সে আমের সময় ঢিল ছুড়ে আম পাড়ে। কুলের সময় কুল পেড়ে খায়। পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে।

আমি গ্রামের ছেলে ছিলাম। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এর ওর বাগানে গিয়ে আম কুড়িয়েছি। একবার এক আমবাগানে তারকাঁটার বেড়া ডিঙোতে গিয়ে পায়ের

অনেকখানি কেটে গিয়েছিল, সে দাগ এখনও রয়েছে।

একবার তো আমার মামার বাড়ির গ্রামে দুপুরবেলা আমবাগানে আমকুড়োতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে এক কুকুরের পিঠে পা দিতেই কুকুরটা দিল ঘ্যাঁক করে কামড়ে।

তারপর ভোগান্তির এক শেষ। তখনকার দিলে গ্রামের লোকেরা কুকুরে বা সাপে কামড়ালে ওঝা বা গুণিনের কাছে যেত। বাবা আমাকে কলকাতায় এমনি এক গুণিনের কাছে নিয়ে গেলেন। ওঝা একটা থালায় বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে আমার পিঠে লাগিয়ে দিয়ে বলল : যদি বিষ থাকে এই থালাটা পিঠে আটকে যাবে। ওমা, সত্যি থালাটা পিঠে আটকে গেল! তারপর ওঝা আবার মন্ত্র পড়তে লাগল বিড়বিড় করে। কিছুক্ষণ পরে থালাটা পিঠ থেকে খসে গেল। ওঝা বলল : আর ভয় নেই। বিষ চলে গেছে। সেটাই জানান দিয়ে গেল।

প্রথম বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছু প্রকাশ করার জন্য মন আকুলি বিকুলি করে। তোমাদেরও নিশ্চয়ই করেছে বা এখনও করে—। অনেকে বেশি কথা বলতে ভালবাসে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ পেলে তো সোনায় সোহাগা। অনেকে এই বয়সে কিছু না কিছু লিখতে শুরু করে। আর এই বয়সে সবচেয়ে যা লেখা সোজা তা হল কবিতা। রবীন্দ্রনাথও এই বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন।

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমার মধ্যে লেখা আর বকবক করার ইচ্ছে প্রবলতর হয়।

প্রথমে লিখে ফেললাম একটি নাটক : হরিশ্চন্দ্র। পাড়ার সমবয়সীদের নিয়ে একটি দল করলাম। তারপর অভিনয় করলাম হরিশ্চন্দ্র। রাজা সাজার উপকরণ ছিল মায়েদের রঙিন শাড়ি কাছা দিয়ে পরা। মুখে পাউডার মেখে কাজলের কালি দিয়ে রাজা, মন্ত্রী এমনকী, পারিষদদেরও গোঁফ আঁকা হল। পেঁপের গাছের ডালকে করা হল তরবারির খাপ। তার ভেতর বাঁশের কঞ্চি ঢোকালেই সেটা তরবারি। উঠোনে চাটাই পেতে যাত্রার আসর তৈরি। সবচেয়ে যেটা কঠিন কাজ ছিল সেটা দর্শক জোগাড় করা। পাড়ার খুদে ছেলেমেয়েদের কুড়িয়ে কাড়িয়ে এনেও আটদশজনের বেশি দর্শক পাওয়া যেত না।

কিন্তু তাতে উৎসাহ দমেনি। যদিও আমার নাটকের সংলাপ এবং দৃশ্যগুলি অভিনেতারা মেনে চলত না। তারা তাদের মনে যা আসত সেটাই সংলাপের মতো করে বলে যেত। দর্শকেরা বেশি করে চাইত উত্তেজনা। আর যুদ্ধ না হলে কি উত্তেজনা হতে পারে। তাই কথায় কথায় তরবারির লড়াই শুরু হয়ে যেত। তরবারি

অর্থাৎ কঞ্চির খোঁচায় মাঝেমাঝে যে নাটকের পাত্রপাত্রীরা চটে যেত না তা বলতে পারি না। এমনও হয়েছে, রাজা হরিশ্চন্দ্রই হয়তো আর খেলব না বলে মুখের রং টঙ মুছে বাড়ি চলে গেছে। নাটক পণ্ড হয়েছে।

আর একটি অভ্যাস পেয়ে বসেছিল আবোল-তাবোল বকা। বাড়িতে কেউ না থাকলে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকদের শোনানোর জন্য আমি বক্তৃতা দিয়ে যেতাম। যা মনে আসত তাই বলতাম। আর মনে হত আমার কথা শোনার জন্যই রাস্তার লোকেরা ঠিক ওই সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

বয়ঃসন্ধির এই সব আবোল-তাবোল আচার-আচরণ যাকে আমরা ছেলেমানুষি বলি। এই ছেলেমানুষি কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হল যদি এই সব ছেলেমানুষি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনেও থেকে যায়।

যখন তুমি বাড়ছ

* শৈশব আর যৌবনের মাঝখানের সময়টাকে বলে কৈশোর। বেড়ে ওঠার মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় PUBETRY—পিউবেট্রি। এই সময় ছেলেমেয়েদের যেমন দেহের পরিবর্তন হয় তেমনি মনের পরিবর্তনও হয়। এইসব পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। তোমরা এই পরিবর্তন দেখে একদম ভয় পেও না।

প্রথমে দেহের পরিবর্তনের কথা বলি।

* ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে যদি তোমার বয়স হয় আর তুমি যদি ছেলে হও তাহলে তোমার স্বাভাবিক ওজন হওয়া উচিত ৪৭ কেজি। কিন্তু ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে তোমার ওজন বেড়ে হওয়া উচিত ৬১ কেজি।

* তুমি যদি মেয়ে হও তাহলে ১২-১৫ বছর বয়সে তোমার ওজন হওয়া উচিত ৪৫ কেজি। আর ১৫ থেকে ১৮ বছরে হওয়া উচিত ৫৩ কেজি। তবে উচ্চতার সঙ্গেও ওজনের সম্পর্ক আছে। তেমনি সম্পর্ক আছে দেহের কাঠামোর সঙ্গে। বাঙালি ছেলেমেয়েরা মাঝারি থেকে ছোট কাঠামোর হয়। মেয়েরা হয় গড় ৫ ফুট আর ছেলেরা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি।

সে কহে বিস্তর মিছা

'আমার বয়স ১৬। আমার সমস্যা হল বড্ড বেশি কথা বলি। এর ফলে হয় কি বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাঝেমাঝে অপ্রস্তুতে পড়ি। অনেক সময় আমি মনোযোগ হারিয়ে ফেলি। অনেক ব্যাপার ভুলে যাই। কেন এমন হয় বলুন তো?'

এই প্রশ্নটা করেছিল একটি ছেলে। একটি খবরের কাগজের অ্যাগনি কলমে। অ্যাগনি কলম কাকে বলে জানো তো? অনেক খবরের কাগজে পাঠকেরা তাদের নানা ব্যক্তিগত সমস্যার উত্তর চান এই কলমে।

এই যে ছেলেটি এর সমস্যা বেশি কথা বলার। বয়ঃসন্ধির সময় যে সব আচার আচরণ স্বাভাবিকভাবে তোমার জীবনে আসে, তার মধ্যে কোন কোনগুলি তোমার

ভবিষ্যতে ক্ষতি করতে পারে সেগুলি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। নইলে সেটা তোমার সারাজীবনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে।

শরীরের ওপর বয়ঃসন্ধির প্রভাব

* শৈশবে তুমি যত ছটফটে প্রাণচঞ্চল ছিলে বয়ঃসন্ধির সময় দেখবে হঠাৎ হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ছ। মাঝেমাঝে মাথা ধরছে। পড়তে ইচ্ছে করছে না। বাড়ির কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে আরও মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে।

* ছোটবেলায় এত খাই খাই করতে অথচ এই বয়সে এসে প্রায়ই খেতে ইচ্ছে করছে না। হজম হচ্ছে না। এর কারণ বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের অনেক প্রত্যঙ্গের সাইজ বেড়ে যাচ্ছে। স্থান পরিবর্তন করছে। এসবের কারণে এইসব গোলমাল। এর জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। এগুলি স্বাভাবিক। তবে খেতে অরুচি হলেও স্বাভাবিক পুষ্টিকর খাওয়া দাওয়া যতটা দরকার খেতেই হবে।

* ঋতুকালে মেয়েদের নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে এ বয়সে। তবে এটা সাময়িক। বছরখানেকের বেশি এটা চললে ডাক্তার দেখাও। উপসর্গগুলি হল, মাথা ধরা, পিঠে বেদনা, খিলধরা, পেট ব্যথা, বমি পাওয়া। ফুসকুড়ি হওয়া। ঋতু যত নিয়মিত হয়ে আসবে ততই এইসব উপসর্গ কমতে থাকবে।

বেশি কথা বলাটাও তাই। প্রথম বয়ঃসন্ধির সময় এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এটা যদি চলতে থাকে তখন বাচালতায় দাঁড়িয়ে যায়। বেশি কথা বলা তখন কিন্তু অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি প্রমাণ করার জন্য সে অনেক কথা বানিয়ে বানিয়েও বলতে শুরু করে। একে বলে 'গুল'। শেষ পর্যন্ত এটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। লোকে ধরে ফেলে লোকটা যা বলছে তা সত্যি নয়। গুলের মধ্যে কোনও বদমতলব থাকে না। শুধু নিজেকে জাহির করার চেষ্টা। আমাদের ক্লাসে একটি ছেলে পড়ত। নাম দুর্গা। সে এখন আর বেঁচে নেই। দুর্গা পড়াশোনায় ভাল ছিল। ক্লাস এইটে পড়ার সময় সে প্রায়ই বলত নিরূপা রায় বলে এক সিনেমা অভিনেত্রী তার আপন দিদি। দিদি বোম্বে থাকলে কী হবে। তাকে নিয়মিত চিঠি লেখেন। একদিন সে নিরূপা রায়-এর একটি ছবিও ক্লাসে এনে দেখালো।

আমরা তখন সরল মনে বিশ্বাস করেছিলাম তাকে।

পরে জানলাম নিরূপা রায় একজন মারাঠি। আর যে ছবিটা দুর্গা দেখিয়েছিল সেই ছবিটা সে কলকাতার ফুটপাত থেকে কিনেছিল। জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের ছবি ফুটপাতে কিনতে পাওয়া যায়।

বয়ঃসন্ধির সময় হঠাৎ ছেলেমেয়েদের মনে মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা জাগে। আবার নিজেকে জাহির করে গুরুত্ব পাওয়ারও ইচ্ছা হয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ যদি উপলব্ধি না করে তাহলে সে কিন্তু টেনিদা হয়ে যায়। টেনিদা মানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই যে চরিত্র যে শুধু গুল দিয়ে যেত। অনেকে বড় বয়সেও এই অভ্যাস ছাড়তে পারে না। নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্য

সে অম্লান বদনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। আপনার ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে। কিচ্ছু ভাববেন না। আমি করে দেব। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আমার খুব খাতির।

অমুক মন্ত্রীকে আমি বলে দেব। অথবা যে কোনও প্রসঙ্গ উঠলেই তার মধ্যে নাক গলানোর প্রচেষ্টা। সে বুঝুক না-বুঝুক। অর্থাৎ নিজেকে একজন সবজান্তা হিসাবে জাহির করার চেষ্টা।

তোমরা কিন্তু বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাববে চুপচাপ থাকাটা যেমন ভাল নয় তেমনি বেশি কথা বলাটাও ভাল নয়।

তুলসীদাস বলেছেন :

বহুত ভলা না বোরখা বহুত ভলানা ধূপ
বহুত ভলা না বোলনা চালনা বহুত ভলানা চুপ।

অর্থাৎ বেশি বর্ষা যেমন ভাল না, বেশি রোদ্দুরও তেমন ভাল না। বেশি কথা বলাও যেমন ভাল না, তেমনি বেশি চুপচাপ থাকাও ভাল না।

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। একথা বলেছেন ভারতচন্দ্র। আঠারো শতকের বিরাট কবি ছিলেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ অন্নদামঙ্গল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে তিনি ছিলেন রাজকবি।

বেশি কথা বললে মিথ্যা কথা তো আসবেই। কেন না, অত সত্যি কথা পাবে কোথায়? তখন বানাতে হবে। আবার একটা বানানো কথার সমর্থন করতে গিয়ে আরও কথা বানাতে হবে।

যেমন দুজন বাচালের মধ্যে কথা হচ্ছে। দুজনেই গুল দিয়ে দুজনকে ছাপিয়ে যেতে চায়। ওদের মধ্যে একজন হল আমেরিকান।

সে বলছে, আমাদের দেশে বড় বড় বাড়ি একমাস দুমাসের মধ্যে হয়ে যায়। এই যে এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং—ওটা তো দুমাসেই উঠে গেল। স্ট্যাচু অব লিবার্টি করতে অবশ্য আর একটু বেশি সময় লেগেছে—তিনমাস। তা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নতুন করে গড়তে একমাস লাগবে।

ভারতীয় গুলবাজ সব শুনে গেল। কিছু বলল না। তারপর আমেরিকানকে নিয়ে কলকাতার নানা কিছু দেখাতে লাগল। হঠাৎ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে আমেরিকান বলল : এটা কী বাড়ি দাদা। দেখতে তাজমহলের মতো মনে হচ্ছে।

ভারতীয়টি বলল, তাই তো ওই বাড়িটা কি তা তো বলতে পারছি না। যখন তোমাকে আনতে এয়ারপোর্টে যাচ্ছিলাম তখনও পর্যন্ত এটা ছিল না। এর মধ্যে এটা হয়তো তৈরি হয়ে থাকবে। চল তো জিজ্ঞাসা করে আসি ওটা কী।

বেশি কথা যারা বলে প্রথম প্রথম লোকে তাদের কথায় বিশ্বাস করে। তারপর কিন্তু যাচাই করতে গিয়ে বুঝতে পেরে যায়। বাচালের কথায় অনেক লোক বোর হয়ে যায়। কারণ সে নিজের একটা কথাই সাতকাহন করে বলে।

তোমরা সবসময় এটা খেয়াল রাখবে যে লোকজন বোকা নয়। তারা মনে মনে বুঝে ফেলে কোনটি সত্যি কোনটা মিথ্যে। মুখে হয়তো কিছু বলে না। বাচালকে লোকে বিশ্বাস করে না।

কিন্তু তাই বলে আবার চুপচাপও থাকবে না। সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরি বলেছেন ; সেবা করতে গিয়ে সেবক চুপচাপ থাকলে লোকে ভাববে তুমি বুঝি বোবা। আর বাকপটু হলে লোকে ভাববে তুমি তোষামোদকারী বা বাচাল।

যেখানে কথা বলা দরকার, কথা না বললেই বরং লোকে ধারণা করবে তুমি লাজুক না হয় কিছুই জানো না। সেখানে মুখ খুলতেই হবে।

যেমন : তোমায় যদি কেউ প্রশ্ন করে তার জবাব দিতে হবে। তবে প্রশ্নটির জবাব সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। অনেকে উত্তর দিতে গিয়ে একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেলে। যেমন প্রশ্ন তেমনি উত্তর হবে।

যেমন, আজ দোল ২০০৩। আমি বাড়িতে লেখার টেবলে বসে এই লেখা লিখছি।

একটি পাঠক ফোন করল রানাঘাট থেকে। প্রাথমিক আলাপের পর তার প্রশ্ন : আজকাল অনেকে দোল খেলে না কেন বলুন তো।

আমি। অনেকগুলো কারণ হতে পারে। যেমন যেসব রঙ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে এমন সব ভেজাল থাকে যে সেটা গায়ে মাখলে চর্মরোগ হতে পারে। এই সব নিয়ে কাগজে লেখালেখি হচ্ছে। অনেকে এজন্য ভয় পেতে পারে।

তাছাড়া রঙের নামে আজেবাজে জিনিস বেলুনে পুরে ছুড়ে মারা হচ্ছে। কাল তো দোল ছিল না। কাল বাসে করে যাচ্ছি। আমহার্স্ট স্ট্রিটে একদল ছেলে বাসের মধ্যেই এমন বেলুন ছুড়ছিল। এই ভয়ে দোলের দিন অনেকে রাস্তায় বেরোয় না।

তা ছাড়া মানুষের বিনোদনের এখন অনেক ব্যবস্থা আছে। দোল খেলাটা অনেকে পছন্দ নাও করতে পারে। তবে তার মধ্যেও খেলা চলছে।

খুব সংক্ষেপে বেশি কথা না বলে বলা ও ছোট করে লেখার অভ্যাস এখন থেকেই শুরু করলেই ভাল। এরপর যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবে তখন এক-একটা প্রশ্নের ছোট ছোট জবাব দিতে হবে। যত বড় করে জবাব দেবে তত বেশি ফালতু কথা বলে ফেলার সম্ভাবনা। তবে যেখানে দরকার সেখানে আগ বাড়িয়ে কথা বলাটা কিন্তু সপ্রতিভতার লক্ষণ। সেখানে লাজুক হলে চলে না। তবে সেই জায়গাটা কোথায় বলছি।

ক্লাসে মাস্টারমশাই পড়া জিজ্ঞাসা করছেন। যদি উত্তর জানো, হাত তুলবে। এখানে তুমি হাত না-তুললে মাস্টারমশাই ধরে নেবেন তুমিও জানো না।

অনেক সময় কোনও সভায় জিজ্ঞাসা করা হয় শ্রোতাদের মধ্যে যদি কেউ কিছু বলতে চান, বলতে পারেন।

তোমার উচিত হবে সেখানে হাত তুলে তুমি কিছু বলতে চাও তা জানানো। এখনই এটা করতে বলছি না। একটু বড় হয়েই না হয় এটা করলে। কিন্তু এখন থেকেই মনোভাবটা গড়ে তোল।

মনে রেখে দিও যে যত গুছিয়ে কিছু বলতে পারবে সে ততই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অপরিচিতদের মধ্যে পরিচিত হতে হলে তোমাকে তোমার গুণপনা

দিয়েই নিজেকে পরিচিত করে তুলতে হবে।

যারা খুব লাজুক হয় তারা সব সময় ভাবে কিছু বললেই বুঝি লোকে তাকে নিন্দে করবে। তারা খিদে পেলেও চাইতে পারে না। তাদের কিছু ইচ্ছা করলেও তারা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। তারা সব সময় ভাবে লোকে তাদের মুখ দেখেই মনোভাব বুঝে নেবে। তোমার বাবা-মা না হয় বুঝতে পারেন তুমি কি চাইছ। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও অপরিচিতরা কী করে বুঝবে।

দুধরনের ছেলেমেয়ে আছে, এক হল চুপচাপ আর এক হল সপ্রতিভ বা সরব। ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে smart —এককথায় চালাকচতুর। কিন্তু তুমি যে চালাকচতুর সেটা বোঝানোর জন্য বেশ ভাল করে কথা বলতে জানা চাই।

ব্যবহারই পরিচয়

তোমার ব্যবহার, আদব কায়দা, চালচলন এসব মিলিয়ে তোমার পরিচয়।

* বয়স্কদের সব সময় জেঠু, কাকু, মাসিমা, মেসোমশাই বলে সম্বোধন করবে। তোমার সিনিয়রদের দাদা বা দিদি বলবে।

* টেলিফোন ধরার সময় জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কে বলছেন? বাবা এখন বাড়ি নেই। এলে কিছু বলতে হবে? অথবা বলবে, আপনি কাইন্ডলি একটু ধরুন, আমি ডেকে দিচ্ছি। রং নাম্বার হলে বলবে, সরি, এটা রং নাম্বার।

* কারও কাছে কিছু সাহায্য নিতে হলে Kindly কথাটা বলবে। Kindly বলবেন বিসি ১১৮ বাড়িটা কোন দিকে হবে? Please আমাকে একটা বর্ধমানের টিকিট দিন। কাজটা হয়ে গেলে বলবে Thank You.

* গুরুজনদের সঙ্গে একমত না-হলেও মুখে প্রতিবাদ করবে না। তাঁদের কথা বা বকুনি শুনে যাবে। সেদিন রাতে ভেবে দেখবে তাঁদের বকুনি যথার্থ ছিল কি না। যদি মনে করো, না, তুমিই ঠিক। তাহলে তুমি তোমার নিজের যুক্তিতে অটল থাকবে। আর যদি মনে করো তোমারই ভুল হয়েছে ভাববে বকুনি খেয়ে নিজেকে সংশোধন করার একটা সুযোগ পেলে।

* বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র প্রণাম করবে। প্রণাম পৃথিবীর সমস্ত শিষ্টাচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দুই

যারা খুব লাজুক

> লাজুকতা জীবনকে ছারখার করে দিতে পারে। লাজুকতা অনেক জীবনকে বিকশিত হতে দেয় না। লজ্জা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও এগিয়ে যেতে বাধা দেয়, তাকে প্রকৃত নেতা হতে দেয় না। তাদের ধ্যানধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেয় না।
>
> *হাউ টু বি সেলফ কনফিডেন্ট*
> জয়কো পাবলিশিং হাউস

আচ্ছা তুমি কি মুখচোরা? যাকে বলে লাজুক?

মানে লোকজনের সঙ্গ কি তোমার ভাল লাগে না। তুমি একা চুপচাপ থাকতে ভালবাসো।

সেদিন হাওড়ার গ্রাম থেকে একটি ছেলে আমার কাছে এসেছিল। ছেলেটি তোমাদের চেয়ে বয়সে বড়। বিএ পাস করে গেছে। কিন্তু সে ইস্কুল-জীবন থেকে মুখচোরা। কারও সঙ্গে চট করে আলাপ জমাতে পারে না। সব সময় আপন মনে ভাবে।

তার ধারণা কথা বললেই লোকে তাকে খুব বোকা ভাববে। কথা না বলে বলে সে এখন এমন লাজুক হয়ে গেছে যে এখন ভিড়ের মধ্যে গেলেই তার মাথা ঘোরে।

ছোটবেলায় যে সব ছেলেমেয়ে খুব দুষ্টুমি করে বাবা-মা তাদের খুব আফসোস করেন। আর যারা চুপচাপ তাদের নিয়ে গর্ব করেন। কী শান্ত ছেলে দেখেছ।

এর উলটোটাই কিন্তু হওয়া উচিত। যে দুষ্টু, সবসময় ছোটাছুটি করছে দেখা যাবে সে চট করে লোকের সঙ্গে মিশতে পারে। চুপচাপ ছেলেমেয়েরা খুব মিশুকে হয় না। এদের বলে অন্তর্মুখী বা ইনট্রোভার্ট। মনের কথা চেপে রাখে বলে তাদের খুব উদ্বেগ হয়। এরা নানা দুশ্চিন্তায় ভোগে। এদের অনেকে একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হয়ে পড়ে। এদের অনেকের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে।

চুপচাপ যারা থাকে তারা অনেকে মায়োপিক। মানে এদের চোখে মাইনাস পাওয়ার। এরা খুব একটা দৌড়ঝাঁপের খেলা খেলতে পারে না বলে এরা খুব বই পড়ে। কাজে কাজেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হইচই আড্ডা এদের তেমন পছন্দ নয়।

অতি-লাজুকতা, লোকজন দেখলে গুটিয়ে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে হইচই করতে না, পারাটা এক রকমের মানসিক অসুখে পরিণত হতে পারে। এমন হলে দেখা যায়, অনেক লোকের মাঝে কথা বলতে গেলে যেন বুকে চাপ ধরছে। মাসল গুটিয়ে যাচ্ছে। পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সারা শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছে। গা হাত পা কাঁপছে। কথা বলতে গেলে স্বাভাবিক স্পিডের চেয়ে জোরে জোরে কথা বলছে।

এটা কেন হয়?

কেন না, তুমি মনে করছ আর সবার চেয়ে তোমার বিদ্যাবুদ্ধি কম। সবাই তোমার ওপরে। তোমার মনে হয় তুমি কোনও ব্যাপারে অপরাধী।

সেই যে হাওড়ার ছেলেটির কথা বলছিলাম তার সমস্যাগুলি তার ভাষাতেই বলি। তোমাদের কারও সঙ্গে মেলে কি না দেখো।

মানুষের সঙ্গে ঠিকমতো মিশতে পারি না। যেটুকু প্রয়োজনে অর্থাৎ কেমন আছো? কী করছো ইত্যাদি। মনে হয় সবাই আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে।

* আমার বন্ধুবান্ধব প্রায় নেই। যে কোনও অনুষ্ঠান-বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে পছন্দের কেউ না-থাকলে যেতে ইচ্ছা করে না।

* আবেগের বশে কোনও ভুল কথা বলে ফেললে সেটা নিয়ে চিন্তা করি। কে কী বলবে সেটা নিয়ে ভাবি।

* বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কথা জড়িয়ে ফেলি। একটা কথা দুবার বলে ফেলি।

* মাঝে মাঝে মনে হয় বাড়ি থেকে দূরে কোথাও চলে যাই।

* অন্যেরা কেউ হাসাহাসি করলে মনে হয় আমাকে নিয়ে হাসছে।

* আমি সাধারণত বন্ধুবান্ধবদের তর্কের মধ্যে ঢুকে পড়ি না। এমনকী, কারও ভুল ধরিয়ে দিতেও ভয় করে।

* মাস্টারমশাইকে ইস্কুলে নিজে থেকে কোনও প্রশ্ন করতাম না। ভাবতাম যদি প্রশ্ন করলে তিনি রেগে যান, ভাবতাম বন্ধুরা যদি বলে বোকার মতো প্রশ্ন করেছি।

স্বভাব লাজুকদের একটা মুশকিল হল, তারা যেহেতু পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পারে না, তারা নৈরাশ্যবাদী হয়ে যায়। তারা ভেবে বসে থাকে সমাজের আর সবাই খারাপ। মেলামেশা বা বন্ধুত্ব করার মতো উপযুক্ত কেউ নেই। অথচ নিজের উদ্যোগ নিয়ে সমাজের ভাল করার মতো কোনও কল্যাণকর কাজে অংশ নেবার মনোবলও তার নেই। সে বাস্তবের মুখোমুখি হতে ভয় পায়।

স্বভাবলাজুক বা ইনট্রোভার্ট ছেলেমেয়েরা মনের ভেতর গুমরে গুমরে থাকে। কারণ মনের কথা কারও কাছে বলতেও তাদের সঙ্কোচ হয়। মেয়েরা স্বভাবত একটু লাজুক। কিন্তু তার ওপরে যদি কোনও মেয়ে আরও অন্তর্মুখীন হয় ও একাকিত্বে ভোগে তাহলে এই অবস্থায় বেশিদিন থাকলে তারা বিষাদ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তারা আত্মনিপীড়ন করে আনন্দ পায়। তার নিজেকে কষ্ট দিতে ভাল লাগে। দেখা যাবে একটুতেই অভিমান করে সে খাওয়া-দাওয়ায়

অবহেলা করে। অসুখ বিসুখ হলে ওষুধ খেতে চায় না। লাজুক ছেলেমেয়েরা যেহেতু নিজেদের কথা ভালভাবে বলতে পারে না সেজন্য তাদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে রাগ জমতে থাকে। যখন কারও বিরুদ্ধে রাগ দেখাতে পারে না তখন নিজের ওপরেই রাগ দেখায় সে। সেজন্য সে হঠাৎ হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। এমনকী, তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা জাগে। কথায় কথায় তার চোখে জল আসে।

লাজুকতা শেষ পর্যন্ত একটা অসুখে দাঁড়িয়ে যায়।

* প্রায়ই বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।
* প্রায়ই মনে হয় কেউ তাকে ভালবাসে না।
* লাজুক লোকেরা খুব রাগী হয়।

আমার কাছে অনেক ছেলেমেয়ে আসে তাদের চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা। মায়োপিকরা স্বভাব লাজুক হয়। সেজন্য অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে। তারা খেলাধুলো ও সামাজিক মেলামেশার চেয়ে আপনমনে বসে বই পড়তে ভালবাসে। তারা পড়াশোনায় ভাল হয় কিন্তু মিশুকে হয় না।

দ্যাখো, লাজুক হলে তোমার কী কী হতে পারে।

তুমি খুব স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে পারো। তোমাকে সামান্য সমালোচনা করলেই তোমার ভীষণ অপমান হয়। তোমায় কেউ কিছু বললেই তুমি কেঁদে-কেটে একশা করো। অভিমান করে তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দাও।

স্পর্শকাতর বা সেনসিটিভ লোকেরা জীবনে বেশি দূর যেতে পারে না। তারা খুব খুঁতখুঁতে হয়। সে সমালোচনার ভয়ে নিজেকে জনহিতকর কাজ থেকে গুটিয়ে রাখে।

স্পর্শকাতর লোকেদের আচার-আচরণের কোনওও স্থিরতা থাকে না। সে যুক্তিতর্ক করে কোনও বিচার করে না। আবেগে চলে। যা মনে এল তেমনি করল। ভাবনা-চিন্তা করে কাজ করে না। অন্যদিকে সে কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। জীবনে বড় হতে চায় কিন্তু তার ধৈর্য নেই। সে কারও সঙ্গে সমঝোতা করে না। অন্যকে বুঝতেও চায় না। কোনওও বিষয়ে তার আগ্রহ থাকে না। সে ভাল করে শুনতেও চায় না, বুঝতেও চায় না।

সমাজ ও তুমি

সকলের সঙ্গে মেলামেশাকে বলে সমাজীকরণ।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা গেছে, কিছু সংখ্যক প্রাণী ছাড়া (যেমন বাঘ) অধিকাংশ প্রাণী দল বেঁধে থাকে। আবার কোনওও কোনওও প্রাণী জোড়ায় জোড়ায় থাকে। শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে দেখা গেছে, কোনও কারণে দুজন শিম্পাঞ্জির মধ্যে লড়াই হলে, পরে তারা করমর্দন করে ভাব করে নেয়। অথবা আবার বন্ধু হবার জন্য পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।

এই যে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা না হয় একা একা থাকা এটা আবার এক ধরনের হরমোনের ওপর নির্ভর করে। বিজ্ঞানীরা বলেন, কয়েকটি বিশেষ হরমোন যে-সব প্রাণীর মধ্যে আছে ওই বিশেষ শারীরিক গুণের জন্য কতগুলি ইমোশান তাদের মধ্যে বর্তায়। তাই তারা একসঙ্গে থাকে। বিশেষ হরমোনের অভাবে মানুষের মধ্যেও মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। তখন সে মনের অসুখের শিকার হয়।

দেখা যায় ছোটবেলা থেকেই কেউ কেউ একা থাকতে ভালবাসে। কোনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ পছন্দ করে না, এমনকী, কোনও পশুপাখি পুষতেও পছন্দ করে না। আরও দেখা গেছে স্বেচ্ছা-নিঃসঙ্গপ্রিয় এই সব মানুষ বেশি দিন বাঁচে না।

স্কুলে আমাদের ক্লাসে তাপস বলে একটি ছেলে পড়ত। তখন আমরা ক্লাস ফাইভে বোধ হয় পড়ি। তাপসেরা একটা বিরাট বাগানবাড়িতে থাকত। আশেপাশে কোনও বাড়ি ছিল না। তাপসের ক্লাসে কোনওও বন্ধু ছিল না। সে কারও সঙ্গে কথা বলত না। একদিন শুনলাম তাপস গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

যারা বন্ধুবান্ধব পছন্দ করে না, চুপচাপ থাকে, তাদের অবিলম্বে মনোবিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তার আগে তারা কাউন্সেলিং-এর জন্যও আসতে পারে। তবে স্বভাব লাজুক ও স্বভাব-একাকী (ইংরেজিতে এদের recluse বলে) এই দুজনের মধ্যে তফাত আছে। স্বভাব-লাজুকরা কিন্তু সবাই অমিশুক নয়। তারা মিশতে চায়, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারে না। কিন্তু একবার কেউ কথা বললে দেখা যায় তারা দারুণ মিশুকে। আমি এমন একজন বিখ্যাত স্বভাব-লাজুক অথচ ভীষণ মিশুকে মানুষ দেখেছিলাম তিনি প্রয়াত সাহিত্যিক সুবোধকুমার ঘোষ। তিনি যেচে কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। খুব গম্ভীর হয়ে থাকতেন। আমি তাঁর সঙ্গে একবার ত্রিপুরা সফরে গিয়েছিলাম। একঘরে তিনদিন ছিলাম। ব্যস, আমি তাঁর বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম।

লাজুকতা কাটাবে কী ভাবে?

প্রতিদিন একজন করে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করবে। সে তোমার সমবয়সী হতে পারে। তোমার চেয়ে বড়ও হতে পারে। বয়স্কদের মাসি, মেসো, কাকু কিংবা জেঠু বলবে। আপনি না বলে তুমি বলে সম্বোধন করলে বেশ মিষ্টি শোনায় আর সম্পর্কটা আপন আপন মনে হয়। সমবয়সীদের প্রথমে তুমি বলে সম্বোধন করে আলাপ জমে যেতেই তুই তে নেমে আসবে। নতুন কার কার সঙ্গে আলাপ হল তাদের নামগুলো ডায়রিতে লিখে রেখে দেবে। মাসে ত্রিশজন নতুন লোক চাই। একদিন আলাপ করার মতো কাউকে না পেলে পরদিন দুজনের সঙ্গে আলাপ করে কোটা পূরণ করে দেবে।

বাবা-মা কোনও দরকারে অপরিচিত কারও কাছে পাঠালে বিব্রত হবে না।

মনে করবে এটা একটা সুযোগ।

স্কুল জীবন থেকেই তোমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত মহলে তোমার একটা আইডেনটিটি তৈরি করার চেষ্টা করবে। তুমি যে ছেলেমানুষ নও, তোমার বাবা বা মায়ের পরিচয়ের বাইরে তোমার পরিচয়েই তুমি পরিচিত হতে চাইবে। তোমার যদি বিশেষ কোনওও গুণ থাকে যেমন তুমি যদি ভাল খেলোয়াড় হও, গল্প-কবিতা লেখো, আবৃত্তি-অভিনয়, নাচ-গান করো, ছবি আঁকো, ক্লাব পরিচালনা করো তাহলেই তোমার একটা বিশেষ আইডেনটিটি তৈরি হয়ে যাবে। ইস্কুলে সব ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তোমায় নামে চিনবে। স্যর ও ম্যাডামেরাও তোমায় চিনবেন। এর ফলে তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এই আত্মবিশ্বাসই তোমাকে জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম তখন থেকেই আমার নিজস্ব আইডেনটিটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমি আবৃত্তি করতাম, ইস্কুলে পড়ার সময়ই শুকতারা, বসুমতী, মৌচাক এশিয়া আরও অনেক পত্রপত্রিকায় লেখা বেরুত। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে নিজে ছাপানো পত্রিকা বার করেছিলাম। আমি প্রচুর চিঠি লিখতাম। চিঠি পেতাম। আমার নাম ডাকপিওনের কাছে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল।

যারা মুখচোরা তাদের উচিত বেশি করে স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় আবৃত্তি বা বক্তৃতা দেবার অভ্যাস করা। ইস্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অবশ্যই যোগ দেবে। প্রাইজ পেতে হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু দশজনের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলার অভ্যাস ধীরে ধীরে হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আমি একজন ক্লাস এইটের ছাত্র। একটি কো-এডুকেশন স্কুলে পড়ি। মেয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে কিছুতেই সহজে মিশতে পারি না। কী করব?

আমি। বয়ঃসন্ধির সময় থেকে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে ছোটবেলার মতো সহজে মিশতে পারে না। এটা বয়ঃসন্ধির ধর্ম। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুস্থ-স্বাভাবিক বন্ধুত্ব মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যই খুব দরকার। এজন্য আমি কোএডুকেশন পছন্দ করি। গ্রামের দিকে অনেক কোএডুকেশন ইস্কুল আছে। যেসব ছেলেমেয়ে লাজুক তাদের লাজুকতা কাটিয়ে উঠতে গেলে প্রথমে গ্রুপ কাজকর্মের মধ্যে অংশ নিতে হবে। যেমন অভিনয়, নৃত্য ; সমবেত সঙ্গীত, সমবেত ব্যায়াম, মিক্সড খেলাধুলো যেমন ব্যাডমিন্টন, ইনডোর গেমস। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে সহজ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

ইস্কুলের কোনও ছেলে তার সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রথম আলাপ করবে এইভাবে :

আমি ইন্দ্র, তুমি?

সে হয়তো বলবে, আমি চান্দ্রেয়ী। তুমি কোথায় থাকো?

ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছু নেবার আছে। যেমন মেয়েদের মধ্যে মায়া, মমতা, কোনও সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে বোঝানোর ক্ষমতা অনেক বেশি। তা ছাড়া তাদের ধৈর্য, সহ্যশক্তি এগুলিও যথেষ্ট।

তেমনি ছেলেদের মধ্যে সাহস, ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা, মনের জোর, উদ্যোগ এসব গুণ বেশি।

ছেলে ও মেয়েরা নিজেদের সহজাত গুণগুলি ত্যাগ না করেও তাদের যেটা নেই সেটি অন্যের কাছ থেকে নিতে পারে।

তবে মেয়েদের শুধু মেয়েদের সঙ্গে মিশলে চলবে না বা ছেলেদের শুধু ছেলেদের মধ্যেই মেলামেশা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। উভয়ের সঙ্গেই মেলামেশা করতে হবে। তবেই না তুমি স্মার্ট হয়ে উঠবে।

তুমি কতটা স্মার্ট?

স্মার্ট কথাটার মানে হল চটপটে বা সপ্রতিভ। এক কথায় বুদ্ধিদীপ্ত। যার চেহারা, সাজপোশাক ও কথাবার্তার মধ্যে চটপটে ও বুদ্ধিদীপ্তভাব ফুটে ওঠে। স্মার্টনেস বলতে ওপর-চালাক ছেলেমেয়ে নয়।

সপ্রতিভতা ও মিশুকেপনা স্মার্টনেসের প্রধান গুণ। স্মার্ট ছেলেমেয়েরা অপরিচিত ছেলেমেয়ের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারে। সহজেই চাঁদা চাইতে পারে। কিছু বিক্রি করতে পারে। স্মার্টনেস নির্ভর করে আরও কয়েকটি জিনিসের ওপর। যেমন—

১. পরিচ্ছন্ন পোশাক। ছেলেরা শার্ট পরলে সব সময় প্যান্টে গুঁজে পরবে। ছিমছাম পোশাক পরবে। ক্যাটকেটে রঙের জামা পরবে না। মেয়েরা পরবে শালোয়ার ও পাঞ্জাবি।

২. কখনও মুখ গোমড়া করে থাকবে না।

৩. খুব দ্রুত কথা বলার চেষ্টা করবে না।

৪. উচ্চারণ স্পষ্ট করে করবে। Shaw Shaw করে কথা বলবে না। জড়িয়ে কথা বলবে না।

৫. বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করার সময় ভাল ভাল গল্পের স্টক ও জোক মজুত রাখবে।

৬. যদি গানের গলা থাকে তাহলে গানের চর্চা রেখে দিও। গান তোমাকে জনপ্রিয় করে তুলবে।

৭. মেয়েরা কখনই উগ্র সাজগোজ করবে না। পোশাকেও শালীনতা বজায় রাখবে। ফ্যাশনেবল হও, তবে দেখবে কোথাও যেন তার বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়।

স্মার্টনেস হল, সহজ আলাপচারিতা, হাসিখুশি ভাব, সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার। সব সময় তোমার চোখে-মুখে যদি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ভাব থাকে তাহলে সবাই তোমায় এড়িয়ে যাবে।

নিজে নিজেই তুমি স্মার্টনেসের ট্রেনিং নিতে পারো। নিচে পাঁচটি প্রোজেক্ট তোমাকে দিলাম। প্রত্যেকটি প্রজেক্টের জন্য ১০ নম্বর। মোট নম্বর ৫০। এখন প্রজেক্টগুলি শেষ করার পর নিজেকে নম্বর দাও। যদি ৫০ পাও তাহলে তুমি

খুবই স্মার্ট। তোমাকে বড় হয়ে সাফল্যের জন্য খুব বেশি ভাবতে হবে না। আর যদি ৩০ এর কম পাও তোমাকে বেশ খাটতে হবে। ১৫ নম্বরের কম পেলে তুমি খুব লাজুক। তোমার ভবিষ্যতে বেশ অসুবিধা হবে।

১. তোমার যে বন্ধু বা বান্ধবীর বাড়ি এর আগে কখনও যাওনি, তাকে আজ গিয়ে বলো তোর বাড়িতে আগামী রবিবার খাব। এমনি কোনও বিশেষ কাজ নেই। তারপর তুমি তার বাড়িতে গেলে ও বন্ধুর বাবা মা ভাই বোন দিদি সকলের সঙ্গে কাকু, কাকিমা, দিদি বলে আলাপ জমিয়ে ফেললে। ওদের বাড়ির সবাই যদি তোমার ব্যবহারে খুশি হয়ে যদি বলে আবার একদিন এসো তাহলে তুমি ফুল মার্কস পেয়ে গেলে।

২. তুমি তোমার পছন্দমতো পোশাক পরে আজ বন্ধুদের সঙ্গে বেরোও। অথবা কোনো বাড়িতে যাও তোমার পোশাক দেখে যদি বেশির ভাগ বন্ধু যদি বলে, এই জামাটা বা টপটা বা ফ্রকটা পরে তোকে বেশ মানিয়েছে তুই কোথা থেকে কিনেছিস তাহলে তুমি দশ নম্বর পেলে।

৩. তুমি তোমার আত্মীয়ের বিয়েবাড়ি এসেছ। সেখানে তোমার বয়সী আরও অনেক ছেলেমেয়ে এসেছে। তারা তোমার অপরিচিত। এখানে তুমি যদি পাঁচজন অপরিচিত ছেলেমেয়ের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারো তাহলে তুমি দশ নম্বর পেলে।

৪. কোনও ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় দর্শক হিসাবে গিয়েছ। কোনও প্রশ্ন যোগদানকারীদের কেউ বলতে পারছে না, তখন ক্যুইজ মাস্টার বলল, দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ উত্তর দিতে পারবেন? তুমি হাত তুললে, তারপর ওই প্রশ্নের সঠিক জবাবটা দিয়ে দিলে। তুমি দশ নম্বর পেয়ে গেলে।

৫. তুমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে কোনো কিছুর জন্য কিছু চাঁদা তুলে দিলে বা চ্যারিটি শো-এর টিকিট বিক্রি করে দিলে। এই উদ্যোগের জন্যই তোমার প্রাপ্য ১০।

বাবা-মা ছেলেমেয়েদের অন্তর্মুখীনতার জন্য দায়ী

মৈনাক বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। মৈনাকের বাবা কড়া মেজাজের। প্রচণ্ড কর্তৃত্ববাদী। মা সেই তুলনায় খুবই নরম প্রকৃতির। বাবার মুখের ওপর কথা বলতে পারেন না। ছোটবেলা থেকে মৈনাকের বাবা রবীনবাবু স্ত্রী ও শিশুর উপরও কর্তৃত্ব ফলাতেন। তিনি যা বলবেন তাই হবে। ছেলে বা স্ত্রীর কোনও স্বাধীন মতামত তিনি বরদাস্ত করতেন না। কতবার পাঁচ বছরের ছেলেকে অবাধ্যতার জন্য তিনি সারারাত বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। মারধর তো লেগেই থাকত। অনেক বাবা-মা আছেন যাঁরা তাঁদের অসহায় শিশুসন্তানকে নানাভাবে অত্যাচার করেন। এর ফলে ওই শিশু উদ্বেগে ভোগে। তার আশংকা হয় এই বুঝি কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার কোনও ত্রুটি ধরা পড়বে। সেই ভয়ে সে গুটিয়ে থাকে।

কথা বলে না। এইভাবে সে ক্রমশ অন্তর্মুখীন হয়ে পড়ে। আবার কোনও কোনও ছেলেমেয়ে ছোটবেলা থেকেই অন্তর্মুখী। চুপচাপ থাকতেই তারা ভালবাসে।

কথা কও। কথা কও!

১. মনের ভাব ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারাটাই কথা বলার আর্ট।

২. যে গুছিয়ে কথা বলতে পারে সে সহজেই জনপ্রিয় হয়।

৩. কথা বলার আর্ট রপ্ত করতে গেলে সবচেয়ে আগে যেটা দরকার সেটা স্পষ্ট উচ্চারণ। কী বলব সেটা ভাল করে জানা। কীভাবে বলব সেটা বোঝা।

৪. ভাল কথা বলা শিখতে গেলে নিয়মিত প্রতিটি বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতে হবে।

৫. নিয়মিত খবরের কাগজ ও বই পড়তে হবে।

৬. ইস্কুলের বিতর্ক সভায়, আলোচনা সভায় অংশ নিতে হবে।

৭. বহুলোকের সামনে কিছু বলার সময় আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসতে হবে। ভাবতে হবে তুমি একজন নামী বক্তা। তোমার কথা শোনার জন্যই সবাই এখানে এসেছে।

তুমি কতখানি মুখচোরা?

সামান্য পরিমাণ লাজুকতা তোমাদের মতো বয়সে সকলেরই থাকতে পারে। কিন্তু তুমি যদি খুব বেশি মুখচোরা হও তাহলে এইবেলা কাউন্সেলিং করে নিজের ঘাটতি পূরণ করে নাও। তা নইলে এটা বাড়তে থাকলে নানা ধরনের মনের অসুখ দেখা দিতে পারে। নীচের প্রশ্নগুলি তোমার ক্ষেত্রে হ্যাঁ হলে প্রত্যেকটি প্রশ্নের পাশে (✓) চিহ্ন দাও।

প্রত্যেকটি ✓ চিহ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ। এবার কত নম্বর পাচ্ছ হিসাব করে দেখো।

* তুমি কি খুব মুডি? হ্যাঁ/না
* তোমার একটু যন্ত্রণা হলেই কি তুমি কাতরাতে থাকো? হ্যাঁ/না।
* তোমার মনে কি সন্দেহ হয় অধিকাংশ তোমার লোক বিপক্ষে। হ্যাঁ/না
* অন্যের সাফল্যে তোমার কি খুব ঈর্ষা হয়? হ্যাঁ/না
* তোমার কি ভোরে উঠেই ঝগড়া করতে ইচ্ছা হয়? হ্যাঁ/না
* তুমি কি চট করে ক্লান্ত হয়ে যাও? হ্যাঁ/না
* তোমার কি সব সময় মনে হয় তোমার পরীক্ষার প্রিপারেশন কিস্যু হয়নি? হ্যাঁ/না
* তুমি কি অচেনা সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে চট করে আলাপ জমাতে পারো। হ্যাঁ/না
* বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তোমার আকর্ষণ আছে কিন্তু যেচে আলাপ করতে ভয় হয়। হ্যাঁ/না

তোমার কি হঠাৎ হঠাৎ স্মৃতি মুছে যায়। খুব জানা প্রশ্নের উত্তর চট করে মনে পড়ে না। হ্যাঁ/না

যদি ৮০ ওপরে পাও তাহলে তুমি খুবই মুখচোরা। সতর্ক হও।

৬০—৮০ —তুমি যথেষ্টই মুখচোরা।

৬০-এর নিচে —তুমি অনেকক্ষেত্রে লাজুক। সতর্ক হও।

কেমন করে বক্তৃতা দেবে?

আগে মুখচোরা ভাব কাটাও—অডিয়েন্স ফোবিয়া কাটিয়ে ওঠো তারপর তো বক্তৃতা। ছোটবেলায় আমাদের ইস্কুলে এক ভদ্রলোক ক্যারিকেচর করতে এসেছিলেন। তাঁর একটি নকশা এখনও মনে আছে।

এক ছিল মুখচোরা ছেলে। তাকে জোর করে ইস্কুলের নাটকে নামানো হল। সে কিছুতেই করবে না। না স্যার, স্টেজে উঠলে আমার পা কাঁপে। স্যার বললেন, তোমায় একটা মাত্র সংলাপ বলতে হবে। তুমি হচ্ছ রাজার পাচক। অবেলায় অতিথি সমাগম হয়েছে। রাজা পাঁচককে বললেন, যাও মাংসের হাঁড়ি খুলে দেখে এসো আর মাংস আছে কি না। ছেলেটি ওই একটি পার্ট বলতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

অভিনয়ের দিন পাচকবেশী ছেলেটি মঞ্চে প্রবেশ করল। দর্শকদের দিকে তাকাতেই সে দেখে একেবারে প্রথম সারিতে তার বাবা বসে। তাই দেখে সে নার্ভাস হয়ে ওইটুকু পার্টই ভুলে গেল।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন : কি পাচক, রন্ধনশালায় গিয়ে কী দেখলে শীঘ্র বলো। আমার অতিথিরা সব অভুক্ত রয়েছেন।

পাচকবেশী ছেলেটি বলে উঠল : মহারাজ—তারপর আর কথা সরে না। মহারাজ পার্টটা ধরিয়ে দেবার জন্য বলল, বলো, বলো কী দেখলে? হাঁড়ি খুলে কী দেখলে?

পাচক এবার বলে ফেলল : মহারাজ হাঁড়ি খুলে দেখি বাবা নেই।

নার্ভাস হয়ে গেলে, স্টেজ ফ্রি না-হলে বক্তৃতা দেওয়া বা নাটক করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

তুমি বলবে, আমি তো আর রাজনৈতিক নেতা হতে যাচ্ছি না—আমার বক্তৃতা কোনও কাজে লাগবে?

আমি বলব, যখন চাকরি করবে তখন এই নৈপুণ্যটির ঘন ঘন প্রমাণ দিতে হবে। যদি ম্যানেজার হও, রোজই বক্তৃতা দিতে হবে। বিজ্ঞাপন ও মার্কেটিংএ যারা কাজ করে তাদের প্রেজেন্টেশন করতে হয়। প্রেজেন্টেশন মানে একটা প্রস্তাব স্লাইড দিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে। যদি ভাল বোঝাতে পারো তাহলে তোমার কোম্পানি কাজটা পাবে। এজন্য চাই যুক্তি তর্ক দিয়ে বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেওয়া। বলার ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর হতে হবে। আর অনর্গল ইংরেজিতে বলে যেতে হবে।

বাংলা হিন্দি আর ইংরেজিতে অনর্গল বক্তৃতা দেওয়া প্র্যাকটিস করো। ভাল করে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতাকে বলে 'কমিউনিকেশন পাওয়ার।' এই কমিউনিকেশন স্কিল কী ভাবে অর্জন করতে হয় সে সম্পর্কে বের্নিশ হাস্ট এর একটি ভাল বই আছে।

তিনি বলছেন—

বক্তৃতা করার সময় প্রথমেই তোমাকে জানতে হবে কাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছ। শ্রোতা কারা?

তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থিক অবস্থা, কোনও বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর লোক না সব রকম লোক, তারা বক্তার কাছ থেকে কী শুনতে চায়। তারা কিছু তথ্য জানতে চায় না মজার মজার কথা শুনতে চায়। শ্রোতাদের আগে থেকে কোনওও বদ্ধমূল ধারণা আছে কি না এই সব।

অনেক সময় আলোচনাচক্র-টক্র হলে লোকে লিখিত বক্তৃতা পড়ে। কিন্তু পড়ার সময় আস্তে আস্তে সেই বক্তৃতা পড়তে হয়।

মিনিটে ৬০টি শব্দের বেশি পড়া উচিত নয়। বক্তৃতা বেশ জোরে পড়বে। বক্তৃতার দশ শতাংশ মাত্র সময় ভূমিকা করার জন্য দেবে। ৭০ শতাংশ থাকবে মূল বক্তৃতা আর ২০ শতাংশ যা বললে তার সারাংশ।

যেমন বলবে, আমি এতক্ষণ ধরে যা বলেছি তার সারাংশ করলে দাঁড়ায় এই...

বক্তৃতার মধ্যে যদি একটু হাস্যরস দাও। কিছু পরিসংখ্যান আর নির্জলা তথ্য দাও তাহলে লোকে ভাল করে শুনবে। তবে বলার ধরনটার মধ্যে নাটকীয়তা থাকলে ভাল হয়। সেই সঙ্গে একটু আবেগ তো থাকবেই। আর থাকবে শরীরের ভাষা বা বডি ল্যাংগোয়েজ।

অর্থাৎ কখনও হাত মুঠো করে আস্ফালন করবে। মুখে ধরা পড়বে কৌতুক, বিস্ময়, বিষাদ—বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

তবে নেহাত দরকার না হলে লিখিত বক্তৃতা পড়বে না। মনের থেকে বলবে। সব পয়েন্ট মনে রাখার জন্য কয়েকটি কার্ডে পয়েন্টগুলি লিখে নিতে পারো। কিন্তু দর্শক যেন মনে না করে তুমি ওই কার্ডের ওপর নির্ভরশীল।

* বক্তৃতা সব সময় রিহার্স্যাল দিয়ে নেবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করা সবচেয়ে ভাল।

ইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় হঠাৎ একদিন আমাকে অপ্রস্তুত করে বক্তৃতা দিতে ডাকে পার্টির এক দাদা। সেদিন শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে স্ট্রাইক ছিল। পার্টির দাদা ছাত্রদের স্ট্রাইক করিয়ে মাঠে জমায়েত করলেন। তারপর হঠাৎ আমাকে ডাকলেন। এইবার আমাদের এক তরুণ ছাত্রবন্ধু অমুক তোমাদের কিছু বলবে।

অপ্রস্তুত ও বিব্রত আমি সেদিন কি বলেছিলাম মনে নেই। কিন্তু ওই যে একদিন বক্তৃতা দিলাম অমনি মনে আত্মবিশ্বাস এসে গেল। আরে আমি তো পারি।

ব্যস, তারপর থেকে বক্তা হিসেবে আমার নাম হয়ে গেল। কলেজে পড়ার সময় ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে এক প্রার্থীর বিভিন্ন নির্বাচনী সভার আমি

হয়ে উঠলাম প্রধান বক্তা। এক রকম রাজনীতিতেই জড়িয়ে পড়লাম। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার দুতিনদিন আগে পর্যন্ত বক্তৃতা করে বেড়িয়েছি। এতে পরীক্ষার ফল খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বক্তৃতাটা শিখলাম।

বক্তৃতা দেবার অভ্যাস যে কেউ করতে পারে। যে আজ কিছু বলতে পারছে না, কাল যে বিখ্যাত বাগ্মী হবে না কে বলতে পারে।

তোতলা থেকে বাগ্মী

বিখ্যাত গ্রিক বাগ্মী-ডেমোস্থিনিস প্রথম জীবনে তোতলা ছিলেন। তাঁকে একজন পরামর্শ দিল তুমি মুখে নুড়ি পুরে বক্তৃতা দেওয়া প্র্যাকটিস করো। দেখবে একদিন বড় বক্তা হবে। ডেমোস্থিনিস তাই করলেন। দিনের পর দিন মুখে নুড়ি পুরে বক্তৃতা দেওয়া প্র্যাকটিস করতেন। ধীরে ধীরে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করতে লাগলেন যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মীতে পরিণত হচ্ছেন।

ভাল বলতে পারাটা রাজনৈতিক নেতাদের বড় গুণ। যত বড় বড় নেতা দেখছ প্রায় সবাই ভাল বক্তা। তবে তাদের মধ্যেও কিছু কিছু লোক বিখ্যাত হয়ে আছেন যেমন এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭)। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য ও লেখক। হুইগপার্টির সদস্য। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে ব্রিটিশ সংসদে যে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টল চার্চিল ও জার্মান একনায়ক অ্যাডলফ হিটলার বক্তৃতা দিয়ে গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে অমন ভাল বক্তৃতা না-দিলে আমেরিকায় তাঁর অমন নামই হত না। গান্ধীজিও ছিলেন ভাল বক্তা। কিন্তু তিনি ছোটবেলায় খুব লাজুক ছিলেন। এমনকী, ওকালতি পাস করে মক্কেলের হয়ে তিনি আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে একটা কথা বলেই বসে পড়েছিলেন। তাঁর জিভ শুকিয়ে যাচ্ছিল। মাথা ঘুরছিল। তারপর বার বার অভ্যাস করে তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেন।

বিখ্যাত ভারতীয় আইনজ্ঞ ননী পালকিওয়ালা ইস্কুলে পড়ার সময় খুব তোতলা ছিলেন। যখন তাঁর এগারো বছর বয়স তখন তিনি তো-তো-করে কথা বলেন। একবার ইস্কুলে একটা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এক মাস্টারমশাই ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করছেন, যারা বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চাও তারা হাত তোল।

ননী হাত তুললেন।

মাস্টারমশাই অবাক। সব ছেলেরা অবাক। ননী বক্তৃতা করবে!

মুখ টিপে সবাই হাসতে লাগল।

ননী তুমি ঠিক বলছ? তুমি নাম দেবে?

মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, স্যার। ননীর জবাব।

তোমায় পাঁচ মিনিট এক্সটেমপোর বলতে হবে।

বলব স্যার।

ননী ক্লাসের ফার্স্ট বয়। কিন্তু তাঁর একটা ত্রুটি—কথা বলতে গেলেই তোতলান। ননী সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিলেন। কারণ ননী বুঝেছিলেন, মানুষের যাতে বেশি ভয় সেই ভয় জয় করতে গেলে সেটাই বেশি করে করা দরকার।

ননী সেই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাননি কিন্তু এমন কিছু খারাপও করেননি। কিন্তু তাঁর ভয়টা কেটে গিয়েছিল। তার পর থেকে নিয়মিত অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ননী পরবর্তীকালে ভারতের সবচেয়ে বড় আইনজ্ঞ হয়েছিলেন।

বড় হয়ে যাই হও না কেন, সবার সামনে কিছু বলার অভ্যাস সব কাজেই লাগবে। সে যদি ইস্কুল কলেজের শিক্ষক হও, উকিল হও, সরকারি অফিসার হও, ম্যানেজার হও সব কাজেই তোমার বলার, আর লেখার ক্ষমতা চাই। আর এ দুটো ক্ষমতা ছোটবেলা থেকে অভ্যাসের মধ্য দিয়ে সড়গড় করে ফেলা যায়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন নেতা বিখ্যাত বাগ্মী ব্যারিস্টার দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—তাঁর ন'বছর বয়স পর্যন্ত তোতলা ছিলেন। এঁরা সবাই কঠোর অভ্যাসের দ্বারা—নিজেদের আমূল পরিবর্তন করেছিলেন।

বক্তৃতা দেওয়া শেখা যায় শুধু প্র্যাকটিস করলেই। বক্তৃতার গোড়ার কথা হল: বক্তৃতার আরম্ভটা বেশ নাটকীয় হওয়া চাই। কোনও মজার গল্প বা চুটকি দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলে বেশ ভাল হয়। তবে কোম্পানির জন্য যেসব প্রেজেন্টেশান বক্তৃতা দিতে হয় তার মধ্যে বাহুল্যের স্থান নেই। চাঁচাছোলা যুক্তি ও তথ্য দিতে হয়।

বক্তৃতা দেবার সময় সহজ সাদামাঠা ভাষায় বলবে, না টেকনিক্যাল ভাষা অর্থাৎ জারগন প্রয়োগ করবে সেটা নির্ভর করবে কাদের উদ্দেশে কখন বলছ তার ওপর। তবে লোকে সাদামাঠা ভাষায় কথা ও মজার গল্প বেশি পছন্দ করে। জীবন থেকে নানা উদাহরণ দাও, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলো—তবে যাই বলবে বিশ মিনিটের বেশি নয়। কারণ শ্রোতারা বোর হয়ে যাবে।

সেই যে এক বক্তা এক ঘণ্টা বক্তৃতা দেবার পর বললেন, সরি, এক ঘণ্টা হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি, কারণ আমার হাতে ঘড়ি ছিল না।

এক রসিক শ্রোতা বলে উঠলেন, আপনার হাতে ঘড়ি না থাক দেওয়ালে ক্যালেন্ডার তো ছিল।

শ্রোতা হওয়া আরও কঠিন

বক্তা হওয়ার চেয়ে শ্রোতা হওয়া আরও কঠিন। কারণ মানুষ স্বভাবত বড় অধৈর্য। কেন বল তো? অধিকাংশ মানুষ স্ট্রেসে ভোগে। স্ট্রেসে ভুগলে ধৈর্য কমে যায়। মানুষ তখন অধৈর্য হয়ে পায়চারি করে। রাতে ঘুম আসে না। তোমাদের মধ্যে যারা রাত একটা দুটো পর্যন্ত পড়ো তাদের মধ্যে অনেকেরই ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ অশান্তি আছে। সেজন্য ঘুম সহজে আসে না।

উদ্বেগ মনোযোগ নষ্ট করে দেয়। তখন এক নাগাড়ে বসে শোনার ধৈর্য থাকে না। এমনিতেই শ্রোতার ধৈর্য প্রথম দিকে যতটা থাকে শেষের দিকে তা কমতে থাকে। তাও পুরো মনোযোগ কখনই থাকে না। প্রথম দিকে ৫০ ভাগ থাকে। শেষ ভাগে কমে ২৫ ভাগ হয়।

তুমি যদি ভাল শ্রোতা না হতে পারো তাহলে ক্লাসের পড়াও তোমার মনে দাগ কাটবে না। এক কান দিয়ে শুনবে আর কান দিয়ে বার করে দেবে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে ক্লাসের পড়া মন দিয়ে শোনে না।

তার কারণও নানা।

স্যার বা ম্যাডাম পড়াচ্ছেন, তুমি হয়তো ফুটবল ম্যাচের কথা ভাবছ।

অথবা তোমার মনে হচ্ছে ও তো সব জানা কথা। বাড়ি গিয়ে বই পড়ে নেব।

টিফিন পিরিয়ডের পর ক্লাসগুলিতে মনোযোগ আরও কমে যায়।

কারণ, তখন খিদে পায়। বাড়ি যাবার জন্য মন উশখুশ করে। অনেকে ক্লান্ত বোধ করে।

খুব ভাল ছাত্রছাত্রীরাও মাস্টারমশাই বা দিদিমণিদের পড়ানোর মধ্যে খুব অভিনবত্ব না থাকলে মন দিয়ে শুনতে চায় না। আবার মাঝারি ছাত্রছাত্রীরা হয়তো বিষয়টি বুঝতে পারে না। অথচ প্রশ্ন করতেও বিব্রত বোধ করে।

ক্লাসের পড়াশোনা শুধু নয় বড় হয়ে যদি তুমি সরকারি অফিসার, ডাক্তার, সাংবাদিক, উকিল বা জজ হও তাহলে তোমাকে বেশিরভাগ সময় অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। শোনার ক্ষমতা বাড়াবার প্রথম নিয়ম হল বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা। খাতায় বক্তৃতা নোট নেওয়া। প্রশ্ন করা। বক্তার প্রতি আগ্রহ জাগানো। এটা করতে গেলে বক্তাকে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না।

বক্তৃতা দেবার নৈপুণ্য বাড়াতে হলে

১. রোজ মর্নিংওয়াকে যাবার সময় ফাঁকা রাস্তায় বাংলায় ও ইংরেজিতে বক্তৃতা প্র্যাকটিস করো।

২. ২০ মিনিটের বক্তৃতার জন্য একঘণ্টা রিহার্স্যাল চাই।

৩. বক্তৃতা দেবার আগে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই চোখ বুজে একটু ধ্যান করে নাও। অর্থাৎ চোখ বুজে তোমার নাকের ডগা দেখার চেষ্টা করো।

৪. গভীর নিঃশ্বাস নাও। মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ো।

৫. খুব তাড়াতাড়ি বলবে না।

৬. খুব ধীরগতিতে বা খুব চেঁচিয়ে বলবে না।

৭. শ্রোতাদের কখনও ধমক দিয়ে বা আঘাত দিয়ে কিছু বলবে না।

৮. গলার স্বর কমাবে বাড়াবে।

৯. বক্তৃতার সময় হাত নাড়াতে হবে। চোখের মণিও ঘোরাতে হবে। মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে কৌতুক। আত্মবিশ্বাস। তোমার হাতে যখন মাইক তখন তুমিই রাজা।

তিন

আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়

তুমি নিজেকে বড় মনে করো। তুমি বড় হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

বয়ঃসন্ধির সময় আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়। অথচ ছোটবেলায় তুমি খুব ডাকাবুকো ছিলে।

কেন অমন হল?

কারণ, এই বয়সে তোমার সঙ্গে বড়দের একটা প্রভেদের পাঁচিল গড়ে উঠেছে। তুমি বড়দের এড়িয়ে চলছ। বেশি কথাবার্তা বলছ না। ক্লাসে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছ। প্রায়ই পড়া পারছ না। পারবে কী করে? পড়তে যে মন চাইছে না। মাস্টারমশাই রোজ ধমক দিচ্ছেন।

সবাই তোমাকে ধমকাচ্ছে। তোমার বিচ্যুতি কেউ ক্ষমা করছে না। এমনকী, ছোটবোনের সঙ্গে ঝগড়া করলে মা এসে বলছেন, এত বড় ছেলে হলি, অথবা ধিঙ্গি মেয়ে, তোর বয়সে আমার মায়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তোর লজ্জা করে না?

অনেক সময় তুমি কেঁদে ফেল। মেয়েরা তো দরজা দিয়ে কাঁদে। কাঁদবে না। এত বকাবকি করলে রাগ হয় না বুঝি?

আসলে সব সময় নেতিবাচক কথ্য শুনতে শুনতে আত্মবিশ্বাস কমে আসে সবাইয়ের।

পড়াশোনার ওপর তার প্রভাবও পড়তে পারে।

কারণ কী বলতো?

এই বয়সটায় সব কিছু বড় একঘেয়ে লাগে। ছোটবেলায় পড়াশোনা যেমন ভাল লাগত এখন তেমন লাগে না। ফলে অমনোযোগিতা দেখা দেয়। আর অমনোযোগিতা থেকে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হতে পারে।

অনেক ছেলেমেয়ে এই বয়সে বখে যায়। একটু সাবধান ভাই। পা ফসকালে রক্ষা নাই।

বয়ঃসন্ধির সময় হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় সব কিছুর প্রতিবাদ করি। না-পারলে গুম হয়ে বসে থাকি। অসহযোগিতা করি। দুষ্টুমিটা বেড়ে যেতে পারে এ বয়সে।

সেই সঙ্গে বড়দের কথার অবাধ্য হবার প্রবণতা দেখা দেয়। তার ফলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি। জেঠামশাইর কাছে শুনতে হয় 'আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে না, একদম বাঁদর।'

আর এ ধরনের কথা শুনলে কার ভাল লাগে? এই বার বার বকুনি খেতে খেতে আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া। এতে ফল আরও খারাপ হতে পারে। পড়াশোনায় ভাল মন বসে না। সবসময় একটা চাপা রাগ, অভিমান মনের মধ্যে চেপে বসে থাকে।

মনটাকে এই অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে গেলে প্রার্থনা করাটা খুব দরকার।

প্রার্থনা করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়। আর বাড়ানো যায় প্র্যাকটিস বা অনুশীলন করে।

প্রার্থনা করা মানে তোমার অবচেতন মনকে চাঙ্গা করে তোলা। আমাদের তো তিনটে মন—চেতন মন, অবচেতন মন আর নির্জ্ঞান মন।

চেতন মন হল বাইরের মনটা। এই বইটা তুমি পড়ছ চেতন মন দিয়ে। অবচেতন মনে হঠাৎ উঁকি দিয়ে গেল, গতকাল ইস্কুলে অঙ্কের ক্লাসে অঙ্ক পারোনি বলে স্যার খুব ধমকেছিলেন। অথবা গতবছর গরমের ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে দার্জিলিঙ গিয়েছিলে সেখানে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

আর নির্জ্ঞান মন বহুকালে আগে ঘটে যাওয়া কোনওও ঘটনা, যা ভুলে গেছ। শুধু স্বপ্নের মধ্যে মনে পড়ে যায় তার কিছুটা, তাও এলোমেলোভাবে।

অনেকে বেশি বয়স পর্যন্ত একটা স্বপ্ন দেখে সে পরীক্ষার হলে বসে পরীক্ষায় কিচ্ছু লিখতে পারছে না। অথবা পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেছে সে ফেল করেছে। আসলে ইস্কুল কলেজে পড়ার সময় তার খুব পরীক্ষা-ভীতি ছিল। মনে মনে ভাবত নির্ঘাত ফেল করবো। ফেল সে করেনি। কিন্তু সেই ভয়টা সারাজীবন নির্জ্ঞান মনে রয়ে গিয়েছে।

নির্জ্ঞান মন কদাচিৎ ওপরে ভেসে ওঠে। অবচেতন মন যে কোনও সময় চেতন মনকে ঠেলে ওপরে উঠতে পারে। অথবা মনের ভেতরে বসেই সে নানা কাণ্ড বাঁধাতে পারে। ধরো, তুমি বন্ধুদের সঙ্গে কথায় কথায় বলে ফেলছ অঙ্ক, আমি পারব না, আমার কিছুই মনে থাকে না। অথবা নানা ধরনের নেতিবাচক চিন্তা মাথায় আসছে। যেমন—

আমি বড় বেঁটে। আমাকে নিয়ে বন্ধুরা ঠাট্টা করে।

আমি খুব রোগা। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবার উপযুক্ত।

আমি পড়াশোনায় ভাল নই। মাস্টারমশাই বলেছেন যা লাঙল চাষ করগে যা।

কম্পিউটর শেখা ভীষণ কঠিন।

এই ধরনের যত নেতিবাচক চিন্তা তোমার মধ্যে আসবে সেগুলি সব তোমার অবচেতন মনে জমা হবে। তার যখনই কিছু করতে যাবে অবচেতন মন তোমাকে

নার্ভাস করে দেবে। সে বলবে তুই পারবি না। পৃথিবীতে লম্বা লোক না হলে সফল হওয়া যায় না। রোগারা আর মোটা হতে পারে না। পড়াশোনায় ভাল রেজাল্ট করতে না পারলে আর কোনও কিছু করার নেই।

অথচ এসব কথার একটাও সত্যি নয়। বহু বেঁটে লোক বিখ্যাত হয়েছেন। ছোটবেলায় অনেকে রোগা থাকে। পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পেলে রোগাকে স্বাস্থ্যবান করা কঠিন কাজ নয়। পড়াশোনায় যে আজ খারাপ কাল ভাল হতে পারে। বহু ছেলেমেয়ে ইস্কুলে ভাল রেজাল্ট করেও পরের দিকে সুবিধা করতে পারেনি। আবার ইস্কুলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী থেকেও কলেজে উঠে ভাল রেজাল্ট করেছে। আর অতি সাধারণ মেরিটের ছেলেও পরবর্তীকালে বিরাট লোক হয়েছেন। স্যার উইনস্টন চার্চিল পড়াশোনায় খুব ভাল ছিলেন না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেকেন্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করেন। মার্কটোয়েন, চার্লি চ্যাপলিন, চার্লস ডিকেন্স, টমাস আলভা এডিসন, ম্যাক্সিম গোর্কি বিখ্যাত শিল্পপতি অ্যান্ড্রু কার্নেগি ম্যাট্রিক পাস করেননি।

আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি থাকুক আর নাই থাকুক, প্রার্থনা মনকে সতেজ করে, প্রফুল্ল রাখে এবং মনের শক্তির বাড়ায়। প্রার্থনা আর কিছুই নয়, অবচেতন মনের কাছে বার্তা পাঠানো।

প্রার্থনা দুরকমের। একধরনের প্রার্থনা হল নিজেকে শক্তিমান ও সফল বলে কল্পনা করা। যাকে বলা হয় 'অটো-সাজেশান।' সাজেশান শব্দটি মনোবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয় তার অর্থ ইচ্ছাকে সঞ্চালিত করা। তোমার সচেতন মনের ইচ্ছাকে তুমি তোমার অবচেতন মনে সঞ্চালিত করছ। ধরো, তুমি নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসাবে দেখতে চাও।

প্রথমে কল্পনা করো তুমি সফল হয়েছ। তুমি যা হতে চাও তাই হয়ে গেছ।

তোমার ভবিষ্যতের এই সফল মানুষের ছবিটা সব সময় তোমার চোখে ভাসবে। ধরো, তুমি একজন সফল ডাক্তার হতে চাও। কল্পনা করো, তুমি ডাক্তার হয়ে গেছ। ডাক্তারের মতোই আচরণ করছ। আর বিড় বিড় করে আপন মনে বল, আমি ডাক্তার হয়েছি। সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছি।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বিড়বিড় করে বলো :

আজ সারা দিন আমার ভাল যাবে। আমি আজকের দিনটি পুরো ব্যবহার করব। আমার কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। কারণ সব বাধা কাটিয়ে ওঠার মন্ত্র আমি জানি। আমি জানি, আমি সফল হবই। আমি হতাশ হব না।

এটি হল তোমার অতি গোপন একান্ত প্রার্থনা।

এছাড়া সমবেত প্রার্থনাও আছে। তার কথা বলি।

সমবেত প্রার্থনা কেন করব?

অনেক ইস্কুলে ক্লাস শুরু হবার আগে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও থাকেন। প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা কোনও বিষয় নিয়ে ছেলেমেয়েদের কিছু বলেন।

অনেক পরিবার বাবা-মায়েরা যদি কোনও গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে থাকেন,

তাদের প্রথা অনুসারে রোজ সন্ধ্যাবেলায় অন্তত সপ্তাহে একদিন করে পরিবারের সবাই বসে ভজন করেন।

আমার ছাত্রজীবনে আমি কয়েকবার গান্ধী আশ্রমে ক্যাম্প করতে গিয়েছি। বার দুয়েক গিয়েছি খাদিগ্রামে। সেটা বিহারে জামুই স্টেশনে নেমে যেতে হয়। আর একবার গিয়েছিলাম তখনকার বিন্ধ্যপ্রদেশের ছতরপুরে, যেটি খাজুরাহোর কাছে। রোজ ভোর চারটেয় উঠে আমাদের প্রার্থনায় যোগ দিতে হত। প্রার্থনার পর সারা দিনটা বেশ ভাল কাটত। গান্ধীজী যেখানে সভা করতেন, সেখানেই প্রার্থনা হত। প্রার্থনার পর তিনি কিছু বলতেন। দিল্লিতে এমন এক প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে গিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

সব ধর্মেই প্রার্থনার নিয়ম আছে। প্রার্থনা হয় গানের মধ্য দিয়ে তাকে বলে ভজন। অর্থাৎ ভজনা বা পূজা।

ধর্মকে ভিত্তি করে প্রার্থনার উদ্ভব হলেও প্রার্থনা যে সব সময় ধর্মীয় আচরণ তা নয়। কোনও বিশেষ ধর্মকে অতিক্রম করেও প্রার্থনা হতে পারে যেখানে সর্বধর্মের মানুষ যোগ দিতে পারে। কারণ প্রার্থনা আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য। সমস্ত মানুষের মনের বিকাশের জন্য প্রার্থনা দরকার।

আমি যে আন্দোলন শুরু করেছি তার নাম দিয়েছি লাইফ পজিটিভ অর্থাৎ ইতিবাচক চিন্তার আন্দোলন। আমরা যখন কোনওও কর্মশালা করি তখন প্রথমেই শুরু করি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রার্থনা দিয়ে। প্রার্থনাটি হল।

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।

তুমি নির্জনে বসে যদি বিড়বিড় করে বলো, **'আমি নিজেকে গড়ে তুলতে চাই। আমি সফল হতে চাই। তবে চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে। হে আমার জীবনের নিয়ন্তা তুমি আমাকে যা শুভ, যা মঙ্গলদায়ক, যার দ্বারা আমার, সমাজের ও দেশের ভাল হবে তেমনভাবে আমাকে তৈরি করো।'** দেখবে এই আন্তরিক আকুতির ফলে তোমার মনের ভেতর পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে।

আগেই বলেছি অবচেতন মনই আমাদের চালায়। ধরো, টিভিতে বিশ্বকাপের ক্রিকেট ম্যাচ দেখানো হচ্ছে। তোমার সামনে পরীক্ষা। তার জন্য পড়তে বসতে হবে। কিন্তু অবচেতন মন বলছে—এখন পড়তে হবে না। আগে খেলাটা দেখে নে। সচেতন মন বলছে— না, এখন খেলা দেখা চলবে না।

পড়তে বসতেই হবে। তুমি জোর করে পড়তে বসলে। কিন্তু অবচেতন মন পড়ে রইল টিভির দিকে। যা পড়লে মুখস্থ হল না। সচেতন মন ও অবচেতন মন এক করে যা করবে সেটাই মনে গেঁথে থাকবে। প্রার্থনা হল অবচেতন মনের ভেতরে তোমার প্রবল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে গেঁথে দেওয়া।

প্রার্থনার পিছনে আছে বিশ্বাস, তোমাকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে এই অসীম অনন্ত মহাবিশ্বের পিছনে একটা প্রবল চালিকাশক্তি কাজ করছে। সেই শক্তি সব কিছুই নিখুঁতভাবে চালাচ্ছেন। আমরা মানুষেরা সেই বিশাল অনন্ত শক্তির অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। আমি যদি বিশাল শক্তির কিছুটা সাহায্য বা আশীর্বাদ পাই

তাহলে আমার ইচ্ছাকে আমি পরিপূর্ণ করতে পারব।

প্রতিটি মানুষকেই তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য অন্যের সাহায্যের দরকার হয়। যে যত বেশি সাহায্য পায় তার কাজ তত তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আবার অপরের সাহায্য বেশি না পেলে তার কাজটা শেষ হতে দেরি হয়ে যায়। আবার সাহায্য না-পেলেও নিজে নিজে কাজটা করতে হয়।

আমি যতদিন গ্রামে ছিলাম ততদিন আমাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না। প্রথমদিকে গ্রামেই বিদ্যুৎ আসেনি। তারপর বিদ্যুৎ এল। কিন্তু আমাদের গরিব পাড়া বলে বিদ্যুতের লাইন আসেনি। অথচ আমার ইচ্ছা ছিল বাড়িতে বিদ্যুৎ আসুক। গ্রামে বিদ্যুতের লাইন এসেছে। আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি আছে অথচ আমি বিদ্যুতের সুযোগ পেলাম না। কেন, না লাইন টানা নেই। লাইন টানা নেই কেন? না, পুরসভা সহযোগিতা করেনি। পাড়ার লোকেরা উদ্যোগী হয়ে লাইন নিয়ে আসতে পারত, তারা উদ্যোগী হয়নি। কেন না, তাদের অত পয়সা নেই এর খরচ বহন করার মতো। অতএব বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা। তখন আমরা সবাই আবেদন করলাম। তদ্বির-তদারক শুরু করলাম। আমাদের পাড়ায় যেন লাইন টানা হয়। এমনি অনেকদিন ধরে আবেদন-নিবেদন করায় বিদ্যুতের লাইন মঞ্জুর হল।

প্রার্থনা ঠিক এই আবেদন-নিবেদনের মতো। আমার প্রবল ইচ্ছা শক্তি আছে এইবার কর্তৃপক্ষকে বার বার দরখাস্ত পাঠাতে হবে।

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের মহাঅধীশ্বরের কাছে আমরা আবেদন করব, তাঁর আশীর্বাদ যেন আমার জীবনের সমস্ত কাজে পাই।

তেজোহসি তেজোময়ি ধেয়ি
বীর্যমসি বীর্যংময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোহস্যোজো ময়ি ধেহি।
মনুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোহসি সহোময়ি ধেয়ি।

তুমি তেজস্বরূপ, তুমি আমার মধ্যে
তেজ এনে দাও।
তুমি বীর্যস্বরূপ, আমাকে বীর্যবান
করে তোলো।
তুমি শক্তিস্বরূপ, আমাকে শক্তিমান করো।
তুমি ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজস্বী করো।
তুমি কোপস্বরূপ আমাকে রাগী
করে তোলো।
তুমি সর্বশক্তিস্বরূপ
আমাকে সহনশীল করো।

ভালবাসা থেকে আত্মবিশ্বাস

যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। আমি পারব। আমি পারি উচ্চারণ করে বারবার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে।

আত্মবিশ্বাসী নিজেকে বিশ্বাস করে। নিজেকে ভালবাসে। আর যার আত্মবিশ্বাস নেই সে নিজেকে করুণা করে। নিজেকে ছোট মনে করে। মুই অতি ছার ভাবতে ভাবতে সে ক্রমশ ছোট হয়ে যায়। তারপর একদিন ভাবে এ জীবন আর রাখব না—সে আত্মহত্যা করে বসে।

বিনা প্রতিদানের কথা ভেবে যে নীতি হিসাবে ভালবেসে যেতে পারে তার মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে।

ভালবাসার মতো অসংখ্য বস্তু আছে এই পৃথিবীতে। ভালবাসতে পারো ঈশ্বরকে। প্রকৃতিকে, পশুপক্ষীকে। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ অরণ্যপ্রেমী ও বন্যপ্রাণীপ্রেমী ও পশুপ্রেমী আছেন। তাঁরা তাঁদের প্রেমের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য তুমি যদি কাজ করো তাহলে তারা তো তোমায় কোনও প্রতিদান দেবে না। তবু তুমি তাদের জন্য কাজ করো কেন, না তাদের ভালবাসো বলে। ভালবাসার জন্য সব কিছু করা যায়। ভালবাসা একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হয়। প্রথমে বাবা মা ভাইবোন বাড়ির কাজের লোকদের ভালবাসো। ভালবাসো ফুল গাছ। টবের ফুল গাছের চারাটিকে ভালবাসো। তাকে জল দিয়ে বড় করে তোল। ভালবাসো বাড়ির পোষা কুকুর ছাগল গরুটিকে।

এরপর ভালবাসো তোমার ইস্কুলকে। তুমি তোমার ইস্কুলকে নিয়ে যেমন গর্ব করবে তেমনি তোমার ইস্কুলও যেন তোমাকে গর্ব করে।

আমি কখনও মেধাবী ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু আমার ইস্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালবাসতাম। আমার ইস্কুল থেকে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার চেয়ে কত অসংখ্য কৃতী ছাত্র পাস করে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমাকে ইস্কুলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময় সংবর্ধনা দিয়েছে। কারণ আমি যেমন তাঁদের নিয়ে গর্ব করতাম, তাঁরাও যাতে আমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন আমি তেমন হয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও পুরনো ইস্কুল থেকে গর্ব করার মতো অসংখ্য ভাল ছাত্র বেরিয়েছে। সবাই অমর্ত্য সেন হয় না। হতে পারে না। কিন্তু যে যার নিজের ক্ষেত্রে কৃতী হতে পারে। ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, উকিল, জজ, ব্যারিস্টার, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, সমাজসেবী, সরকারি অফিসার, বিদেশে কর্মরত কত সফল মানুষ।

তোমার কি ইচ্ছা করে না, তাদের তালিকায় তোমারও নাম থাকুক। যখন বড় হবে বুঝবে ইস্কুলের মতো ভালবাসার মধুর স্মৃতি আর কিছুই নেই। কত হইচই, কত অনুষ্ঠান, প্রতিবছর নতুন ক্লাসে ওঠা, নতুন বই হাতে পাওয়ার রোমাঞ্চকর অনুভূতি। বড় হয়ে পুরনো মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন সে-কী অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগবে মনে।

পাকিস্তানের পরমাণু বিজ্ঞানী আবদুস সামাদ একজন নোবেল বিজয়ী। তিনি একবার কলকাতায় এসেছিলেন। শুনেছেন তাঁর মাস্টারমশাই এখনও বেঁচে আছেন। ঠিকানা জোগাড় করে তিনি চলে এলেন মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। লাহোরে তিনি সামাদকে পড়াতেন।

সাংবাদিক হিসাবে আমি হাজির ছিলাম সে সময়।

বৃদ্ধ মাস্টারমশাই সেদিন অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে। বিজ্ঞানী এসে তাকে প্রণাম করলেন। বললেন : স্যার, আমি সামাদ। আমায় চিনতে পারছেন? বৃদ্ধ শিক্ষকের চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি ছাত্রকে জড়িয়ে ধরলেন।

স্কুলে যতদিন পড়বে মাস্টারমশাইদের ভালবাসা পাবার চেষ্টা করো। তবে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। তোমরা সবাই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী হতে পারো না। এমনকী, সবাই জজ ম্যাজিস্ট্রেট অধ্যাপক নামী ব্যক্তিত্ব হতে পারো না। সেটা সব সময় তোমাদের হাতে নেই। কিন্তু তোমরা মানুষ হতে পারো। এটা তোমাদের হাতে।

মানুষ অর্থে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসতে পারবে যদি তুমি তাঁকে শ্রদ্ধা করো। ছাত্র মানে কী জানো? যে ছাতার মতো গুরুর দোষ ঢেকে রাখে। গুরুকে আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করি। গীতা বলছে, একমাত্র যার শ্রদ্ধা আছে সেই জ্ঞানলাভ করতে পারে। আমাদের গ্রামে নিয়ম ছিল রাস্তায় সাইকেলে করে গেলে সামনে যদি কোনও স্যার পড়ে যান তাহলে তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য সাইকেল থেকে নেমে যেতে হবে। তারপর তিনি অনুমতি দিলে আবার সাইকেলে উঠতে পারতাম।

অনেক ইস্কুলেই শেখানো হয় স্যার ক্লাসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গুডমর্নিং আর ক্লাস শেষ হলে চলে যাবার সময় থ্যাঙ্ক ইয়্যু বলতে হয়।

কিন্তু কোনও ইস্কুলে কি শেখানো হয় বাসে ট্রামে বাবা-মায়ের সঙ্গে যখন যাবে তখন একটি মাত্র সিট খালি থাকলে বাবা-মাকে বসতে দেবে। যদিও বাবা-মা চাইবেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেমেয়েকে বসাতে। অথবা তুমি একাই বাসে উঠে কোথাও যাচ্ছ। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। তুমি তাঁকে সিট ছেড়ে দেবে।

আর শেখো প্রণাম করতে, প্রশ্ন করতে আর সেবা করতে। প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

তোমরা চুপ করে থেকো না। মাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করো। না বুঝলে বলো আর একবার বুঝিয়ে দিন স্যার। বুঝলে আর একবার প্রশ্ন করে ঝালিয়ে নাও। গীতার কথা, জ্ঞান লাভ হয় প্রণিপাত প্রশ্ন আর সেবা দ্বারা।

ভালবাসা মনকে পবিত্র করে। পৃথিবীতে বহু মনীষী জন্মেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন তিনজন। বুদ্ধ, যিশু আর গান্ধী। কেন তাঁরা মানুষের হৃদয়ে চিরজাগ্রত হয়ে আছেন, তাঁরা মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসেছিলেন বলে।

অপরকে না ভালবেসে যে শুধু নিজেকে ভালবাসে সে স্বার্থপর। যে নিজেকে ও অপরকেও ভালবাসে সে আত্মবিশ্বাসী, সে প্রতিদানের তোয়াক্কা করে না। কারণ,

সে জানে নিঃস্বার্থ ভালবাসার যে আনন্দ সেটাই প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে তার কাছে আসে।

আমাদের সৌরজগতের অর্থাৎ সূর্যকে ঘিরে যে জগৎ বা মহাপৃথিবী তার মধ্যে আছে নটি গ্রহ। যে কোনওদিন বিড়লা তারামণ্ডলে গেলে এই সৌরজগৎ সম্পর্কে এক ধারণা হবে। এই যে নবগ্রহ তার মধ্যে পৃথিবীও একটা গ্রহমাত্র। কিন্তু অন্য গ্রহদের তুলনায় পৃথিবী বেশ ছোট। পৃথিবীর চেয়ে ছোটগ্রহ আর মাত্র তিনটি মার্কারি, ভেনাস আর মারস। সবচেয়ে বড় জুপিটার বা বৃহস্পতি যার ব্যাস ৮৮ হাজার ৭০০ বর্গ মাইল। সে জায়গায় পৃথিবীর ব্যাস মাত্র ৮ হাজার বর্গ মাইল।

এই যে ছোটখাটো গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী সেটিও কি আমাদের কাছে কি কম বিস্ময়!

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কেউ নেই। আপনাআপনি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী তৈরি হয়েছে। সূর্য থেকে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের কিছুটা অংশ ছিটকে পড়ে এই পৃথিবীর জন্ম। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন।

এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল সূর্যের
পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম?
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যেরে অবিরাম।

সেই যে সূর্যের থেকে খসে পড়ল গ্যাসে ভর্তি জ্বলন্ত অগ্নিগোলক পৃথিবী তা ঠাণ্ডা হতে লেগে গেল ৬০ হাজার বছর। ষাট হাজার বছর ধরে বৃষ্টি পড়ল। সেই বৃষ্টিতে চার হাজার ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেডের গরম পৃথিবী শুধু ঠাণ্ডাই হল না, বৃষ্টির জলে তৈরি হল সমুদ্র, নদী, নালা।

পৃথিবী জন্মাবামাত্রই সূর্যের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার করে ঘুরছে। সৌরজগতে সে একটি মাঝারি ধরনের গ্রহ। কমলালেবুর খোসার মতো এই পৃথিবীর খোসা ছাড়ালে হবে ৫১ কোটি বর্গমাইল। তার মধ্যে ৭১ ভাগই জল। মাত্র ২৯ ভাগ স্থল জুড়েও রয়েছে পাহাড় পর্বত। তার মধ্যে মানুষ বসতি করার জন্য যতটুকু জায়গা পেয়েছে ততটুকু জায়গাতেই ৬০০ কোটির ওপর মানুষ বাস করে।

পৃথিবী মানুষের বসবাসের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলেছে ৪৬০ কোটি বছর ধরে।

আর প্রথম প্রাণের সঞ্চার সেটি কোটি কোটি বছরের তুলনায় এমন কিছু বেশি দিনের ঘটনা নয়।

দেখো, প্রাণের আবাহনের জন্য পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কী সুন্দর প্রস্তুতি। প্রথমে তো জীবের বাঁচার জন্য অক্সিজেন কোথাও ছিল না। সূর্য থেকে ভেসে আসত অতিবেগুনি রশ্মি। মহাকাশ থেকে আসত মহাজাগতিক রশ্মি। ওই রশ্মি আটকাবার জন্য তৈরি হয়ে গেল ওজোন-আবরণ। আর তৈরি হল জীবের জন্য

অতি প্রয়োজনীয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, পটাসিয়াম গ্যাস। অবশেষে ১১০ কোটি বছর ধরে প্রস্তুতির পর ৩৫০ কোটি বছর আগে ছত্রাক ও উদ্ভিদ জন্মাতে শুরু করল। তারপর মাত্র সাড়ে বাইশ কোটি বছর আগে প্রথম ফুল ফুটল পৃথিবীতে।

প্রাণীজগতের বিবর্তনের ইতিহাস দেখলেও অবাক হতে হয়। প্রথমে এল কেঁচোর মতো এককোষী প্রাণী। তারপর ঝিনুকের মতো প্রাণী, সমুদ্রের প্রবাল, তারপর মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ। তেইশ কোটি বছর আগে জীবনযুদ্ধে হেরে একদল ক্ষুদ্রপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেল। আবার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এমন ক্ষুদ্র প্রাণী বিবর্তিত হয়ে অতিকায় প্রাণীতে রূপান্তরিত হল।

ডাইনোসর যুগ

তোমরা অনেকে স্পিলবার্গের জুরাসিক পার্ক ছবিটা দেখেছ। আদিম পৃথিবীতে ডাইনোসরদের যুগের নাম দেওয়া হয়েছে জুরাসিক যুগ। ২৫ কোটি থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে বৃহদাকায় প্রাণী ডাইনোসোর গোষ্ঠী পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত।

এদের মধ্যে ছিল ডিপলোডোকাস, টাইরানোসেরাস, অ্যাপাটোসেরাস, ব্রোন্টোসেরাস আর ডায়নোসেরাস।

এরা কেউ কেউ ছিল উচ্চতায় ৯০ ফুট অর্থাৎ এক একটা নয়তলা বাড়ির সমান উঁচু। আর তিন বগি ট্রামের সমান লম্বা। ওজন ৮০ থেকে ১৩০ টন। এইসব প্রাণীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কেন? না। সাড়ে ছ কোটি বছর আগে অসংখ্য উল্কাপাতের ফলে হাজার বছর ধরে পৃথিবী ধুলোয় ঢেকে থাকে। নিরামিষাশী এই অতিকায় প্রাণীরা আর খাদ্য পেল না। খাদ্যের অভাবে তারা একে একে মারা যেতে লাগল।

পৃথিবীতে একটা সময় কয়েক লক্ষ বা কোটি বছর পরপর একটা তুষার যুগ আসত। অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু থেকে বরফ এগিয়ে এসে স্থলভাগ ঢেকে দিত। আবার এক সময় তুষার যুগের অবসান হত। আবার বরফের ঢাকা থেকে পৃথিবীর স্থলভাগ প্রকাশ হয়ে পড়ত।

ভাঙা-গড়ার পৃথিবী

আমাদের আজকের পৃথিবী কোটি কোটি বছরের ক্রমাগত ভাঙা গড়ার সৃষ্টি। একটা সময় পৃথিবীর সব মহাদেশগুলো ছিল পরস্পরের লাগোয়া।

জুরাসিক যুগে দেখা গেল মহাদেশগুলির ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্র ঢুকে পড়ে তাকে একে অপরের থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের মতে প্রাচীন জগতের জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে বিবর্তিত হয়েছে। এইভাবেই বানর থেকে বিবর্তিত হতে হতে মানুষ হয়েছে। সেই আদিম মানুষ বিবর্তিত হতে হতে

আজকের সভ্য আধুনিক মানবে পরিবর্তিত হয়েছে। আর এই বিবর্তনটা ঘটেছে মাত্র পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে। মাত্র বলছি এই কারণে যে পৃথিবীর বয়সের তুলনায় আদিম মানুষ হোমোসেপিয়েনদের আবির্ভাব এইতো মাত্র সেদিনের। হোমোসেপিয়েন মানে যে আদিম মানুষরা প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে। তারা হাত দিয়েই শিকার করত। কাঁচা মাংস খেত। হাড় ও গাছের ডালকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। খ্রিস্টজন্মের তিনচার হাজার বছর আগে সেই মানুষই বেদ উপনিষদ লিখছে। এটাই সভ্যতার বিবর্তনের ফল। তারপর থেকেই তো সভ্যমানুষের জয়যাত্রা। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস মাত্র চারশো বছরের।

বিপ্লব ঘটালেন ডারউইন

সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে খ্রিস্টান চার্চ যে তত্ত্ব দিয়েছিল ডারউইন তা চুরমার করে দিয়ে তাঁর 'প্রজাতির উৎপত্তি' (origin of specis) বইটি লিখলেন। ডারউইন বললেন, মানুষের উৎপত্তি প্রাণিজগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। পরিবেশ ও ভূগোলই প্রাণীকে পরিবর্তিত করে।

হিন্দুরা একথা কিন্তু বহু আগে বলে গিয়েছিলেন। অবশ্য কিছুটা ধর্মের ছোঁয়া দিয়ে। প্রলয়ের ফলে জলময় বিশ্বের প্রথম প্রাণি মাছ। সেই কেশব অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই দশরূপের একটি। মাছের পর কুমির তারপর স্থলচর প্রাণী বরাহ, সবশেষে কৃষ্ণ যে নররাক্ষস হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন সেই রাক্ষস মানুষেরই আদিম বন্যরূপ।

বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে যেমন সত্য, তেমনি বিশ্বসৃষ্টি বিবর্তনের কোটি কোটি বছরের ইতিহাসও কিন্তু বিস্ময়কর। বিশ্ব যেন তৈরি হয়েছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। বার বার, গড়া, বার বার ভাঙা। কিন্তু কোনও শিল্পী যখন কিছু আঁকতে বসেন, তখন হয়তো মনের মতো ছবিটি আঁকতে পারছেন না বলে বার বার আঁকেন আর কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দেন। আবার আঁকেন, আবার ছেঁড়েন। অবশেষে ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে এক অনিন্দ্যসুন্দর ছবির জন্ম হয়। বার বার ভাঙাগড়ার ফলে এই পৃথিবী যে কী অসাধারণ সুন্দর তা পথে পথে বেরিয়ে না পড়লে বোঝা যায় না। আমি এক সময় বার বার বেরিয়ে পড়তাম এই নয়ন-ভোলানো রূপ দেখব বলে।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী

মনে আছে আমেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখে আমি নির্বাক বিস্ময়ে, অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। পরপর দুবার আমেরিকা গিয়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখিনি। সবাই বলতেন, সে কী আমেরিকা ঘুরলে আসল জিনিসটাই দেখলে না।

তৃতীয়বারের যাত্রায় আমি ঠিক করলাম এবার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যাবোই। লসভেগাস শহর থেকে বারো সিটারের একটি ছোট্ট প্লেনে চড়ে পাহাড়ের ওপর দোল খেতে খেতে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে নামলাম।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কলারডো নদীর ধারে দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়। ভৌগোলিক ভাষায় এর নাম গর্জ বা গিরিখাদ। দেখে মনে হবে সোনালি ইট দিয়ে কে যেন নিপুণভাবে গিরিখাত তৈরি করেছে। সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে। ২৭৭ মাইল জুড়ে এর বিস্তার।

২০০ কোটি বছর আগে থেকে প্রকৃতির এই বিচিত্র বিস্ময় তৈরি হতে থাকে। বিবর্তন চলে ৬০ লক্ষ বছর পর্যন্ত।

এই পৃথিবীর কোথাও অতল সমুদ্র, কোথাও দুরন্ত নদী, কোথাও বরফের পর বরফ। সাইবেরিয়ায় গিয়ে দেখে এসেছি পেরমাফ্রস্ট। মাটির নীচে বরফের স্তূপ। মাটি খুঁড়লেই পাবে বরফ। ওপরে সবুজের আস্তরণ। ওপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। অথচ ৪৫ হাজার বছর ধরে মাটির নিচে এভাবে সঞ্চিত হয়েছে বরফ।

আবার প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে দেখেছি কী সুন্দর সবুজ দ্বীপ। কিন্তু তার অভ্যন্তরে রয়েছে আগ্নেয়গিরি। যখন তার অগ্ন্যুৎপাত হয় তখন ভেতরের তরল উত্তপ্ত লাভা নদীর মতো গড়িয়ে পড়ে। ঠিক বন্যার জলের মতো লাভার স্রোত এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। মনে হয় লাল সোনা গালিয়ে এই নদীটা তৈরি হয়েছে। পৃথিবীতে এমন ৫০০ আগ্নেয়গিরি আছে যারা এখনও সজীব।

দেখেছি ইংলন্ডের লেক ডিস্ট্রিক্ট। দুপাশে একের পর এক লেক তার পাশে পাহাড়। একবার গিয়েছিলাম কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে। লিডার নদী বয়ে যাচ্ছে। আর আকাশটা এত নিচে নেমে এসেছে যে মনে হচ্ছে হাত দিয়ে ধরা যাবে।

একবার জাহাজে চেপে সাতদিন ধরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ঘুরছিলাম। রাতে জাহাজের ডেকে শুয়ে যদি আকাশের তারার দিকে তাকাও তাহলে দেখবে জাহাজের দুলুনিতে তারারা একবার তোমার কাছে চলে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে।

আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই যখন দেখি এই সব তারারা লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে আছে। অথচ তারা আমার চোখের সামনে। সবচেয়ে কাছের তারাটিই আছে ৪ কোটি কিলোমিটার দূরে। সবচেয়ে বড় তারাটির ব্যাস ২৬ কোটি মাইল। সূর্যের চেয়ে ৩০০ গুণ বড়।

রবীন্দ্রনাথের গানটি আমার বারবার তাই মনে পড়ে :

আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
অসীমকালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

অসীম শক্তির প্রতীক সূর্য

এই পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাবিশ্ব বা সৌরজগৎ। তার কেন্দ্রস্থলে সূর্য—অসীম শক্তির প্রতীক সেই সূর্যই সৌরজগতের অস্তিত্বের মূলে। সূর্যকে কেন্দ্র করেই নটি গ্রহ তার চারপাশে ঘুরছে। সৌরজগতের এই সীমা ৩৬৬ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। সূর্যকে ঘিরে রয়েছে যেমন গ্রহ, তেমনি অসংখ্য নক্ষত্র। এক একটি নক্ষত্র সূর্য থেকে এত দূরে আছে যে সূর্য প্রদক্ষিণ করতেই তার লেগে যাচ্ছে সাড়ে তিন বছর।

গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়াও মহাকাশে আছে উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা।

এই বিশাল মহাকাশ এখনও আমাদের কাছে বিশাল রহস্য। মহাকাশের কিছু কিছু শক্তি যেমন মহাকাশ রশ্মির উৎপত্তি কোথায় কীভাবে হয় আমরা জানি না। কোটি কোটি বছর ধরে এই যে বিশ্বপ্রকৃতি নিজেকে বার বার নতুন সাজে সাজাচ্ছে, বার বার নিজেকে বিবর্তিত করছে, এক সৃষ্টি মুছে ফেলে আর এক সৃষ্টির দিকে চলেছে তার অপাররহস্যকেই অনেকে সৃষ্টিকর্তার হাতের কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। মানুষ যদি আজ শক্তির উৎস বলে গণ্য হয় তাহলে সে মানুষ তো এই প্রকৃতিরই একটি শক্তি। প্রকৃতি সমগ্র। মানুষ তার একটি ক্ষুদ্র অংশ। অংশ সব সময়ই সমগ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে। আর এই কৃতজ্ঞতার প্রকাশই প্রার্থনা। তবে প্রার্থনা যদি করতেই হয় তাহলে সেই শক্তির কাছে আমরা কখনও ভিক্ষা চাইব না। চাইব মনোবল। নিজের কাজ নিজে করার শক্তি। আমরা বলব:

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা।
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

প্রার্থনায় যদি নিজের পার্থিব উন্নতির জন্য কিছু চাও অর্থাৎ আমাকে আরও টাকা দাও, আমার শত্রুকে শেষ করে দাও, আমায় পরীক্ষায় পাস করিয়ে দাও তাহলে সেটা হবে প্রার্থনার উদ্দেশ্যকে নাকচ করে দেওয়া। প্রার্থনার উদ্দেশ্য মনের উন্নতি।

ঈশ্বর সকলের

ঈশ্বর থাকুন না থাকুন তা নিয়ে অনর্থক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ঈশ্বর আছেন কিনা, থাকলে তিনি সাকার না নিরাকার, কোথায় তার

বাড়ি মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় না প্যাগোডায়? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেও নানা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে হয়। ঈশ্বর থাকলেও তিনি শুধু হিন্দুর ঈশ্বর নন, মুসলমানের বা খ্রিস্টানের ঈশ্বর নন। তিনি সব মানুষের। সব ধর্মে বিশ্বসৃষ্টির নানা অলৌকিক কথা আছে। কিন্তু বিশ্ব তো একটাই। খ্রিস্টান মতে বিশ্বের আদিমতম মানব-মানবী যদি আদম ও ইভ হয় তাহলে পৃথিবীর সব লোকই তো তাঁদের সন্তান। তবে খ্রিস্টানরা একদা হিন্দুদের ধর্মান্তর করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন কেন?

তবে শ্বেতাঙ্গরা কেন আফ্রিকার কালো মানুষদের ওপর এত অত্যাচার করে এসেছে? তারা কী আদম ইভের সন্তান নয়? আবার আদম ইভ কি সাহেব মেম ছিল? তাহলে আমরা কালো লোকেরা কোথা থেকে এলাম? আমাদের পৃথিবী ও আমাদের পূর্বপুরুষ কি আলাদা?

আসলে ধর্মে ধর্মে এই ভেদ, নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে অন্যদের হ্যাক থু করা, অন্যধর্মের লোকদের হিদেন, ম্লেচ্ছ, কাফের বলে তাদের দূরে ঠেলে দেওয়া আর যেই সে আমার ধর্ম গ্রহণ করল অমনি তাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা, এসব হয় ছেলেমানুষি না-হয় জাতের নামে বজ্জাতি।

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি আমার নিজস্ব ঈশ্বর। কোনও ধর্মের ছাপ দিয়ে আমি তাঁকে সংকীর্ণ করি না। আমি মনে করি এই বিশাল বিরাট মহাপৃথিবী বা মহাবিশ্বের অন্তরালে একটি মহাশক্তি আছে যিনি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি মানুষকে তার বিদ্যা, বুদ্ধি বিচক্ষণতা ও যথাসম্ভব শক্তি দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষই সেই অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবার তাঁর আর কিছু করার নেই। মাস্টারমশাই সারা বছর পড়িয়েছেন। এবার যখন ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে তখন তিনি ইনভিজিলেটরের ভূমিকায়। তাঁর কাজ হচ্ছে কোনও ছাত্র টুকছে কি না, পাশের ছেলের সঙ্গে কথা বলছে কি না তা লক্ষ্য রাখা।

ঈশ্বরও তাই আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছেন। না, আমরা মন্দিরে পুজো দিচ্ছি কি না, মসজিদে গিয়ে জুম্মাবারে নামাজ পড়ছি কি না, অথবা রবিবারে করে চার্চে যাচ্ছি কি না তা দেখা নয়। তিনি দেখছেন আমরা মানবিক গুণ কতটা বজায় রাখতে পেরেছি।

কোটি কোটি বছর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে মানবজন্ম সেই মানব সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের যুগ এই একুশ শতকে তুমি বড় হয়ে উঠছ।

ঈশ্বর দেখছেন তুমি জীবনের এই শ্রেষ্ঠ ধন এই মানবজন্মের সুযোগগুলো পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারছ কি না। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তুমি তোমার কৃতজ্ঞতাবোধকে প্রকাশ করতে পারছ কি না। যদি পারো তাহলে তুমি নিজেই তা থেকে আনন্দ পাচ্ছ। অসীম সমুদ্রের অনন্ত ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে তোমার ভাল লাগলে তোমারই লাভ, সমুদ্রের কোনও লাভ লোকসান নেই। সে আপন

খেয়ালেই এমন ঢেউ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। যাবে। ঈশ্বরের তোমাকে দরকার থাক না থাক তোমার তার চেয়েও বেশি করে দরকার ঈশ্বরকে। কারণ ঈশ্বর এক সুন্দরের উপলব্ধি। তাঁর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তুমি তোমার মূল্যবোধেরই পরিচয় দিচ্ছ। যারা ঈশ্বরকে মানে না অথবা ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে ঈশ্বর তাঁদের কখনই অভিসম্পাত দেন না। কিন্তু কেউ যদি মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের কর্তব্যটুকু পালন না করে, শুধু নিজের সুখের জন্যই সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়ে দেয় তাহলেই দেবতা রুষ্ট হন।

ধর্ম ও ঈশ্বর

ঈশ্বর যে মানে সে কোনও ভুল করে না। ঈশ্বর যে মানে না সেও কোনওও অন্যায় করে না। কিন্তু আচারসর্বস্ব সংকীর্ণ ধর্ম সম্পর্কেই আমার আপত্তি। একুশ শতকের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই ধর্ম জাতপাত দিয়ে মানুষকে বিচার করবে না। তেমনি মন্দির মসজিদ গির্জার জাঁকজমক দেখে ধর্মের মূল্যায়ন করবে না। প্রতিটি ধর্মের বাইরের কতগুলি মানবিক আচার-আচরণ আছে সেগুলি মানুষই সৃষ্টি করেছে আর যুগে যুগে একশ্রেণীর মানুষ নিজেদের সুবিধামতো এই ধরনের আচার-আচরণের সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে। প্রকৃত ধর্ম হল মানুষের মঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিজেদের মঙ্গল খোঁজা।

বাইরের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে দেবতাকে পাওয়া যায় না। তাকে পেতে গেলে সাধারণ মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রামের শামিল হতে হয়। তাদের পাশে দাঁড়াতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন :

ভজনপূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারোমাস।

রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে।
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;
তাঁর মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধুলার 'পরে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি দিয়ে বার বার প্রার্থনা করব— প্রার্থনা আমরা করব— সেই সঙ্গে অনুভব করব গণদেবতার পুজোই আসল দেবতার পুজো।

প্রকৃত ধার্মিক কে?

প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি তিনিই যিনি মনে করেন :

* ঈশ্বর এক, তাঁকে বিভিন্ন ধর্মের লোক বিভিন্ন নামে ডাকে।
* সব ধর্মই সমান। সব ধর্মের উদ্দেশ্য এক। কোনও ধর্ম কোনও ধর্মের চেয়ে বড় নয়।
* সব ধর্মের উদ্দেশ্যই মানুষকে ভালবাসা। সৎ জীবনযাপন করা। একজন সৎ মানুষই প্রকৃত ধার্মিক মানুষ।
* স্বধর্মে নিষ্ঠাবান হলে কেউ অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারেন না।
* মৌলবাদীরা অন্যধর্মের প্রতি সহনশীল নয়। মৌলবাদীরা তাই ধর্মভ্রষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট।

চার

প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস

সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারা সেবিতো
দৃঢ়ভূমিঃ।।
দীর্ঘকাল ধরে অবিরাম যত্নের সঙ্গে
চেষ্টা করলে অভ্যাস সুদৃঢ় হয়

পাতঞ্জলঃ যোগসূত্র

আমি পৃথিবীর যে শহরেই যাই দেখি একটি দুটি ছেলেমেয়ে, কখনও বা আরও অনেকজন ভোরবেলা উঠে রাস্তার ধার দিয়ে জগিং করছে। তাদের পরনে দৌড়বার জুতো মোজা। পরনে ট্র্যাক স্যুট। বুঝতে পারি এরা হঠাৎ আজ দৌড়চ্ছে না। নিয়মিত প্র্যাকটিস করে।

সকালের এই সময়টা কত ছেলেমেয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে। অনেক বাড়িতে এই ভোরবেলাটা কোনও মেয়ে গানবাজনা প্র্যাকটিস করছে। যে কোনও জিমনেসিয়ামে গিয়ে দেখি এই সাতসকালে কিছু ছেলেমেয়ে এসে ব্যায়ামচর্চা করছে।

আসলে যারা অনুশীলন করে তারাই দক্ষতা অর্জন করে। কঠোর অনুশীলনের কোনও বিকল্প নেই। একজন নৃত্যশিল্পী যখন স্টেজে উঠে দুঘণ্টা নাচ দেখায় তার পিছনে থাকে অন্তত দুশো ঘণ্টার অনুশীলন। এমনকী, প্রজাতন্ত্র দিবসে ময়দানে যখন প্যারেড হয় রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি স্যালুট নেন, তার আগে একবার মহড়া হয়ে যায়। কারণ মহড়া ছাড়া, অনুশীলন ছাড়া কিছু করলে বলে স্টেজে উঠে মেরে দেওয়া। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দেয় কিন্তু তার মহড়া দেয় না। দেখা যায় তিনঘণ্টা সময়ের ভেতর তারা লিখতে পারছে না। কোনও প্রশ্নের উত্তর বেশি হয়ে যাচ্ছে কোনওটা কম হচ্ছে। এজন্য ইস্কুলের হাফইয়ার্লি বা অ্যানুয়ালে বসার আগে বাড়িতে একবার দুবার মহড়া দিয়ে নেওয়া উচিত।

অ্যাথলেট যাঁরা এশিয়াডে বা ওলিম্পিকে পদক ছিনিয়ে আনেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবন কাটে কঠোর অভ্যাসের মধ্য দিয়ে। বিখ্যাত ডিসকাস ছুড়িয়ে নীলাম যশোবন্ত ১৫ বছর ধরে দিনরাত প্র্যাকটিস করে আসছেন। এই পাঞ্জাবি ভদ্রমহিলার নবছরের ছেলে আছে। তিনি ডিসকাস ছোড়ায় বুশান এশিয়াডে সোনা জিতেছিলেন। এটা

সম্ভব হয়েছিল তিনি গৃহবধূ হবার পরও অনুশীলন বন্ধ করেননি বলেই। বুসানের পর পদকজয়ী কেরলের লং জাম্প চ্যাম্পিয়ন মেয়ে অঞ্জু জর্জ ও তাঁর স্বামী রবার্ট দুজনেই এখনও নিয়মিত প্র্যাকটিস করে যান। বুশানে অঞ্জুর লং জাম্প রেকর্ড ৬.৫৩ মিটার। কিন্তু তা বলে নিয়মিত অনুশীলন করা ছাড়েননি। কেরলের আর একজন মেয়ে দৌড়বিদ কে এম. বীণামোল বারো বছর বয়স থেকে প্র্যাকটিস করে আসছেন। তবেই না তিনি এশিয়ান গেমসে সোনা পান। তিনি ২০০৪ সালের ওলিম্পিকের জন্য এখন থেকে তৈরি হচ্ছেন।

এশিয়ান গেমসে আর এক সোনা জেতা মেয়ে অঞ্জু বলেন, লং জাম্পে শুধু দুটো পা থাকলেই চলে না। চাই অনড় প্রতিজ্ঞা, সীমাহীন আশা। অঞ্জু ৬.৫৩ মিটার পর্যন্ত লাফিয়ে তবেই ওলিম্পিকে যাবার কথা ভাবছেন।

এশিয়ান গেমসে আর এক বিজয়িনী ভারতীয় মহিলা নীলম যশোবন্ত। তিনি চাকরি করেন। তাঁর বড় ছেলে আছে। তবু তিনি প্র্যাকটিস করার জন্য বিভিন্ন শিবিরে শিবিরে ঘুরছেন।

প্র্যাকটিস ব্যাপারটাই হল খুব পরিশ্রমের কাজ। যারা অলস, আরামপ্রিয় তারা সারাজীবন পিছিয়ে পড়ে থাকে। অথচ আলস্য ও আরামই মানুষের স্বভাব। মানুষকে আরও আরামপ্রিয় করে তুলছেন বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদরা। এটি বিজ্ঞানের খারাপ দিক। তুমি যত পরিশ্রম কম করবে ততই তোমার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে যাবে। আদিম মানুষের দাঁত খুব শক্ত ছিল। কারণ, তাকে কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেতে হত। যেই সে রান্না করতে শিখল। তখন আর রান্না করা খাবার খেতে শক্ত দাঁত লাগত না। তাই দাঁতের ধার গেল কমে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইয়োহিপাপস নামে এক অতিকায় জন্তু ছিল। এরা বেশি নড়াচড়া করতে পারত না। আগে এই জন্তুর ছিল পাঁচটা করে আঙুল। তারপর খাবার দাবারে ঘাটতি পড়ায় সে ছোটাছুটি শুরু করল। আর এই ছোটাছুটির দরুন তার পা মজবুত হয়ে উঠল। বেশি ছোটাছুটি করার জন্য তার খুব খিদে পেতে লাগল। সে খুব খাওয়া দাওয়া শুরু করল। আগে তাঁর দাঁত ছিল না। এখন তার দাঁত গজাতে শুরু করল। শক্ত জিনিস চিবিয়ে খেতে খেতে ইয়োহিপাসের দাঁতের চোয়ালও শক্ত হয়ে উঠল। তার পায়ের পাঁচটা আঙুলের আর দরকার হল না। একটি একটি করে তার আঙুল লোপ পেতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তার আঙুল এসে দাঁড়াল তিনটিতে। মাঝের আঙুলটি মোটা হয়ে গেল। পাশের আঙুল দুটো ছোট। শেষমেশ তিনটে আঙুল মিলে সেটা খুরে পরিণত হল।

আগে হাতির ছিল চারটে করে দাঁত। গণ্ডারেরও ছিল তিনটে শিঙ। কুমির ছিল লম্বায় ত্রিশ হাত। বাঘের মুখের দুপাশ থেকে দুটো করে দাঁত বেরিয়ে থাকত। তার দেহ ভারী ছিল। তেমন দৌড়তে পারত না। যখন বাঘ জোরে দৌড়তে শিখল তখন তার দুটো লম্বা দাঁত ছোট হয়ে গেল।

মানুষের মধ্যে যারা হাতের কাজ করে তাদের হাতের পেশী শক্ত হয়। তেমনি তাদের মস্তিষ্কের কাজ তেমন হয় না বলে মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ছোট হতে পারে।

অনেকে প্রতিভা নিয়ে জন্মান। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই প্রতিভা অর্জন করেন। নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলন করলে মানুষ নিজেকে বদলাতে পারে।

দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হলেন কী করে? না, তিনি বছরের পর বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা আসলে মনঃসংযম অর্জন করা। বাল্মীকি যখন দস্যু ছিলেন তখন তাঁর মনের মধ্যে ছিল দস্যুর ভাব। অর্থাৎ অস্থিরতা, লোভ, হিংসা। মন থেকে এই ভাবগুলি সরিয়ে তাঁকে আনতে হল মনোযোগ, উপলব্ধি করার ক্ষমতা, মমতা, ভালবাসা, জ্ঞান তথা বিদ্যা। এমন কোনও ম্যাজিক নেই যাতে করে রাতারাতি একটা লোক বদলে যেতে পারে। এর জন্য ধীরে ধীরে তাকে বদলাতে হয়।

মনকে বাইরের চিন্তা ঢেকে রাখে। আমার কাছে যে সব ছেলেমেয়ে এসে বলে আমার কিছু মনে থাকে না। পড়লে মুখস্থ হতে চায় না। আমি বলি এর জন্য তোমাদের মনকে বাইরের নানা চিন্তা থেকে মুক্ত করতে হবে। পড়ার সময় যদি ক্রিকেট ম্যাচের কথা ভাবো তাহলে পড়া মনে থাকবে কেন? মনকে চিন্তাশূন্য করার জন্য আমি সবাইকে সহজ ধ্যান প্র্যাকটিস করতে বলি।

কিন্তু কয়েকদিন প্র্যাকটিস করার পর অনেকে বলে স্যার, তাও ফল পাচ্ছি না। আমি বলি, এটা কী এতই সোজা। স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষ দুবছর ধরে ধ্যান প্র্যাকটিস করেও ফল পাননি বলে রামকৃষ্ণের কাছে কত অভিযোগ করেছেন। তারপর অনেক অভ্যাসের পর তাঁর সমাধি হল। সমাধি মানে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা।

ভগবান বুদ্ধ বারো বছর ধরে তপস্যা করে তবে বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাল্মীকির দেহ যেমন উই-এর ঢিবিতে ঢেকে গিয়েছিল, তেমনি বুদ্ধদেবও না খেয়ে খেয়ে কঙ্কালের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

তপস্যা মানেই হচ্ছে কোনওও একটা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য লাগাতার অনুশীলন। যারা ব্যায়ামবীর তাদের দেহে যে মাসল দেখতে পাও, বাইসেপ, ট্রাইসেপ এসব কি একদিনে হয়েছে? কত বছর ধরে নিয়মিত ব্যায়াম করে তবে বডি বিল্ডিং হয়।

আমার এক ম্যাজিসিয়ান বন্ধু আশিস মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসে। মাঝে মাঝে, আশিস একটা ম্যাজিক দেখাও তো। আশিস সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছ থেকে একটি টাকা চেয়ে নিয়ে সেটিকে সবার চোখের সামনে অদৃশ্য করে আবার আমার পকেট থেকেই টাকাটা বার করে তাক লাগিয়ে দেয়। এটা হল হাত সাফাইয়ের খেলা। এর মধ্যে মন্তর নেই। শুধু প্র্যাকটিস।

ট্রামে বাসে পকেটমাররা যেমন পকেট থেকে কখন মানি ব্যাগ তুলে নেয় লোকে জানতে পারে না, এটাও তেমনি। পকেটমারকেও দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। প্র্যাকটিস করেই সে সাফল্যও অর্জন করেছে। কিন্তু এই প্রতিভাটা সে ভুল ও অন্যায় কাজে প্রয়োগ করেছে এই যা।

জিমন্যাস্টিক তোমরা অনেকেই দেখেছ। এক একটি মেয়ে হাড়গোড় বেঁকিয়ে নিজেকে বাংলা দ-এর মত করে ফেলে। তুমি করতে যাও—পারবে না। কারণ

ও মেয়েটি কত বছর ধরে অনুশীলন করছে জানো? অন্তত চার-পাঁচ বছরের অনুশীলনের পর তবেই এমন ভাবে নিখুঁত খেলা দেখানো যায়। কিন্তু মেয়েটি যখনই প্র্যাকটিস ছেড়ে দেবে, আর পারবে না। মানুষ নিয়মিত অনুশীলন করে কী যে অসাধ্য সাধন করতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। এদের প্রত্যেকের নাম গিনেস বুক অফ ওয়ার্লড রেকর্ডে পাবে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে গ্রান্ট এডওয়ার্ডস নামে এক ভদ্রলোক নিউ সাউথ ওয়েলসের রেল যাদুঘরের রেল লাইনে ১২০ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা আর ২২১ টন ওজনের একটি ট্রেনকে একা টেনে নিয়ে যান। এটা প্র্যাকটিস করতে তাঁর বছরের পর বছর লাগে। প্রথমে আধ টন, পরে এক টন, এইভাবে বাড়াতে বাড়াতে, ২২১ টনের ট্রেনটিকে তিনি টানতে পেরেছিলেন।

ছোটবেলায় এক সার্কাসে দেখেছিলাম মীরা রক্ষিত নামে একটি মেয়ে বুকের ওপর হাতি তুলছেন। ইরানের খলিল ওখাবি দু'টনের ওপর এক হাতি বুকের ওপর তুলেছিলেন। খলিল গেরি কটন সার্কাসে কাজ করতেন। বুকের ওপর হাতি তুলতে গেলে বুকের ওপর কাঠের এক পাটাতন পাতা হয়। হাতি সেই পাটাতনের ওপর ওঠে।

তুমি বুকের ওপর একটা বাছুরও তখন তুলতে পারবে না। কিন্তু দিনের পর দিন একটু একটু করে অভ্যাস করলে একদিন পারবে। একটু একটু করে ওজন চাপিয়ে সইয়ে নিতে হবে।

এই যে বেলজিয়ামের সেই ওয়েটলিফটার ওয়াল্টার সারফিউল দাঁত দিয়ে ৬২০ পাউন্ডের (প্রায় সাতমণ) ভার তুলতেন তার পিছনেও আছে ওই একই প্রক্রিয়া।

বাজার থেকে দশ কেজির আনাজপত্র আনতে গিয়ে তুমি হিমশিম খেয়ে যাবে। কিন্তু টম গ্যাসকিন ১৩৭ পাউন্ডের মাল মাথায় নিয়ে ছয় ঘণ্টা বসেছিলেন।

যখন কোনও বড় তবলচি তবলা বাজান তখন তবলা বাজাবার সময় তিনি এত জোরে আঙুলের কাজ করেন যে আঙুলগুলো আলাদা করে দেখাই যায় না। তাঁর দুটো তবলা থাকে। ডুগি আর বাঁয়া। কিন্তু এক সঙ্গে ৪০০টি ড্রাম ১৬ সেকেন্ডের মধ্যে বাজিয়েছেন এক তবলচি। এই তৎপরতা সম্ভব হয়েছে দিনের পর দিন অনুশীলনের ফলে।

দাড়ি কাটতে নাপিত গাল কাটল

কিছুদিন আগে আমি আমার বাড়ির কাছে এ বি এ সি মার্কেটে চুল কাটতে গিয়েছি। চুল কাটা হয়ে গেলে নাপিত ছেলেটি বলল, আপনার দাড়িটা কামিয়ে দেব? আমি বললাম, দাও। দাড়ি কামাতে গিয়ে ছেলেটি আমার গাল এমনভাবে কেটে ফেলল যে রক্ত আর থামে না। ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। প্রচুর ওষুধপত্র খেতে হল। মুখের দাগটা ভাল করে মিলোয়নি অনেকদিন। বুঝলাম ছেলেটি আনাড়ি। কোনও অনুশীলন না-করেই কাজ করতে এসেছে।

নিজের দাড়ি নিজে কাটতে সব লোকেরই পাঁচ থেকে দশমিনিট লাগে। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের বিখ্যাত নরসুন্দর টম রডেন এক ঘণ্টার মধ্যে ২৭৮ জনের দাড়ি কেটে দিয়েছেন। প্রতি দাড়ির পিছনে সময় দিয়েছেন ১২ দশমিক ৯ সেকেন্ডের মতো। এই দ্রুত নিখুঁত কাজ করার পিছনে যে দীর্ঘদিনের অনুশীলন আছে তা বলাই বাহুল্য। ওই লন্ডনের আর এক নাপিত ট্রেভর সিচেল ঘণ্টায় ১৮ জনের চুল কাটার হিম্মত রাখেন।

ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের কত না ঘটনা পৃথিবীতে ঘটছে। কেউ ১৫৬ ফুট উঁচু, চার হাজার ফিট জায়গা জোড়া বাবল তৈরি করেছেন, কেউবা ৬৫৬ ফুট দূরে ডিস্ক ছুড়ে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। কেউ ৩২৭ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু থেকে ছোড়া একটা আঙুর হাঁ করে মুখের ভেতর গিলে ফেলেছেন। ভারতের আলিগড় থেকে জাম্মা ৮৭০ মাইল রাস্তা হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করেছেন জনৈক জগদীশ চন্দর। ডেভিড মিনান বলে এক নর্তক নাচতে নাচতে ২৩ মাইল পথ গিয়েছেন। বিহারের সমরেশ ঝা এক পায়ে খাড়া হয়ে থেকেছেন ৭১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। ইংলন্ডে রাজপ্রাসাদের সামনে কালো পরচুল পরা রয়্যাল গার্ডদের দেখতাম স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে। এটাই ওদের চাকরির শর্ত। নড়াচড়া করা কথা বলা বারণ। ভারতে রাধেশ্যাম প্রজাপতি বলে এক ভদ্রলোক ভোপালের গান্ধী ভবনে ১৮ ঘণ্টা এমন নড়াচড়া না—করে দাঁড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন। পানের দোকানগুলিতে দেখেছি বাবু হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে পান বিক্রি করেন দোকানিরা। ভারতের রাউরকেলা হোটেলে ১১ ঘণ্টা এক নাগাড়ে একভাবে বসে রেকর্ড করেন এক ভদ্রলোক।

তোমাদের গ্রামে মাঝেই কি কোনওও সাইকেল চালক আসে যে ২৪ ঘণ্টা বা তারও বেশি অবিরাম সাইকেল চালিয়ে যায়? আমেরিকার আশ্রিতা ফারম্যান পিছনে সাইকেল চালিয়ে ৫৩ কিলোমিটার পথ গিয়েছেন।

এই সব বিশ্ব রেকর্ড যারা করেছে তারা সবাই সাধারণ মানুষ। তাদের এই সমস্ত সাফল্যের পিছনে আছে শুধু অভ্যাস আর অনুশীলন।

তোমার ব্যক্তিগত আচার-আচরণও গড়ে ওঠে ছোটবেলায় যেমন অভ্যাস করবে তার ওপর।

যাদের বাবা-মা ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন ও বাচ্চাদেরও ঘুম ভাঙিয়ে দেন তাদের সারাজীবন ধরে ভোরে ওঠার অভ্যাস হয়ে যায়।

যার ছোটবেলা থেকে সব কিছু খেতে শেখে বড় হয়েও তারা সব কিছু খায়। ছোটবেলা থেকে সাধারণ পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে বড় হয়ে বড়লোক হলেও তারা সরল পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

ছোটবেলা থেকে যাঁরা রাত জেগে পড়তে অভ্যস্ত, তারা বেশি রাত্তির না হলে কিছুতেই পড়তে পারে না।

শুয়ে শুয়ে পড়া চোখের পক্ষে খুব খারাপ কিন্তু তুমি শুয়ে বা কাত হয়ে কোনওাকুনি ভাবে পড়ো তাহলে বড় হয়ে টেবলে বসে কাজ করতে অসুবিধে হবে। বই পেলেই শুয়ে শুয়ে পড়তে চাইবে।

সু-অভ্যাস ও কু-অভ্যাস

অভ্যাস দুধরনের হয়। সু-অভ্যাস ও কু-অভ্যাস। সু-অভ্যাস জীবন গঠনে সাহায্য করে। মানুষকে সংগ্রামী করে তোলে। কিন্তু কু-অভ্যাস মানুষের সমস্ত অগ্রগতির পথ বন্ধ করে দেয়।

ভাল অভ্যাস হোক আর মন্দ অভ্যাসই হোক, কোনও একটি অভ্যাস একবার জমে গেলে তা মানুষের প্রকৃতি হয়ে যায়। এজন্য ইংরাজিতে কথা আছে habit is the second nature অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি।

মনোবিজ্ঞানী প্যাভলভ এ নিয়ে একটি পরীক্ষা করেছেন। তিনি একটি কুকুরকে রোজ একটা নির্দিষ্ট সময় এক টুকরো মাংস খেতে দিতেন। কুকুরটি রোজ ওই সময় মাংস খেতে আসত। একদিন প্যাভলভ কুকুরটাকে মাংস দিলেন না। তার বদলে মাংসের মতো দেখতে একটুকরো বস্তু ঝুলিয়ে দিলেন। দেখলেন অন্যদিনের মতোই কুকুরটির মুখে অভ্যাসমতো লালা ঝরছে। বিধাননগরের এক ভদ্রলোক পিঁপড়েরা ওপর গবেষণা করে দেখেন কিছু মিষ্টি দিয়ে রাখলে পিঁপড়ের রোজ একই সময় সেখানে আসছে। এমনকী, মিষ্টি না দিলেও তারা ওই সময় আসবে কারণ তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে যে।

তুমি যদি রোজ পকেটে পেন্সিল রাখো। তাহলে কোনওদিন যদি সেটা রাখতে ভুলে গিয়েও থাকো তাহলেও কিন্তু পেন্সিল খুঁজতে গেলে প্রথমে পকেটে খুঁজবে।

নেশাও এক ধরনের অভ্যেস। নেশার মধ্যে মাদক দ্রব্য থাকে বলে তা দেহকে উত্তেজিত করে। কিন্তু যারা নেশা করে তারা ঠিক সময়মতো নেশার জিনিসটা না-পেলে তাদের ভীষণ অস্বস্তি হয়। তুমি যদি রোজ রাতে ঘুমোবার আগে এক গেলাস জল খাও তাহলে দেখবে একদিন জল না খেলে রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না। সকাল আটটায় যদি এক গেলাস দুধ রোজ খাও তাহলে যেদিন দুধ খাবে না সেদিন মনে হবে কী যেন একটা খাওনি। এজন্য পড়াশোনায় মন বসাতে চাইলে রোজ এক জায়গায় বসে পড়বে। জায়গা পালটালে অস্বস্তি হবে।

পজিটিভ অভ্যাস করলে দেখবে সেই মতো কাজ না করলে অস্বস্তি হচ্ছে। যেমন ছোটবেলা থেকে যদি ঠিক করো যে বকুনি না খেলে অথবা শাস্তি না পেলেও সত্যি কথা বলব। তাহলে দেখবে মিথ্যা কথা বললে সারাদিনটা ভাল যাচ্ছে না। আবার মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস যাদের তারা সামান্য ব্যাপারেও সত্যি কথা বলতে পারবে না। মিথ্যে না-বললে তাদের স্বস্তি হবে না।

খেলাধুলা করা অভ্যাস হয়ে গেলে যেদিন বিকেলে খেলবে না সেদিন গা ম্যাজ ম্যাজ করবে।

রাত জাগাটাও অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। অনেক ছেলেমেয়ে বেশি রাত পর্যন্ত পড়ে আর বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোয়। অনেকে রাত দশটায় ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর পাঁচটায় ওঠে।

অনেক ছেলেমেয়ে প্রচণ্ড শীতে গরম জামা না পরেও ঘোরে। বিশেষ করে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের অত গরম পোশাকও নেই। তাই তারা ছোটবেলা

থেকে এইভাবেই মানুষ হয়। বিনা মশারিতে লক্ষ লক্ষ লোক শুয়ে থাকে। যদিও এতে করে ম্যালেরিয়া হবার সম্ভাবনা। কিন্তু মশার কামড়ের মধ্যেও দিব্যি ঘুমোতে পারে তারা।

আমি দেখেছি হরিদ্বারে শীতের ভোরে কত সাধু-সন্ন্যাসী গঙ্গার কনকনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করছেন। কেদার বদরী যাবার সময় কত সাধুকে দেখলাম গায়ে ছাই মেখে সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বসে আছেন।

এ কিন্তু ম্যাজিক নয়। দীর্ঘদিনের অভ্যাস। শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়। ওই যে আগেই বলেছি যত আরামে অভ্যস্ত হবে ততই কর্মশক্তি আর সহ্যশক্তি কমতে থাকবে।

গরম দুধের বাটি তোমার মা কোনওও কাপড় না দিয়ে খালি হাতেই ধরতে পারেন। তুমি একটু হাত দাও। বাবারে মারে করে হাত সরিয়ে নেবে। কেন অমন হয় তোমার মা অনেকবার গরম বাটি ধরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তোমার কোনও অভ্যাস হয়নি। অভ্যাস করো। ধীরে ধীরে তুমিও পারবে। তোমার ঠাকুমা দাদু মা উপোস করতে পারেন। তুমি একঘণ্টা খেতে না পেলে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। উপবাসও একটা নিয়মিত অভ্যাসের ব্যাপার। আমি দেখেছি বড়লোকের ছেলেমেয়েদের চেয়ে গরিবের বা মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরা জীবনে বেশি সফল হয়। তার কারণ ছোটবেলা থেকে তারা আরাম বাদ দিয়ে পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

প্রতিটি মানুষই অভ্যাসের দাস। তা সে ভাল অভ্যাস হোক আর খারাপ অভ্যাসই হোক।

তোমারা যদি ঘুম থেকে উঠে বাসিমুখে চা খাবার অভ্যাস রপ্ত করো দেখবে এটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। রাত জাগা যাদের অভ্যাস তাদের রাত বারোটার আগে কিছুতেই ঘুম আসবে না।

একটা সময় চা পানের নেশা ধরাবার জন্য চা কোম্পানিগুলি গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিনা পয়সায় চা খাওয়াতো। এখন চা ছাড়া জীবনযাত্রা অচল। এটা অভ্যাস।

আবার বহু ছেলেমেয়ে চা খায় না। এটাও অভ্যাস।

তোমার ভাল অভ্যাসগুলি : নিচের উত্তরগুলি সঠিক হলে টিক ✓ চিহ্ন দাও। প্রত্যেকটি টিক চিহ্নের জন্য নম্বর ৫।

১. আমি রোজ ভোর ছটার আগে ঘুম থেকে উঠি।
২. আমি আমার ছাড়া জামা-কাপড় নিজেই কাচি।
৩. আমি শীতকালেও রোজ স্নান করি।
৪. স্নান করার সময় সাবান মেখে স্নান করি।
৫. শোবার সময় নিজে মশারি টাঙিয়ে নেই।
৬. রোজ আমার পড়ার টেবিল পরিষ্কার রাখি।
৭. রাতে ঘুমোবার আগে দাঁত মাজি।
৮. নিয়মিত নখ কাটি।

৯. আমি চেয়ার-টেবলে বসে পড়ি।
১০. রোজ অন্তত এক পাতা কিছু-না কিছু লিখি।
১১. রোজ আউটডোর গেম খেলি, না হয় ব্যায়াম করি।
১২. আমি সব সময় সত্যি কথা বলি।
১৩. আমার হবি আছে।
১৪. আমি লোকের সঙ্গে মিশতে ভালবাসি।
১৫. আমি মাসে অন্তত একটি গল্পের বই পড়ি।
১৬. আমি রোজ খবরের কাগজ পড়ি।
১৭. আমি ছবি, ফুল, গান ভালবাসি।
১৮. আমি যেখানেই যাই ঘড়ি ধরে যাই।
১৯. আমি কোনও নেশা করব না ঠিক করেছি। সেজন্য সবসময় সচেতন থাকি।
২০. আমি রোজকার পড়া রোজ করে তবেই ইস্কুলে যাই।

মোট নম্বর ১০০।

৭০—১০০ খুব ভাল অভ্যাস করছো। তুমি জীবনে সফল হবেই।

৫০—৭০ তোমাকে ভাল অভ্যাস বাড়াবার জন্য আর একটু সচেষ্ট হতে হবে।

৫০ এর নিচে তোমার ভাল অভ্যাসগুলির পরিমাণ খুব কম। সাবধান হও।

তোমার মধ্যে খারাপ অভ্যাস কী কী এসে গিয়েছে?

যে সব অভ্যাস তোমার সাজে তার ওপর টিক চিহ্ন দাও। প্রতিটি টিক চিহ্নে ৫ নম্বর করে দাও।

১. বড় দেরি হয়ে যায় ঘুম থেকে উঠতে।
২. পড়তে একদম মন চায় না, ওই সময়টায় টিভি দেখি অথবা আড্ডা দি।
৩. অন্যের খাতা থেকে হোম টাস্ক টুকে স্যারকে দেখাই।
৪. লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাই, বেশ লাগে।
৫. আমার কজন বন্ধু ড্রাগ খায়। আমারও খেতে ইচ্ছে করে।
৬. মারামারি করতে বেশ ভাল লাগে।
৭. মিথ্যে কথা বলাটা দোষের মনে করি না, তাই দরকার হলে মিথ্যা কথা বলি।
৮. বানিয়ে বানিয়ে বলে লোককে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করি।
৯. ঘুম থেকে মুখ না ধুয়ে চা খাই।
১০. যেদিন ইচ্ছা হয় সেদিন স্নান করি না।
১১. বেশ আধুনিক ফ্যাশানের পোশাক না-পরলে যেন নিজেকে স্মার্ট বলে মনেই হয় না।
১২. গল্পের বই-টই পড়তে একদম ভাল লাগে না।
১৩. লিখতে ইচ্ছা করে না কারণ মনে হয় এই বুঝি বানান ভুল হয়ে গেল। তাছাড়া হাতের লেখাও খারাপ যে।

১৪. গুরুজনদের প্রণাম-ট্রনাম করা আমার ধাতে নেই।

১৫. লোকজনের সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারি না। আমি আমার নিজের মনে থাকি।

১৬. আমার জুতো যদি মা পালিশ করে দেয় ভাল, নইলে মুচিকে দিয়ে পালিশ করিয়ে নি।

১৭. ঘুম এলে আমি শুয়ে পড়ি। বিছানা করা বা মশারির টাঙানো আমার ধাতে নেই।

১৮. আমার জামা-কাপড় মাই-তো কেচে দেয়। এ তো মায়েদেরই কাজ।

১৯. বেশির ভাগ খাবার-দাবারই আমার খেতে ভাল লাগে না। আমি ভালবাসি চকোলেট, চানাচুর, ডিম।

২০. বাজার টাজার করতে আমার ভাল লাগে না। আমি আবার হিসেব রাখতে পারি না।

৮০—১০০ : তুমি বিপজ্জনক সীমানা পেরিয়ে গেছ। অভ্যাস বদলাও।

৬০—৮০ : এখনও সময় আছে। তুমি অভ্যাসগুলিকে বদলাতে পারো।

৬০ পর্যন্ত : তোমার মধ্যে যেটুকু বদভ্যাস আছে তা চেষ্টা করলে সহজেই দূর করতে পারবে। না পারলে লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করো। কাউন্সেলিং নাও।

কাউন্সেলিং কী

* কাউন্সেলিং কথাটার মানে হল কাউকে পরামর্শ দেওয়া। বলা বাহুল্য সেটি সুপরামর্শ এবং বাস্তবসম্মত পরামর্শ।
* বাবা-মা শিক্ষক-শিক্ষিকা নিকট আত্মীয়, শুভানুধ্যায়ী এমনকী, বন্ধুরাও পরামর্শ দেয়। কিন্তু তাঁরা অনেকেই আধুনিক কাউন্সেলিং-এর জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে যেতে হয়।
* ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রথম পরামর্শদাতা হলেন বাবা-মা। তাঁরা ছেলেমেয়েদের যে ভাবে বোঝে না। তাই পেশাদার কাউন্সেলরের কাছে গেলেও বাবা-মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়।

পাঁচ

বাড়ি থেকে পালিয়ে

কিছুদিন একটি ছেলেকে নিয়ে তার খুড়তুতো দাদা আমার কাছে এল। ছেলেটি ক্লাস নাইনে পড়ে। কিন্তু ইস্কুলের ওপর তার খুব রাগ। সে ইস্কুলে যায় না। তার পড়তে ভাল লাগে না।

ঠিক এই রকমেই একটি চিঠি পেলাম মেদিনীপুরের এক ভদ্রলোকের কাজ থেকে। তাঁর ছেলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। কিন্তু তারও পড়াশোনায় মন নেই।

এই দুটো ছেলের মধ্যে খুব মিল। তারা খুব গল্পের বই পড়ে। বিশেষ করে আমার বই-এর খুব ফ্যান। কলকাতার ছেলেটি খুব ভ্রমণকাহিনি পড়তে ভালবাসে। আমার 'হতাশ হইনি' বইতে বিদেশের কথা আছে। গ্রিসের কথা আছে। আমার এক বান্ধবী থাকে। আমি তিনবার গ্রিসে গিয়েছি শুনে সে গ্রিসে যেতে খুব আগ্রহী।

এই যে দেশ-বিদেশে ঘোরা ও দেখার আগ্রহ, সুদূরের প্রতি আকর্ষণ এটা বয়ঃসন্ধির ধর্ম। এই জন্যই এই বয়সে অনেক ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারপর ফিরে এসে একটা করে গল্প ফাঁদে। এর মধ্যে একটা গল্প বেশ চালু।

'ইস্কুলে থেকে যখন ফিরছিলাম তখন একটি লোক এসে আলাপ জমাল তারপর একটা ফুল শুঁকতে দিল। যেই ফুলটা শুঁকেছি তারপর আর কিছু মনে নেই। তারপর দেখি আমায় একটা বাড়িতে আটকে রেখেছে। আমি সুযোগ পেয়ে পালিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি।'

আসলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তবেই বুঝতে পারে যে বাড়ির বাইরে জীবনটা এত সহজ নয় তখন সে আবার বাড়ি ফিরে আসে।

বাড়ি থেকে এক বস্ত্রে পালিয়ে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি, এর ওর বাড়ি বা কলকারখানায় চাকরি করে, পরে ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে এমন উদাহরণ যে নেই তা নয়, কিন্তু বাড়ির বাবা-মায়ের আশ্রয় ছেড়ে একা বিদেশে পাড়ি দেওয়াটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তা ছাড়া ভাগ্য অন্বেষণে একা বিদেশে বেরিয়ে পড়াটা আমি ভালই মনে করি তবে সেটা বড় হয়ে, লেখাপড়া শেখা শেষ করে।

আমি কলকাতার ছেলেটিকে বললাম, তুমি মাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছ বিদেশ যাবে কী করে? আগেকার দিনে জাহাজে খালাসি হয়ে অনেকে বিদেশে চলে গেছে। কুলির কাজ নিয়ে হাজার হাজার লোক চলে গিয়েছে। কিন্তু তারা গেছে বড় হয়ে। এখন তো সেভাবে যাওয়া যায় না। তুমি জাহাজের খালাসি হয়ে গেলেও তোমাকে নাবিকের ট্রেনিং নিতে হবে। তার জন্য কোনও জাহাজ ট্রেনিং স্কুলে

পড়তে হবে। পড়তে গেলে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ভর্তি হতে হবে।

তা ছাড়া দিনকাল পালটেছে। এখন আর আগের মতো উদার মানুষেরা নেই যে একটি অনাথ শিশুকে বাড়িতে রেখে পালন করবে। হয় দুষ্ট লোকেরা তাকে শিশু শ্রমিক করে ক্রীতদাসের মতো করে কোথাও রেখে দেবে। নয়তো চালান করে দেবে বিদেশে। বিকলাঙ্গ করে তাকে দিয়ে ভিক্ষে করাবে। পকেট মারা ও চুরি শেখাবে। নয়তো আরও খারাপ কাজে তাদের নিয়োগ করবে।

পড়াশোনার কোনওও বিকল্প নেই। আর পড়াশোনা করতে গেলে ইস্কুলেরও বিকল্প নেই। কেন না, ইস্কুলে যেটুকু শেখানো হয় সেটুকু একটা নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে শেখানো হয়। শিক্ষকেরা পড়ান। ইস্কুলে একটা ডিসিপ্লিন তৈরি হয়। তোমাকে ঠিক সময় ইস্কুল যেতে হবে। ঠিকমতো ক্লাসের পড়া করতে হবে। ঠিক সময় পরীক্ষা দিতে হবে। ইস্কুলে পড়ার শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলে একটা সার্টিফিকেট পাবে। সেটা না পেলে চাকরি পাবে না। কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। মাঝপথে অনেক ছেলেমেয়ে কোনও না কারণে ইস্কুলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এক কোটির ওপর ছেলেমেয় যারা ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ে তারা বেশির ভাগ কোথায় হারিয়ে যায়। ২০০৪ সালে আটলক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক দিচ্ছে। তাহলে সেই ৯২ লক্ষ ছেলেমেয়ে কোথায় গেল?

অধিকাংশরই আর্থিক অবস্থার জন্য আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের বাবা-মা-অভিভাবক এমনকী, ছেলেটিরও তেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল না যে করে হোক পড়াশোনা চালিয়ে যাব। কেউ যদি কঠোর প্রতিজ্ঞা করে আমি পড়বই তাহলে পড়াশোনা বন্ধ হতে পারে না। তার অনেক উদাহরণ আমি তোমাদের দিচ্ছি। একটা বড় উদাহরণ তো তোমাদের চোখের সামনেই আছে। আমি। তোমাদের এই বই-এর লেখক।

আমার বাবার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। এত খারাপ যে কল্পনা করতে পারবে না। আমাদের এক একদিন ভালমতো খাওয়ার জুটত না। আমার বড়লোক আত্মীয়-স্বজনরা উপদেশ দিলেন ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াই গরিবের ছেলের পক্ষে যথেষ্ট। আমি চেষ্টাচরিত্র করলে একটা বেয়ারার চাকরি পাবই। দুএকটা এমন চাকরির হদিশও তাঁরা দিলেন। সে সময় মার্চেন্ট নেভিতে লোক নিচ্ছিল। আমি ভর্তির জন্য লাইন দিলাম।

আমি পরীক্ষায় নির্বাচিত হলাম। কিন্তু বার্থ সার্টিফিকেট আনিনি বলে আমি চাকরিটা পেলাম না।

তখন ব্যর্থ হয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যে করেই হোক আমি লেখাপড়া শিখব। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি।

এই কথা বলে আমি আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসা ছেলেটিকে বোঝালাম ইস্কুল কলেজের সার্টিফিকেটের ছাপ না, থাকলে তুমি পরে নিজেই মুশকিলে পড়বে। টাকা-পয়সা হয়তো ব্যবসা করেও রোজগার করতে পারো। কিন্তু মনে মনে হীনমন্যতা থেকে যাবে যে তুমি বেশি লেখাপড়া জানে না। আমার ছোটবেলার

ইস্কুলের অনেক বন্ধুই ক্লাস সিক্স-সেভেনে উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কারও বাবা মারা গেছেন। কারও বাবার সঙ্গতি নেই। ব্যবসায়ী বা চাষি বাবা ছেলেকে চাষবাস ও ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিয়েছেন। এই বয়সে ইস্কুল ছেড়ে দিতে পারলেই অনেক ছেলেমেয়ে যেন বেঁচে যায়। বাবা যদি বলে আর পড়ে কী হবে। আমার ব্যবসায়ে বসে যা। তাহলে ছেলে খুব খুশিই হয়। অনেক পরে বুঝতে পারে কাজটা ঠিক করিনি।

আমার ড্রপ আউট বন্ধুদের অনেকে দোকানপাট করেছে। অনেকে ছোটখাটো ব্যবসা করছে। অনেকে সাইকেল রিকশা চালাচ্ছে। মজুরের কাজ করছে। এদের মধ্যে একজন এখন ধনী ব্যবসায়ী। সে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে আর্থিক কারণে পড়া ছেড়ে দিয়ে হাতের কাজ শেখে। তারপর বড়বাজারে রোল গোল্ড আর রুপোর গহনার দোকান দেয়। সে দোকান এখন অনেক বড়। তার ছেলেমেয়ে সবাই কিন্তু উচ্চশিক্ষিত হয়েছে। সে ইচ্ছে করলেই ছেলেকে ক্লাশ এইটে পড়তে পড়তেই ব্যবসায়ে বসিয়ে দিতে পারত। দেয়নি।

আর একজন ব্যবসায়ী আছেন আমার বই-এর খুব ভক্ত। তাঁর দুকোটি টাকার ব্যবসা। প্রি-ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়েছেন। তাঁর মধ্যে এজন্য একটু হীনমন্যতা রয়েছে। কিন্তু তিনি ব্যবসা বোঝেন। সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন। তাঁর ছেলেকে তিনি এম বি এ পড়াবেন ঠিক করেছেন।

সব দেশেই ষোলো বছর পর্যন্ত সবাই ইস্কুলে যায়। পড়াশোনা ভাল না লাগে মাধ্যমিকের পর হাতের কাজ শেখো। ইস্কুল ড্রপ আউট হয়েও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হয়েছেন। অতএব ইস্কুলে পড়ে আর কী হবে একথা মনে করলে বোকামি করবে। রবীন্দ্রনাথ ম্যাট্রিক পাস করেননি বা ইন্দিরা গান্ধী গ্রাজুয়েট ছিলেন না এসব কথা বলার কোনও মানে হয় না। প্রথম কথা তাঁরা প্রতিভাবান ও প্রতিভাময়ী ও দ্বিতীয় কথা ইস্কুলের চেয়ে দ্বিগুণ তাঁরা বাড়িতে বসে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ সাধারণ গ্রাজুয়েট ছিলেন কিন্তু তারা দুজনেই বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। দুজনেই প্রতিভাবান। তুমি যদি প্রকৃত প্রতিভাবান হও তাহলে তোমার ইস্কুলে পড়া-না-পড়া নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। একজন বড় কবি বা বড় শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় তাঁদের কাজে। ঈশপ আকবর শিবাজী সবাই নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান। তবে আজকের দিনে প্রতিভা থাকলেও একজন নিরক্ষর কী সামাজিক স্বীকৃতি পাবেন?

সুতরাং লেখাপড়া শিখতেই হবে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত ন্যূনতম শিক্ষা নিতেই হবে।

যারা ড্রপ আউট হয়

যারা পড়তে পড়তে ইস্কুল জীবনেই পড়া ছেড়ে দেয় তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক আর্থিক কারণে যাদের পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি পড়া চালিয়ে যাবার প্রবল ইচ্ছা থাকে তাহলে তারা সহৃদয় লোকের সাহায্য পেতে পারে। এখন ন্যাশনাল ওপেন ইস্কুল হয়েছে। কোনও কারণে পড়া

ছেড়ে দিলেও তারা কিছুদিন পরে প্রাইভেটে এই ইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে পারে। আমি এমন অনেক মহিলাকে দেখেছি যাঁরা মেয়ের সঙ্গে বসে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। এইভাবে এম. এ. পাস করেছেন। অথচ ক্লাস এইটে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বলে আর ইস্কুলে যেতে পারেননি।

আর এক ধরনের ছেলেমেয়ে আছে যারা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পড়াশোনা রপ্ত করতে পারছে না। তারা পড়ছে যথাসাধ্য কিন্তু প্রত্যেক ক্লাসেই ফেল করছে। শেষে হতাশ হয়ে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এদের জন্য বিদেশে বিশেষ ইস্কুলের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে নেই। তা হলে এরা কী করবে?

এদের জন্য বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা থাকলে এদের অনেকেই পাস করতে পারে।

প্রাইভেট টিউটর

আমাদের সময় ভাল ছেলেমেয়েরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়া অপমান বলে মনে করত। সত্যিই তো নেহাত অনুপায় না হলে প্রাইভেট টিউটরের কাছে যাওয়া উচিত নয়। কারণ এর ফলে নিজের ওপর বিশ্বাস কমে যায়। তুমি টিউটরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠো। এতে পরীক্ষায় নম্বর তোলাটাই বড় হয়ে ওঠে। জ্ঞান সেইমতো বাড়ে না।

এ যেন খেলোয়াড়দের ডোপিং নেবার মতো। কৃত্রিমভাবে শক্তি বাড়ানো। আমি দেখি পরীক্ষায় যারা এক থেকে দশের মধ্যে আছে তারা বলছে প্রতিটি বিষয়ের জন্য তারা একজন করে প্রাইভেট শিক্ষক রেখেছিল। তুমি যদি অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাও আমি আপত্তি করব না। যেমন ধরো নাচ-গান ছবি আঁকা সাঁতার শিখতে তুমি মাস্টারমশাইয়ের সাহায্য নিতেই পারো। বিদেশি বা আঞ্চলিক ভাষা শেখা, যোগব্যায়াম শেখা, ফুটবল ক্রিকেট শেখার জন্য কোচ রাখতেই পারো। অথবা একটা বিষয়ে দুর্বল আছো যেমন গণিত, ইংরেজি সেটা মাস্টারমশাই-এর কাছে আলাদা করে পড়ে নিলে। কিন্তু সব বিষয়ের জন্য প্রাইভেট টিউটরের ওপর নির্ভরশীল হওয়া মানে বুঝতে হবে কোনওও বিষয়েই তোমার মৌলিক জ্ঞান জন্মায়নি। আত্মবিশ্বাসও জন্মায়নি। তুমি প্রত্যেক ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভর। ছোটবেলা থেকে এই অন্য-নির্ভরতা গড়ে উঠলে বড় হয়ে পদে পদে ঘা খাবে।

আর হ্যাঁ, যাদের মানসিক বয়স কম, যারা পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রী তাদের জন্য বিশেষ কোচিং দরকার। কিন্তু তাদের পড়াবার বিশেষ পদ্ধতি আছে। এর জন্য হয় বিশেষ ট্রেনিং চাই, না হয় এমন বিশেষ প্রবণতা চাই যিনি জলের মতো করে কঠিন বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারেন। আমার ইস্কুলে জীবনে আমি অঙ্কে ভীষণ কাঁচা ছিলাম। সত্যরঞ্জনবাবু নামে একজন মাস্টারমশাই ছিলেন, তিনি সহজভাবে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে পারতেন। আমি মাধ্যমিকে অঙ্কে মাত্র ৩৩ নং পেয়ে পাস করেছিলাম। তিনি না থাকলে তাও পেতাম না। কিন্তু তাঁর মত শিক্ষক কজন আছেন?

পড়তে ভাল লাগে না

প্রকৃতির নিয়মই বোধ হয় এই যে ভাল জিনিস কারও ভাল লাগে না। দুধ ছোটদের পক্ষে আদর্শ পানীয়। সমস্ত পুষ্টিগুণ দুধে আছে অথচ তোমরা বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই দুধ খেতে চাও না। অথচ দুধের বদলে যদি কোল্ড ড্রিঙ্কের একটা বোতল দি, অমনি চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নেবে। অথচ আমরা সবাই জানি ঠাণ্ডা পানীয়ে কোনও খাদ্যগুণ নেই। বরং বেশি খেলে ক্ষতি করে। বেশি চক্‌লেট খেলেও দাঁত খারাপ হয়। মিষ্টির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে তা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর জেনেও তোমরা মিষ্টি খাও। কিন্তু যদি নিমপাতার রস এনে দিই তাহলে কি খাবে? অথচ নিমপাতার রস শরীরের পক্ষে উপকারী।

রবীন্দ্রনাথ রোজ সকালে নিমপাতার রস খেতেন। একবার এক ভদ্রলোকের সামনেই ভৃত্য তাঁকে এক গেলাস রস দিয়ে গেল। অতিথি ভাবছেন, কী অসভ্য রে বাবা। আমার সামনে শরবত খাচ্ছেন, অথচ আমার জন্য এক গেলাসও আনালেন না।

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে ভৃত্যকে বললেন, ওঁর জন্যও এক গেলাস নিয়ে এসো।

ভৃত্য নিমপাতা থেঁতো করে আর এক গ্লাস নিমের শরবত নিয়ে এল।

ভদ্রলোক উৎসাহ ভরে চুমুক দিতেই থু-থু করে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখছেন আর হাসছেন।

ইস্কুলের পড়াটা অনেকের কাছেই এমন তেতো শরবত খাবার অভিজ্ঞতা। কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মতো তেতো সরবতের গুণ জানেন, তাঁরা খুশিমনে ঢক ঢক করে খেয়ে নেন।

কেন এমন হয়? কেন কিছু ছেলেমেয়ের পড়তে একদম ভাল লাগে না? আমি তিনটে কারণ আগেই দেখিয়েছি। তা ছাড়াও আছে মানসিক কারণ।

আমাদের মনের আদিমতম স্তর হল ইদ (id), জন্মের সময় প্রত্যেক শিশুর মনের ভেতর কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। একটি হল, আরামপ্রিয়তা, অর্থাৎ, সুখের ইচ্ছা আর একটি হল দ্রুত পূর্ণবয়স্ক ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ইচ্ছা। এইসব ইচ্ছা মনের মধ্যে এলোমেলোভাবে থাকে। শিশু যখন বড় হতে থাকে তখন তার মধ্যে মা-বাবার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হবার ইচ্ছাও বাড়তে থাকে।

বয়ঃসন্ধির সময় এই স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা প্রবলতর হয়।

স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা কী?

আমি হব বাবার মতো বড়ো,

নিজে উপার্জন করব। পছন্দমতো খরচ করব। ভাল ভাল জিনিস খাবো, কারও শাসন-টাসনের ধার ধারব না।

মনের ভেতরের ইদ এই তীব্র ইচ্ছা পূরণের জন্য আকুলি বিকুলি করে। ইদ মনের ভেতরের এই কামনা যা বাস্তবতার ধার ধারে না। ইদ চায় এখনই তুমি

পড়া ছেড়ে যেমন তেমন একটা চাকরি নিয়ে নাও, তা সে চায়ের দোকানে হোক অথবা মোটর গ্যারেজে হোক, যে করে হোক হাতে টাকা চাই। দরকার হলে চুরি করো, ডাকাতি করো—টাকা চাই-ই চাই।

ইদ হয়তো বলল, তোমাকে ফিলমের হিরো হতে হবে। ব্যস, ইদের তাড়নায় সাত-পাঁচ না-ভেবে তুমি মুম্বাই-এর ট্রেনে উঠে বসলে। তারপর পুলিশ গিয়ে তোমাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে কলকাতায় নিয়ে এল।

প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মধ্যেই ইদ বাসা বেঁধে আছে। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই আছে মনের আর একটা স্তর ইগো বা অহং। যুক্তি বিবেচনা দিয়ে ইগো ইদকে নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যে ইগো শক্তিশালী। তারা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে মনের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। তারা স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। স্বাভাবিক পথে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে দেয়।

কিন্তু যাদের মধ্যে ইগো দুর্বল, ইদ প্রবল তারাই দুর্বলতার শিকার। তাদের ক্রমাগত মনে হতে থাকে পড়াশোনা করে কিস্যু হবে না। ইস্কুল পালায় তারা।

অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ক্লাসের পড়া বুঝতে পারে না। এরও আবার অনেক কারণ আছে। এমন হতে পারে মাস্টারমশাই বা দিদিমণি ভাল করে বোঝাতে পারেন না। সব ছেলেমেয়ের বোঝার ক্ষমতা সমান হয় না। মানসিক বয়স বলে একটা বয়স আছে। যেটি তোমার আসল বয়সের চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে। কম হলে তুমি অনেক পড়া বুঝতে পারবে না। বিশেষ করে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরেজি। আর তোমার মানসিক বয়স বেশি হলেও বিপদ। তোমার মনে হবে আরে এসব তো নস্যি। এর জন্য যত মেহনত করো ক্লাসে বসে পড়াশোনার দরকার নেই। আগে এই সব ছেলেদের ডবল প্রমোশন দেবার প্রথা ছিল। এখন নেই। কিন্তু এখন আর ডবল প্রমোশান হয় না।

তবে যারা একটু পিছিয়ে পড়া ছেলে অথবা ক্লাসের পড়া যাদের বোরিং মনে হয় তারা তখন এক দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে যায়। তারা পড়াশোনায় অবহেলা করে। যত অবহেলা করে তারা তত পিছিয়ে পড়ে। যত পিছিয়ে পড়ে ততই তারা বেশি করে অবহেলা করে। তাদের সহজাত প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ইস্কুল ছেড়ে দাও। কাজে লেগে পড়।

তোমার মনের মধ্যে যদি পড়াশোনার প্রতি এমন বিতৃষ্ণা দেখা দেয় তুমি প্রথম যে কাজটা করবে, সেটি হল এই যে ক্লাসে পড়ানোর সময় তোমার প্রশ্ন থাকলে কোনওও সঙ্কোচ না করে প্রশ্ন করবে। অথবা কী কী তুমি বুঝতে পারছ না তার একটা তালিকা করে তুমি ক্লাসের পর মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে সেটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ক্লাসের ভাল ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বুঝে নাও। তবে প্রশ্ন করাই হচ্ছে বোঝার সহজ পদ্ধতি।

আমি বড় বড় ছেলেমেয়েদেরও দেখেছি কোনও প্রশ্ন করে না। তারা বুঝল কি না মাস্টারমশাই বুঝতে পারেন না। সেই যে একটা জোক আছে। একঘণ্টা পড়িয়ে মাস্টারমশাই বলছেন : 'এই যে এতক্ষণ তোমাদের পড়ালাম। তোমরা

যে বোঝলে না, আমি যে সেটা বোঝলাম সেডা কি তোমরা বোঝলে?'

প্রশ্ন। পড়তে ভাল লাগে না। কী করব?

উত্তর। যাতে পড়তে ভাল লাগে তার চেষ্টা করবে অথবা যাতে বেশি পড়তে হয় না তার ব্যবস্থা করবে।

প্রশ্ন। সেটা কী স্যার?

উত্তর। ক্লাসে মাস্টারমশাই বা মিসরা যা পড়াবেন সেটা মন দিয়ে শুনবে। ক্লাসের পড়া শুনলে বাড়ি গিয়ে কম পড়লেও চলে। ইউরোপ, আমেরিকার ইস্কুলে দিনের পড়াটা দিনেই হয়ে যায়। বাড়িতে ছেলেমেয়েরা বই-এর বাইরের পড়াশোনাই বেশি করে করে।

প্রশ্ন। তা হলে সেই তো পড়তেই বলছেন?

উত্তর। হ্যাঁ। কিন্তু সেটা ইস্কুলের বই না। গল্পের বই। জ্ঞানের বই। ম্যাগাজিন খবরের কাগজ। আমেরিকায় খবরের কাগজকে টেক্সট বই-এর মতো অবশ্যপাঠ্য করা হয়েছে। ব্যাপারটা কী বলতো? শিক্ষক ক্লাসে খবরের কাগজ নিয়ে এসে এক একটা খবর পড়ছেন আর এই খবরকে কেন্দ্র করে ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছেন।

ধরো, আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করেছে। ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। বোমায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কত শহর—এবার ওই খবরের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আলোচনা।

ইরাক কোথায়? ইরাকের চারপাশে কোনও কোনও দেশ আছে? প্রাচীনকালে ইরাকের নাম কী ছিল? ইরাকে যে দুটি বিখ্যাত নদী আছে তার নাম কী?

এর আগে ইরাক আবার প্রতিবেশী দেশ আক্রমণ করে সে দেশটার নাম কী?

ইরাকের অর্থনীতি কীসের ওপর দাঁড়িয়ে? আমেরিকার ইরাক আক্রমণের আপাত কারণ কী? এই কারণ কতখানি যুক্তিসঙ্গত?

এমনি করে শুধু ইরাককে নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা যায়। কারণ গোটা পৃথিবী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

আজ পৃথিবীর কোথাও কোনও বড় ঘটনা আর আভ্যন্তরীণ ঘটনা নয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে আছে। বিশ্বকাপের কল্যাণে আমরা বিভিন্ন দেশের নাম শুনছি। দেশগুলির ছবিও টিভিতে দেখছি। সে সব দেশের পটভূমি, লোকজনের জীবনযাত্রা। অর্থনীতি, ভূগোল ও ইতিহাস জানার তত বড় সুযোগ আমাদের হাতে আসেনি।

ঘরে বসে সব সময় ইস্কুলের বই পড়ার দরকারই হয় না। যদি নিয়মিত ইস্কুলে যাও, ক্লাসগুলি ভাল করে শোন। যেটা বুঝতে পারলে না তা নিয়ে প্রশ্ন করতে লজ্জা কী। এমনকী, ভাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও আলোচনা করে বুঝে নাও।

প্রশ্ন। আপনি বলছেন পড়া মুখস্থ করার কি কোনও দরকার নেই?

উত্তর। আছে। তবে তুমি যদি বিষয়টি বুঝতে পারো এবং নিজে নিজে লেখার ক্ষমতা অর্জন করো তাহলে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে কোলা ব্যাঙের মতো মুখস্থ করার দরকার হয় না। ধরো অঙ্ক— তুমি কটা অঙ্ক মুখস্থ করবে? এখানে পদ্ধতিটা

অর্থাৎ নিয়মটা বুঝে নিতে হবে। একটা নিয়ম জানালে সেই নিয়মের সব অঙ্ক করতে পারবে। যতক্ষণ না নিয়মটা বুঝে নিতে পারছেন ততক্ষণ খুব কঠিন মনে হবে।

ম্যাজিসিয়ানরা তাই কখনও ম্যাজিকের নিয়মটা বলে দেন না। কারণ বলে বলে দিলেই সবাই ভাববে ব্যাপারটা এত সোজা। এতো আম্মো পারি। কিন্তু মাস্টার মশাই নিয়মটা সর্বদা বলে দেন। যদি বার বার শুনেও বুঝতে না পারো, নিয়মটা যদি মাথায় না ঢোকে তাহলে বুঝতে হবে তোমার মনের বয়স আসল বয়সের তুলনায় কম। তখন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

তোমার মনের বয়স কত?

মনের বয়স বার করার জন্য মনোবিদরা কিছু কিছু পরীক্ষা নেন। প্রত্যেক বয়সের জন্য উপযোগী পরীক্ষা আছে। সেই পরীক্ষা থেকেই বোঝা যায় কার কত মনের বয়স।

নানা কারণে মনের বয়স কম হতে পারে। একটা হল বাইরের পরিবেশের সঙ্গে যার পরিচয় যত কম হবে তার মনের বয়স তত কম হবে। একটি ছেলেকে বাবা-মা কারও সঙ্গে মিশতে দিলেন না। বাইরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেলেন না। সে ঘরে ডাকঘরের অমলের মতো বন্দি হয়ে রইল। তার মনের বয়স কম হবে।

পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে তবেই একটি ছেলের বা মেয়ের বুদ্ধি পরিপক্ক হয়। অতএব ছোটবেলা থেকেই পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যে দরকার সেটা আগেই বলেছি। প্রকৃতিকে চেনো। দেশ-বিদেশ ঘোর। ইস্কুল থেকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। স্কাউট এন সি সি-তে যারা যোগ দেয় তারা ক্যাম্প করতে কত জায়গায় যায়। কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। তোমার আত্মীয়স্বজনের সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়।

তোমরা যদি সংসারের অনেক কাজ করো, যেমন দোকানে যাওয়া, বাজারে যাওয়া তা হলে কেনাকাটা করার সময় কতগুলি স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারো। বাজারে একই জিনিস অনেকগুলি কোম্পানি বিক্রি করে। তুমি কোনটা কিনবে এই সিদ্ধান্ত নিতে নিতে সিদ্ধান্ত ও ঝুঁকি নেবার একটা অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে। হিসাবপত্র করার অভ্যাস হয়। ধরো, তোমার বাড়িতে কেউ নেই। বাবা-মা দুজনে বাইরে। এমন সময় বাড়িতে একজন অতিথি এলেন। তাঁকে তুমি চেনো। এবার তাঁকে কী বলবে, বাড়িতে কেউ নেই—পরে আসবেন। না বলবে, আপনি বসুন। বাবা এখনই এসে পড়বেন। তারপর অতিথির জন্য একটু শীতল পানীয় গেলাসে ভরে নিয়ে এসো। তাঁর সঙ্গে বসে দু চারটে কথা বললে। তিনি তোমার ইস্কুলের পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি উত্তর দিলে।

প্রশ্ন । কিন্তু এতে আমার পড়াশোনার কী উপকার হবে?

উত্তর। সরাসরি উপকার হবে না। কিন্তু যদি বলি পড়াশোনা মানে শুধু পরীক্ষা দেওয়া আর পাস করা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল তোমাকে এমন কিছু শেখানো

যাতে করে তোমার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবার ক্ষমতা হয়। তোমার মনে একটা আত্মবিশ্বাস এনে দেয় যে আমি এই বিষয়গুলো জানি এবং দরকার হলে আমি নিজের মতো করে তার সমাধান করতে পারব। এটা করতে গেলে যেমন ক্লাসের পড়াটা করতে হবে তেমনি পাঁচটা বই পড়তে হবে। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের কাছ থেকে একটু জানতে হবে, শিখতে হবে।

প্রশ্ন। আপনি বলছেন মানসিক বয়স কম যাদের, তারাই পরীক্ষায় ফেল করে।

উত্তর। ঠিক তা নয়। তবে ফেল করার একটা বড় কারণ ঠিকমতো পড়াশোনা না শোনা। পড়ার সময় মন না দেওয়া। গুছিয়ে লিখতে না পারা। এখন মাধ্যমিক পরীক্ষা খুব সোজা হয়ে এসেছে। আমাদের সময় সিলেবাস বেশ কঠিন ছিল। অনেকখানি লিখতে হত। এখন যেমন তেমন করে লিখে দিলে ৩০ পাওয়া যায়। তাও যারা পাস করতে পারে না— বুঝতে হবে তারা ইচ্ছে করেই ফেল করেছে। ফেল করতে গেলেও বেশ চেষ্টা করতে হয়। তখন অন্যদিকে মন চলে যায়, মনে হয় লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে মৎস্য মারিব খাইব সুখে।

কিন্তু মৎস্য মারা বা মাছ ধরা অত সহজ নয়। এর জন্য চাই ধৈর্য। আর চাই নৈপুণ্য। অর্থাৎ সব কিছুর জন্যই কিছু না কিছু পরিশ্রম করা চাই।

পড়াশোনার ব্যাপারে সবার আগে দরকার কঠোর প্রতিজ্ঞা—আমি পড়ব। মোটামুটি ভাল ফল করব।

আমি মা সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করতাম। বাবা-মায়ের কষ্ট যেন দূর করতে পারি। শুধু আমি মানুষ হলে হবে না, যেন ছোট ভাই-বোনদেরও মানুষ করতে পারি।

শুধু একটু পড়ার সুযোগের জন্য বিভিন্ন লোকের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে যেতাম। যদি কেউ একটা পুরনো বই দেয়, যদি কেউ আমাকে বিনা পয়সায় অঙ্কটা দেখিয়ে দেয়। যদি কেউ আমার ফাইন্যাল পরীক্ষার ফি-টা দিয়ে দেয়। যদি কেউ আমার কলকাতা শহরে একটু আশ্রয় দেয়।

আমার শুধু এই ইচ্ছেটাই ছিল। কিন্তু দেখলাম ইচ্ছে থাকলে উপায়গুলো ঠিক হাতে এসে যায়।

অথচ কত অবস্থাপন্ন বাবা-মায়েদের আফসোস আমার ছেলেমেয়েদের পড়ার ইচ্ছা নেই বলেই তারা ড্রপ আউট হয়ে রইল। অথচ তাদের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

ইচ্ছা চাই ইচ্ছা নাই

আমার বাড়িতে অনেক বছর ধরে কাজ করে একটি মেয়ে তার একমাত্র ছেলেকে সিউড়ি রামকৃষ্ণ মিশন বিনা পয়সায় হস্টেলে রেখে পড়াত। কিন্তু এত আরামের মধ্যে থেকেও তার পড়তে ভাল লাগত না। মহারাজরা তাকে বলতেন: তোকে পলিটেকনিক থেকে পাস করিয়ে ইঞ্জিনিয়ার করে ছেড়ে দেব। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। থার্ড ডিভিশনে মাধ্যমিক পাস করে সে মিশন ছেড়ে

বাড়ি চলে এল। এখন হাজার এগারোশো মাইনেতে একটি জেরক্স মেশিন চালায়।

এই চাকরিতে বেতন আর কত বাড়তে পারে? এখন ছেলেমানুষ। তার বেশ ভাল লাগছে। নগদ হাজার টাকার ওপর বেতন। কিন্তু বড় হয়ে সংসারের দায়িত্ব চাপলে ওই টাকায় তার কি চলবে? আমাদের দেশে যতই হাতের কাজ শেখো, মাধ্যমিক পাস একটি ছেলের পক্ষে সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকার বেশি মাসে আয় করা মুশকিল। অথচ দ্যাখো কত ছেলেমেয়ে নিজের ইচ্ছেতেই সেভেন এইট পর্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে।

এরা যদি নিজেরা ব্যবসা শুরু না করে তাহলে শুধু চাকরি করলে চিরগরিব হয়ে থাকবে। কী কী বিশেষ কারণে ছেলেমেয়ে পড়তে ভালবাসে না তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ আগে বলেছি। সামাজিক কারণও আছে। আমাদের দেশের আর্থিক দুরবস্থার কারণেও অনেক ছেলেমেয়ে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আমার বোনকে পড়া ছাড়তে হয় আর্থিক কারণে

আমার নিজের বোনকে আর্থিক কারণে ক্লাস এইটে পড়ার সময় পড়া ছেড়ে দিতে হয়। সে গ্রামের স্কুলে ফ্রিতে পড়ত। গ্রামের এক প্রগতিশীল শিক্ষক নেতা ইস্কুলে সেক্রেটারি হয়ে আমার বোনের ফ্রিশিপটা কেটে দিলেন। এই লেখাপড়া শিখতে না-পারার জন্য সারা জীবন খুব কষ্টে কেটেছে আমার বোনের।

তবু আমার বোন তো ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল। কিন্তু কত হাজার হাজার ছেলেমেয়ে নাম সই করতেই শিখল না। এই পশ্চিমবঙ্গে এখনও প্রায় এক কোটি মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে তাকে আমার স্ত্রী সাক্ষর করে তুলেছে। সে এখন নাম সই করতে পারে। আর টিপ সই দেয় না। তোমরা কি প্রত্যেকে এমন একটি করে নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলতে পারো না?

একবার তখন বাপি বলে একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। দিঘা থেকে কলকাতা আসছিলাম। ছেলেটি ছিল আমার ভাড়া গাড়ির ড্রাইভার। তখন তার বয়স ত্রিশ। সে বলল মেদিনীপুরের খেজুরি গ্রামে তাদের বাড়ি। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে আর পড়েনি। তখন তার বাবা তাকে কলকাতায় এক বাড়িতে চাকরের কাজ করতে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে কয়েক বছর থেকে সে গাড়ি চালানো শিখে কলকাতায় ট্যাক্সি চালাত। কিন্তু একটা অল্পবয়সী ছেলের পক্ষে কলকাতায় ট্যাক্সি চালানো খুব সহজ কাজ নয়। চারিদিকে বদলোক চোর গুণ্ডা ট্যাক্সিওয়ালাদের টাকা-পয়সা ছিনতাই করে। বাপি এমন অনেক বদলোকের হাতে বার বার আক্রান্ত হওয়ার পর ঠিক করল ট্যাক্সি আর চালাবে না। সে গ্রামে ফিরে আসে। এখন কাঁথিতে এক বাবুর ভাড়ার গাড়ি চালায়। মাত্র দুহাজার টাকা বেতন। খাওয়া থাকা ও নিজের ডিউটির ঠিকঠিকানা নেই। গাড়ির মধ্যেই তার সংসার। সপ্তাহ একদিন ছুটি পায়। সেদিন সে গ্রামের বাড়িতে যায়। এখন সে আফসোস করে কেন পড়া

ছেড়ে দিলাম। বাপির মতো এমন হাজার হাজার ছেলে আছে যেদিন তারা ইস্কুল ছেড়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল সেদিন তারা মনে করেছিল কী মজা। আর ইস্কুলে যেতে হবে না। পড়া মুখস্থ করতে হবে না। উলটে পয়সা পাওয়া যাবে। কী মজা। কী মজা! কিন্তু আজ তারা বুঝতে পারছে সেদিন ভুল করেছিলাম।

গরিবের ঘরের মেয়েদের জীবনে কোনও নিজস্ব মতামতের জায়গা নেই। তার ছোটবেলা থেকেই নির্যাতিত হবার জন্য যেন জন্মেছে। যদি কোনও সংস্থা এই সব অসহায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখবার দায়িত্ব গ্রহণ করে তবেই এরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। দারিদ্র্যের জন্য অনেক বাবা ছেলেমেয়েদের ইস্কুল ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন। গরিবের ঘরে মেয়েদের ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবার পর তাদের মায়েদের সঙ্গে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করতে হয়। তারপর একদিন যেমন তেমন একটা পাত্র দেখে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর তাদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে পড়ে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। স্বামীরও অবস্থা ভাল হয় না। ছেলেপুলে হলে তাদেরও পুষ্টিকর খাবার জোটে না। অনেক সময় অত্যাচারের চোটে তারা স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অথবা তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এইভাবে কত ইস্কুলের ছেলেমেয়ে ইস্কুলের পড়া ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে দুর্ভাগ্যের শিকার হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যেও প্রচণ্ড মনের জোর সম্বল করে অনেকে জীবনে বড় হয়েছে। কিন্তু সবার তো এই মনের জোর থাকে না।

কিন্তু যাদের বাবা-মায়ের সঙ্গতি আছে তারা যখন পড়াশোনায় মন বসায় না, নানা ছুতোয়-নাতায় পড়া ছেড়ে দিতে চায় তারা তখন বুঝতে পারে না কী ভুলই না তারা করছে।

এদের মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে সিনেমা, টেলিভিশন আর কুসংসর্গ। তারা কল্পনাপ্রবণ হয় এবং নিজেদের সব সময় সিনেমার হিরোদের মতো ভাবে। ভাবে সিনেমায় একবার সুযোগ পেলে তারা উত্তমকুমার হয়ে যাবে।

বহুকাল আগে আমার এক সহকর্মী তার এক শ্যালককে আমার কাছে একটা চাকরির জন্য পাঠিয়েছিল। আমি সে সময় একটি সংস্থা গড়েছিলাম সেখানে ছেলেটিকে একটি চাকরি দিয়েছিলাম। ছেলেটি চটপটে। ভাল কথাবার্তা বলে। ক্লাস নাইনে উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

আমি তাকে রাতের কোনও ইস্কুলে পড়িয়ে মাধ্যমিক পাস করানোর চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। তার বিধবা মা বলেছিলেন আপনি পারবেন না। আমার ছেলেকে আমি চিনি। ওকে ভাল করা যাবে না।

কাউকে জোর করে ভাল করা যায় না। আমি শুধু সাহায্য করতে পারি মাত্র। কিন্তু তুমি আমার সাহায্য না-নিলে আমি তোমার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারি না।

আমি ওই ছেলেটিকে আর লেখাপড়া শেখাতে পারিনি। এখন তার বয়স চল্লিশের ওপর। সে এদেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ও অসফল মানুষদের একজন।

বহু মানুষ আছে যারা তাদের নিজেদের দোষেই জীবনে ব্যর্থ হয়। আবার কিছু লোক আছে যারা অপরের সামান্য সাহায্য পেলেই সেটিকে অবলম্বন করে জীবনে দাঁড়িয়ে যায়।

বই বদলাতে পারে জীবনকে

আমার জীবনবাদী বই পড়ে বহু পাঠক লিখেছেন, আপনার বই আমাদের জীবনকে বদলে দিয়েছে। কত ছেলেমেয়ে এখন আমার কাছে কাউন্সেলিং-এর জন্য আসে। কত দূর দূর থেকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও কত ছেলেমেয়ে আসে। তারা অধিকাংশই আসে সমস্যাকে কী ভাবে কাটিয়ে উঠে সঠিক কোনও পথে গেলে তারা বড় হতে পারবে তার সঠিক পথনির্দেশের জন্য। কিন্তু বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় তারা আর কত জন?

কত লোক আছে আমার বই দেখলেই নাক সিঁটকোয়। হঃ, হতাশ হবেন না—আমরা কি হতাশ নাকি! যারা বড় হতে চাও—আরে মশাই আমরা নিজেরাই জানি, বড় হবার পথ কী! আপনি জ্ঞান দেবার কে বটে? নানা মানুষের নানা মত।

তবে একথা জেনে রাখো তোমার ভাগ্যকে তুমি ছাড়া আর কেউ বদলাতে পারে না। জাদুকরও কাউকে জোর করে সম্মোহন করতে পারে না। একমাত্র যে সম্মোহিত হতে চায় তাকেই সম্মোহিত করা যায়। যে সুখী হতে চায় তাকেই সুখী করা যায়। যে বুঝতে চায় তাকেই বোঝানো যায়।

পিছিয়ে পড়া অনেক ছেলেমেয়ে হয় পিছিয়ে পড়তে ভালবাসে, না-হয়, এগিয়ে যেতে তারা আনন্দ পায় না। অথবা পিছিয়ে পড়াকেই তারা এক রকম এগিয়ে যাওয়া ভাবে। সেটি পিছনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আজ যখন রাস্তা দিয়ে অসংখ্য হতদরিদ্র, হতাশ মানুষের মিছিল দেখি তখন ভাবি একদিন এদের মধ্যে বহু লোকই কিন্তু তাদের এই পরিণতির কথা ভাবেনি। কেউ কিছু বলতে এলে বলেছিল, জ্ঞান দিতে আসবেন না।

ছয়

শাবাশ অমিতাভ বচ্চন

পৃথিবীতে মা সবচেয়ে বড়, পিতা স্বর্গের চেয়ে উচ্চতর। জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে গরিয়সী।

রামায়ণ

অমিতাভ বচ্চন যেদিন ষাটে পা দিলেন তখন সেদিনই তিনি তিরুপতি মন্দিরে যান। কেন বলো তো? বাবা-মায়ের জন্য প্রার্থনা করতে।

অমিতাভ হিন্দুস্তান টাইমসের সাংবাদিককে বলেন, আমার বাবা-মা আমার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমরা তার বিনিময়ে কিই বা দিতে পারি। শুধু বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের কাছে মানবিক হয়ে উঠতে পারি। তাঁদের সঙ্গ দিতে পারি।

অমিতাভ বলেন, আমার বাবা-মা আমার কাছে বড় রোল মডেল। বাবা আমাকে বলতেন, আমার ভাগ্য আমার যা প্রাপ্য ততটুকুই দিয়েছে। বরং আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশিই দিয়েছে।

অমিতাভের জীবনে তাঁর বাবা-মায়ের স্থান সবার ওপরে।

মায়ের দুধের ঋণ শোধ করা যায় না

তোমরা যদি কখনও কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে যাও দেখবে একটি মন্দিরের অর্ধেক গঙ্গায় ডুবে গেছে। বছরের সব সময়ই মন্দিরটি এমন আধডোবা অবস্থায় থাকে। এই মন্দির সম্পর্কে গল্প আছে, এক ধনী ব্যক্তি মায়ের নামে এই মন্দিরটি তৈরি করে বলেছিল এত দিনে মায়ের দুধের ঋণ শোধ করলাম। এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটি জলের মধ্যে হেলে পড়ল। সেই থেকেই এই অবস্থায় আছে। কারণ মাতৃঋণ কোনো কিছু দিয়ে শোধ করা যায় না। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী অর্থাৎ স্বর্গের চেয়ে বড়। জন্মভূমিকে সব দেশের মানুষ মর্যাদা দেন এবং হাসতে হাসতে জন্মভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্তু মাকে জন্মভূমির সমান মর্যাদা একমাত্র ভারতীয়রাই দিতে পারে।

ইওরোপ আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা ষোলো বছর বয়স হলেই ডর্মে অর্থাৎ ডর্মেটরিতে চলে যায়। সেখানে থেকে তারা চাকরি-বাকরি করে। যারা আরও পড়তে চায় পড়াশোনা করে। কিন্তু বাবা-মায়ের সঙ্গে আর নিবিড় সম্পর্ক থাকে

না। কিন্তু রাশিয়ায় দেখেছি, রুশরা মাকে ভালবাসে। বৃদ্ধা মাকে নিজের কাছে রেখে দিয়ে সেবাযত্ন করে।

আমাদের দেশে যারা বড় হয়েছে তাদের সকলের মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। গান্ধীজী বাবাকেও প্রচণ্ড ভালবাসতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধীজী লিখেছেন, 'তখন আমার বয়স ষোলো বৎসর। পিতৃদেব ভগন্দরের জন্য যে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইয়াছেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সেবার জন্য আমার মা, বাড়ির একজন চাকর, ও আমিই বেশির ভাগ সময় থাকিতাম। আমার কাজ ছিল নার্সের মতো। তাঁহার ঘা ধোয়ানো ও তাহাতে ঔষধ দেওয়া, যদি মলম লাগাইতে হয়, তবে তাহা লাগানো, তাঁহাকে ঔষধ খাওয়ানো এবং যদি বাড়িতেই ঔষধ তৈরি করিতে হয় তবে তাহা করা—এই সকলই ছিল আমার বিশেষ কাজ। রাত্রিতে সাধারণত আমি তাঁহার পা টিপিয়া দিতাম ; তিনি শুইতে বলিলে অথবা তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে আমি ঘুমাইতাম। এই সেবা করা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একদিনও এই কাজ আমি বাদ দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই সময় স্কুলে যাইতাম। সেই জন্য আমার খাওয়া-দাওয়ার সময় ব্যতীত বাকি সময়টা স্কুলে ও বাবার সেবাতেই অতিবাহিত হইত। তিনি যদি অনুমতি দিতেন অথবা তাঁহার শরীর যদি ভাল থাকিত তবেই সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাইতাম।'

আমার বাবা-মা দুজনেই গত হয়েছেন। তবে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁদের যে আমি পেয়েছি এটাই আমার কাছে ভাগ্য মনে হয়। আমার বাবা কোনও চাকরি-বাকরি করতেন না। তাঁর কোনও সঞ্চয়ও ছিল না। তিনি আমার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। আমার ছোটভাই ও এক অবিবাহিতা বোনের দায়িত্বও আমার ওপর পড়েছিল।

বাবা-মাকে দেখাশোনার জন্য আমি বিলেতে চাকরি না নিয়ে আমার সাংবাদিকতার ট্রেনিং শেষ হবামাত্র ইংলন্ড থেকে দেশে ফিরে আসি। তারপর ২৪ বছর বয়সে কলকাতায় বাসা করে বাবা-মা ভাইবোনকে নিয়ে আসি এবং আমৃত্যু তাঁরা আমার কাছেই ছিলেন।

আমার বাবা শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মা দীর্ঘদিন রোগশয্যায় ছিলেন। শেষের দিকে তিনি প্রায় চলৎশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। কাপড় চোপড়ে, মেঝেতে পায়খানা করে ফেলতেন। পরিচারিকা না-থাকলে আমিই সে সব পরিষ্কার করতাম। এতে আমারই গর্ব হত যে আমি মায়ের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি।

২০০২ সালের ১১ আগস্ট আমার সামনেই মা আমাদের ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যান। জীবনে দুবার মাত্র অসহায় বোধ করেছিলাম। এক বাবার মৃত্যুর দিন। আর একবার মায়ের মৃত্যুর দিন। এই কথাগুলো লেখার সময় আমার চোখ জলে ভরে আসছে। মনে হচ্ছে আমার আরও অনেক কিছু করার ছিল। করতে পারিনি।

মাতৃভক্ত ছেলেমেয়ে দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। সেদিন আমার কাছে একটি ছেলে এসেছিল মেদিনীপুর থেকে। ছেলেটির মা নানা কারণে ডিপ্রেশন

অর্থাৎ অবসাদ রোগে ভুগছেন। অবসাদ রোগ বড় খারাপ ধরনের রোগ। এই রোগে রোগী সব সময় বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে। জীবনের কোনও আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। মানুষ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। সব সময় নেতিবাচক চিন্তায় ডুবে থাকে। তারা কারণে-অকারণে ঝগড়া করে। মহিলারা বেশিদিন এই অসুখে ভুগলে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে।

ছেলেটি পড়াশোনায় খুব ভাল। তার খুব ইচ্ছা সে ডাক্তারি পড়তে অন্য রাজ্যে যায়। কিন্তু মাকে কে দেখবে এই মনে করে যেতে পারছে না। এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সে আমার কাছে এসেছিল পরামর্শের জন্য। আমি তাকে বাস্তববাদী পরামর্শ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম তুমি তোমার কেরিয়র গড়ার জন্য বাইরে যাবে। মাকে বোঝাবে। তুমি মানুষ হলে তোমার মায়েরই ভাল হবে। ছেলেটির মায়ের প্রতি এই আসক্তি দেখে আমার ভাল লেগেছিল।

বাবা-মা : বয়ঃসন্ধির দৃষ্টিতে

সাধারণত বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেরা মায়ের প্রতি একটা টান অনুভব করে ও বাবার সমালোচক হয়ে ওঠে। বাবা কিছু বললেই তারা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে।

মায়ের সঙ্গে চোটপাট করলেও সেটা আবার মিটমাট হয়ে যায়। মা হয়ে ওঠেন ছেলেদের বড় বন্ধু। যদি কোনও পরিবারে বাবা-মায়ের মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়া হয় এবং তাতে মা কষ্ট পায় তাহলে বাবার প্রতি ছেলের মনে মনে ঘৃণা বাড়তে থাকে। বাবা যদি মাকে কষ্ট দেয় ও বাবার যদি চরিত্র দোষ ধরা পড়ে তাহলে ছেলে স্বভাবতই বাবার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। এই রকম পরিস্থিতি হলে ছেলে বাবার মুখের ওপর কথা বলে। বাবা ভাবতে বসেন, এই তো সেদিনের ছেলে তার মুখে আজ এত কথা ফুটেছে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে এর উলটোটা হয়। মেয়ে বাবার দিকে চলে যায়। মেয়ের মনে হতে পারে তার বাবা খুব দুঃখী। তার মায়েরই দোষ। মা বাবাকে সুখী করতে পারল না।

আবার স্বাভাবিক পরিবারেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবণতা দেখা দেয় বাবা-মায়ের রুচি পছন্দ নিয়ে হাসাহাসি করার। তাদের ধারণা প্রজন্ম যে বদলাচ্ছে তা তাদের বাবা বুঝতে পারছে না। তারা পুরনো চিন্তা কামড়ে বসে আছে।

যে সব পরিবারে বাবা অথবা মা দুজনের একজনের দাপট বেশি সেখানে ছেলেমেয়েরা এই দাপটের বলি হয়। বাবার খুব দাপট। মা ভয়ে তটস্থ থাকে। সেখানে বাবা চাইবে ছেলেমেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করতে। যেখানে মায়ের দাপট সেখানে মা চাইবেন ছেলেমেয়েকে তাঁর মতো করে চালাতে। যেখানে উভয়ের সমান দাপট সেখানে দুজনেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে দড়ি টানাটানি করতে চায়। ফলে ছেলেমেয়েরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের ওপর খুব চাপ পড়ে। তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়।

আজকাল অনেক ছেলেমেয়ে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মা বা বাবার সঙ্গে বাস করছে।

তাদের একটা অভাব থেকেই যাচ্ছে। সৎ মা বা সৎ বাবার কাছে ছেলেমেয়ে তেমন আদর ও ভালবাসা পায় না। বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি চায় ভালবাসা।

যেসব ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পাস করতে পারে না বা পড়াশোনায় ঢিলে দেয় তাদের সবার যে মাথা নেই তা নয়, আসলে তারা পড়াশোনায় মন দিতেই পারে না।

"বই নিয়ে বসলেই আমার মধ্যে অশান্তি আরও প্রকট হয়। আমার দাদা আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। মা সব সময় বাবার ব্যবহারে অসুখী। আমার মামার বাড়ির লোকেরা স্বার্থপর। আমি ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ বসে থাকি।"

এই কথাটি যে বলেছে সে ৮০ শতাংশ পেয়ে মাধ্যমিক ও ৭০ শতাংশ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে। কিন্তু বাড়িতে বাবা-মায়ের সম্পর্ক ভাল না থাকায় সে এখন এত উদ্বেগে ভুগছে যে অত ভাল ছাত্র হয়েও জয়েন্ট পায়নি। সে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে।

যে সব পরিবারে বাবা-মায়ের সম্পর্ক ভাল, আত্মীয়-স্বজনের যাওয়া-আসা আছে, বাড়িতে খোলামেলা পরিবেশ এবং বাবা-মা বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের পরিবর্তনশীল মনঃস্তত্ত্ব বুঝতে পারেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা আর যাই হোক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, ব্যতিক্রমী চরিত্রের হয় না।

বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই ছেলেমেয়েরা আশা করে বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো। তারা খুব বেশি বিধিনিষেধের জালে ছেলেমেয়েদের জড়াবে না। তারা সাজেশান দেবে। খোলামেলা আলোচনা করবে। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থাকবে।

প্রশ্ন। বাবা-মায়ের মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া লেগেই আছে। আমি কি প্রতিবাদ করব?

উত্তর। প্রতিবাদ করতেই পারো। কিন্তু তোমার প্রতিবাদের ভাষা হবে সংযত কিন্তু বেশ কঠোর।

প্রশ্ন। প্রতিবাদ করতে ভয় করে যদি বাবা আমার পড়ার খরচ বন্ধ করে দেন।

উত্তর। এটা তোমার আশংকা। ততটা চরম পথ তোমার বাবা নেবেন কি না সেটা তুমিই ভাল বুঝতে পারবে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে বড় হচ্ছে, তারা কথা বলতে শিখছে, প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে উঠছে এটা তোমার বাবা-মাকে সোজাসাপটা ভাষায় মার্জিতভাবে জানিয়ে দাও। সেইসঙ্গে আর একটা শিক্ষা নাও যে তোমাকে ভালভাবে পাস করতেই হবে। বাবা যেন বলতে না পারেন তিনি তোমার পিছনে ভস্মে ঘি ঢেলেছেন।

তবে যে সব পরিবারে বাবা-মা ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে যথার্থ উদ্বিগ্ন, তাঁদের উদ্বেগকে যথেষ্ট মর্যাদা দেবে। এই উদ্বেগ কত খাঁটি তা বুঝবে সেদিন যেদিন তোমরাও বাবা-মা হবে।

বাবা-মা আফটার অল বাবা-মা। যাঁদের কোনও বিকল্প নেই।

তবে এর জন্য বাবা-মায়েরও একটা সহমর্মিতা দরকার। অনেক বাবা-মায়েরই সেটা নেই।

তা ছাড়া তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না।

* ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য বিশেষ শিক্ষাকে বলে Parenting. সেটা সবাই জানেন না।

* অধিকাংশ বাবা-মা জীবিকা অর্জনের তাগিদে বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন।

* অনেক বাবা-মা ভাবেন ছেলেমেয়েদের উপহার দিলেই তারা খুশি থাকবে। এটা সত্যি ছোটবেলায় খেলনা, পুতুল, ভাল জামাকাপড় না-পেলে বাচ্চাদের মনে একটা বঞ্চনাবোধ জেগে থাকে। আমার শৈশবে সাইকেল চড়ার খুব শখ ছিল, সাইকেল পাইনি। এই বঞ্চনাবোধটা এখনও আছে। কিন্তু সব পেয়েছির দেশের ছেলেমেয়েরা কি সবাই সুখী? বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেয় পারিবারিক শান্তির ওপর।

বয়ঃসন্ধির সময় ছেলে-মেয়েরা চায় ইমোশনাল সহযোগিতা। বাবা-মা সৎ শিক্ষক, সৎবন্ধু, শুভানুধ্যায়ী সমাজ সব কিছুই কিন্তু ছেলেমেয়েদের সৎভাবে আত্মনির্ভরশীল মানুষ হয়ে ওঠার পিছনে সাহায্য করে। ছেলেমেয়েরা অনেকে আমাকে বলে দেখুন স্যার, ভাল পরামর্শ দেবার মতো আজ আর আমাদের পাশে কেউ নেই।

কিন্তু কোনও স্থান তো শূন্য থাকতে পারে না।

● বন্ধুরাই হয়ে ওঠে ছেলেমেয়েদের প্রধান উপদেষ্টা। আমার বন্ধু এই বিষয় নিয়ে পড়ছে আমাকেও এটা পড়বে হবে। যদিও এটাতে আমার তেমন প্রবণতা নেই। অথবা বন্ধু পড়া ছেড়ে চাকরির দরখাস্ত করছে আমিও করছি। বন্ধু এই রকম একটা প্যান্ট করিয়েছে, আমিও করছি। বন্ধুরা রোয়াকে আড্ডা দেয়, আমাকেও দিতে হবে। তা নইলে বন্ধু ব্যঙ্গ করবে।

● বন্ধুরা বাইরের বই পড়ে না—আমিও পড়ি না।

আজকাল পশ্চিমী দেশের মতো আমাদের দেশেও পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক ঘর ভেঙে যাচ্ছে।

বাবা-মায়ের মধ্যে সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে বেশ খারাপ। ছেলেমেয়েরা এ-নিয়ে উদ্বেগে ভোগে। এমনকী, বাবা-মায়ের চরিত্রদোষ থাকলে সেটা ছেলেমেয়েকে ভীষণ পীড়া দেয়।

একবার একটি ছাত্রী এসে বলল, তাঁর মা জীবিত থাকতে, বাবা একই বাড়িতে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে বাস করছেন।

মেয়েটি অসহায়। সে পড়াশোনা করছে। মা ডিপ্রেশনে ভুগছেন। দুঃখে মনোকষ্টে শয্যাশায়ী। মেয়েটি কী করবে। সে তো তার বাবাকে ছেড়ে যেতে পারে না। কারণ এর সঙ্গে আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে।

আমি তাকে বিপদের মধ্যে কীভাবে মনের জোর বাড়িয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে তার পরামর্শ দিলাম। তাকে বলেছিলাম, যা প্রতিকার করতে পারবে

না তা সহ্য করার মতো শক্তি অর্জন করো। এজন্য পরামর্শ দিলাম, নিয়মিত ধ্যান করতে।

এই ধ্যানের প্রক্রিয়াটি খুবই সোজা। নিরিবিলি কোথাও বসে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে হবে তুমি তোমার নাকের ডগাটি দেখছ। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হবে। মন থেকে সব চিন্তা ধীরে ধীরে দূর করতে হবে। প্রথম প্রথম মন চিন্তাশূন্য করা যাবে না। হয়তো কোনোদিনই যাবে না। যতটুক করা যায়। সাহিত্যে কি একশতে একশ পাওয়া যায়? যদি ৬০ শতাংশ পাও, তাহলে বলব বেশ ভাল। ৬০ কে ৭০-৮০ করা কঠিন নয়। প্র্যাকটিস চাই। এ ছাড়া মনে উদ্বেগ এলে, খুব উত্তেজনা বা দুঃখ হলে গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস নেবে। এক থেকে দশ গুনতে গুনতে শ্বাস নাও। তারপর নয় থেকে এক গুনতে গুনতে মুখ দিয়ে প্রশ্বাস ছাড়ো।

রোজই নিয়ম করে গান শোনো। গানই তোমার দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে। গান না ভাল লাগে হালকা কোনও মিউজিক টেপে বাজিয়ে শোনো। ম্যাজিকের মতো ফল পাবে।

যেসব ছেলেমেয়ে পড়াশোনায় ভাল হয়, দেখা গেছে তাদের বাবা-মাও পড়াশোনায় ভাল ছিলেন। যারা আঁকে, হাতের কাজ করে, গান গায়, ভাল লেখে তাদের অনেকেরই বাবা, মা, মামা, ঠাকুর্দা, ঠাকুমার এই সব চর্চা ছিল। তাই বলে একথা মনে করার কারণ নেই একজন্মে এসব প্রতিভা কেউ আয়ত্ত করতে পারবে না। প্রবল ইচ্ছা থাকলে যে কোনও মানুষ বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু না পেয়েও যে কোনও বিষয়ে ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারে।

স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা জেমস ওয়াট ছিলেন সাধারণ দপ্তরির ছেলে। ঈশপ ছিলেন ক্রীতদাসের ছেলে। কলম্বাস ছিলেন তাঁতির ছেলে। মহাকবি ভার্জিল ছিলেন কুমোরের ছেলে। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন চাষির ছেলে। রসায়নবিদ মাইকেল ফ্যারাডে ছিলেন দপ্তরির ছেলে। কিন্তু এরা ব্যতিক্রম, তাছাড়াও এঁরা বড় হয়েছেন তাঁদের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বাবা মায়ের সন্তান পালন পদ্ধতি (Parenting) ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

পল এগিল ও ডন কৌচক বলে দুই শিক্ষা-মনোবিদ গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন বাবা-মায়ের চরিত্র ও ব্যবহার সন্তানের চরিত্রকে প্রভাবিত করে। এতে দেখা গেছে সেইসব ছেলেমেয়েরাই ভাল হয় যাদের বাপ-মা কড়াশাসনে রাখে। তবে কড়াশাসন শুধু নয়, তাঁরা ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন। তাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন এটা করা কেন উচিত, কেন উচিত নয়। ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে তাঁদের বড় প্রত্যাশা থাকে। তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে একটা সংগতি বা ধারাবাহিকতা থাকে অর্থাৎ সব সময় একই ধরনের আচরণ করে থাকেন।

এঁদের ছেলেমেয়েদের আত্মমর্যাদাবোধ থাকে। তাঁরা আত্মবিশ্বাসী হয় এবং নিশ্চিন্ত থাকে অর্থাৎ কোনওও উদ্বেগে ভোগে না। তারা ঝুঁকি নিতে চায়। তারা

ইস্কুলেও ভাল রেজাল্ট করে। ওপরের শ্রেণীর বাবা-মাকে বলে কর্তৃত্বপরায়ণ (Authoritative)। তবে কর্তৃত্বপরায়ণ ও কর্তৃত্ববাদী (Authritarian) এক নন। কর্তৃত্ববাদী বাবা মা বলেন, আমি যেমন বলব তেমন করতে হবে। কিন্তু কেন এটা করবে তা তাঁরা বুঝিয়ে দেন না। তারা চান না ছেলেমেয়েরা তাদের মুখের ওপর কথা বলুক। কোনও যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না তাঁরা।

এদের ছেলেমেয়েরা সামাজিক কাজকর্ম থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। বাবা মাকে সন্তুষ্ট করতেই তারা বেশি উদ্বেগে ভোগে। এরা সামাজিক হয় না। আত্মকেন্দ্রিক হয়।

অনেক বাবা-মা ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। এরা Permissive বা প্রশ্রয়বাদী। সন্তানদের কাছ থেকে তাঁরা কিছু প্রত্যাশাও করেন না। এঁদের ছেলেমেয়েরা সুপরিণত হয় না। হয় অপরিণত বা Immature. তাদের নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এরা নিজেদের খেয়ালে চলে। জীবনের কোনওও সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকে না। আর একশ্রেণীর বাবা-মা আছেন যারা ছেলেমেয়ে কী করছে তার খোঁজ রাখেন না। এঁদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের একরকম অভিভাবকহীন বলে মনে করে। এরা জীবনের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ঠিক করতে পারে না। তারা সহজেই হতাশ হয়ে যায়। বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়।

গবেষণা করে দেখা গেছে যে ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক সুস্থ থাকলে ছেলেমেয়েরা আত্মনির্ভর হয়, পারদর্শী হয়, দায়িত্বশীল হয়। তবে দায়িত্বশীল হতে গেলে ছোটবেলা থেকে দায়িত্ব পেতে হবে।

পরিবেশ

উত্তরাধিকার সূত্রে ভাল মন্দ যাই আসুক না কেন, পরিবেশ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের পক্ষে প্রধান এক শর্ত। এ নিয়ে 'আপনি ও আপনার ব্যক্তিত্ব' বইতে আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এটি খুব সহজ করে সবার জন্যই লেখা।

পরিবেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাড়ির পরিবেশ। বাবা-মায়ের মেজাজ চরিত্র ও ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা আগেই বলেছি।

পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে শিশুকাল থেকে তুমি যদি মনের আনন্দ খুঁজে না পাও তাহলে তোমার মনের বিকাশে বাধা পড়বে।

ভাইবোনে ভাব থাকা চাই। আগে একান্নবর্তী পরিবারে শিশুর পরিবেশ খুব স্বাস্থ্যকর ছিল। একসঙ্গে সমবয়সী কাজিনদের সঙ্গে মানুষ হত। বড় বাড়িতে থাকত।

বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকা চাই। মেয়ের কাছে বাবা ও ছেলের কাছে মা সবচেয়ে বড় বন্ধু হতে পারে। যে কথা বাবা-মা বুঝতে চাইছেন না, তা নিয়ে তর্ক বা ঝগড়া না করে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলো। কোনও পাড়ার তুমি বাস করছ। কোনও ইস্কুলে পড়ছ সেটিও তোমার পরিবেশের মধ্যে পড়বে। ভাল ইস্কুল বলতে আমি কোনও সেন্ট মার্কা ইস্কুল বা সরকারি ইস্কুল বোঝাচ্ছি

না। গ্রামেও বহু ঐতিহ্যসম্পন্ন ইস্কুল আছে। শুধু দেখতে হবে মাস্টারমশাইরা প্রত্যেক ছাত্রের ওপর যত্ন নিচ্ছেন কি না। পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করছেন কি না! পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে আর পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন কি না।

ইস্কুলে খেলার মাঠ আর লাইব্রেরি আছে কি না। ইস্কুলে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি না।

তোমার পরিবেশ তৈরিতে আর একটি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে তোমার ইস্কুলের বন্ধু-বান্ধবীর।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার নিজের সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হতে পারে, কিন্তু নেতিবাচক বন্ধুদের সঙ্গে মিশলে এর উলটোটাও হতে পারে। বন্ধুরা যদি তোমার গুণের প্রশংসা করে তাহলে তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগবে আর তারা যদি তোমার দোষ ধরে তাহলে তোমার আত্মবিশ্বাস কমবে। শিশুকাল থেকে কলেজ জীবন পর্যন্ত জীবনে বন্ধুর প্রভাব নিয়ে তো আগেই বলেছি। কিন্তু খারাপ বন্ধু তোমার ওপর খারাপ প্রভাব ফেলবে। তোমার ভাল গুণ নষ্ট করে দেবে। সাধারণত পড়াশোনায় যারা ভাল ফল করতে পারে না তারা তাদেরই মতো খারাপ ফলের ছেলেদের সঙ্গে মেশে। ভাল ছেলেরা মেশে ভাল ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু পড়াশোনায় কেউ খারাপ হলে সে খারাপ হবে তার কোনও মানে নেই আর পড়াশোনায় ভাল হলে সে ধোয়া তুলসীপাতা হবে তারও মানে নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পড়াশোনার ভিত্তিতেই ভাল ছেলে খারাপ ছেলের সীমারেখা তৈরি হয়ে যায়। এটা একটা দুষ্টচক্রের মতো। তুমি যেমন বন্ধুদের সঙ্গে মিশবে তুমিও তেমন হবে।

আমেরিকার ইস্কুল-কলেজে এশিয়ান ছাত্র-ছাত্রী ভাল রেজাল্ট করে। কেন বেছে বেছে এশিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট ভাল হয়? এ নিয়ে একটা গবেষণা হয়। তাতে দেখা যায়, এশিয়ান ছাত্ররা যেসব বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে মেশে তারাও সবাই পড়াশোনায় ভাল। তারা আড্ডার মধ্যেও পড়াশোনা কেরিয়রের কথা বলে। তার ফলে পরস্পরের সান্নিধ্যে তাদের অ্যাকাডেমিক উন্নতি ঘটে।

মূল্যবোধ গড়ে তোল

তোমাদের এই বয়সটাই কিন্তু এই মূল্যবোধ গড়ে তোলার সময়। ছোটবেলায় বাবা-মাকে ভালবাসার কোনওও দাম নেই। তখন তুমি শিশু। তুমি অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হতে বাধ্য। তাই তোমার নিজের জন্যই তুমি বাবা-মায়ের প্রতি নির্ভরশীল ছিলে। কিন্তু এই বয়সে যখন ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হচ্ছ, সে সময় থেকে সারা জীবন যদি বাবা-মায়ের প্রতি ভালবাসা বজায় রাখতে পারো তবেই না তোমার মনুষ্যত্ব।

পরীক্ষা দিতে যাবার আগে নিশ্চয়ই বাবা-মাকে প্রণাম করে যাও। গুরুজনরা থাকলে তাঁদেরও প্রণাম করো। কিন্তু এই প্রণামটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করে

দেখো মন খুব ভাল থাকবে। রোজ যখন ইস্কুলে যাও তখন মা তোমাকে তৈরি করে দেন তো? তখন মাকে প্রণাম করবে।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় চিফ জাস্টিস হয়েছিলেন। খুব গরিব অবস্থা থেকে উঠেছিলেন। তাঁর নামে কলকাতায় একটি কলেজ আছে। স্যার গুরুদাস মাকে রোজ প্রণাম করে তবে হাইকোর্টে যেতেন। আমার ইস্কুল জীবনে রোজ মাকে প্রণাম করে তবে ইস্কুল যেতাম। আমি যে বাড়ি তৈরি করেছি তার ভিতপুজোর জন্য কোনও ঠাকুরমশাই ডাকিনি। মাকে দিয়ে ভিতপুজো করিয়েছিলাম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মা আমার সঙ্গে ছিলেন। এতে আমারই ভাল হয়েছে। মায়ের আশীর্বাদে অনেক আপদ বিপদ কেটে গেছে।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় মনীষীর জীবনী পড়ে দেখো তাঁরা মাকে খুব ভালবাসতেন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মাতৃভক্তি তো কিংবদন্তি হয়ে আছে। একবার বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর জন্য বিদ্যাসাগর খুব ভাল দেখে একটা কম্বল কিনে পাঠালেন। ভগবতী দেবী বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রামের গরিবেরা শীতে কষ্ট পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ কম্বল গায়ে দেব না বাবা।

বিদ্যাসাগর মশাই তখন পাড়ার সব গরিবদের জন্য কম্বল কিনে পাঠালেন।

মহাভারতে আছে পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন প্রতিযোগিতায় জিতে দ্রৌপদীকে বিয়ে করে নিয়ে এসে কুন্তীকে বললেন, মা দেখো কী এনেছি। কুন্তী তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। খেয়াল করেননি অর্জুন কী এনেছে। তিনি বললেন, যা এনেছ পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও।

মায়ের কথা তো ফেলা যায় না। পাঁচভাই মিলে তখন দ্রৌপদীকে বিয়ে করলেন। রামায়ণ মহাভারতে এই কথাই শেখানো হয়েছে বাবার কথা রাখার জন্য ছেলে রাজত্ব ছেড়ে বনবাসে যাওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করে। দেখানো হয়েছে মায়ের কথা সবার থেকে বড়। অবশ্য তা বলে মায়ের কথা মত তোমাদের পাঁচ ভাইকে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে বলছি না। মহাভারতের এই গল্পটিকে প্রতীক হিসেবেই ধরে নাও।

সাত

তুমি ও তোমার বন্ধুরা

উৎসবে, ব্যসনে,
দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে যে তোমার পাশে থাকে সেই প্রকৃত বন্ধু।

চাণক্য

যেসব ছেলেমেয়ে পড়াশোনার নানা সমস্যায় ভোগে তাদের বাবা-মায়েরা তাদের আমার কাছে নিয়ে এলে আমি তাদের মানসিকতা বোঝার জন্য কতগুলি পরীক্ষা করি। এগুলি আমার নিজস্ব পদ্ধতির পরীক্ষা—মনোবিদদের ধারার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। আমি তাদের বলি, তোমার প্রিয় বন্ধুদের নাম লেখো। তারপর সেইসব বন্ধুদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, একজন লোককে চেনা যায় তার বন্ধুদের দিয়ে।

ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের বন্ধুরা প্রধানত তাদের ক্লাসেরই সহপাঠী বা সহপাঠিনী। বড় জোর কেউ এক ক্লাস নীচে বা এক ক্লাস ওপরে পড়ে। যাদের মানসিক বয়স আসল বয়সের চেয়ে একটু বেশি তাদের প্রবণতা থাকে ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার। আমার যেমন এক ক্লাস ওপরের বন্ধুরাই আমার বেশি বন্ধু ছিল।

বন্ধুত্ব ঠিক পাতানো যায় না। বন্ধুত্ব আপনা-আপনি হয়ে যায়। তিনরকম বন্ধু থাকে। যেমন ক্লাসের সব সহপাঠীই তোমার বন্ধু। তার মধ্যে ধরো দশ-বারোজনের সঙ্গে একটু বেশি বন্ধুত্ব। তোমার জন্মদিনে এরাই নিমন্ত্রিত হয়। এদের মধ্যে আবার দুজন থেকে তিনজন আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এদের প্রায় রোজই ফোনটোন করো। তারপর হয়তো একজন কেউ আছে যে তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

বয়ঃসন্ধির সময় বন্ধুদের প্রতি আকর্ষণ খুব স্বাভাবিক। ১৩-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের প্রবণতা থাকে ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে বেশি বন্ধুত্ব করার। মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে। কিন্তু ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাটার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু তা বলে কি পুরনো বন্ধুরা দূরে সরে যায়? তা নয়। তবে ওই যে একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা বললাম সে বন্ধু বিপরীত লিঙ্গের হলেই যেন ভাল হয়। এই বয়সে ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব খুব স্বাভাবিক ও নির্দোষ। বিশেষ করে কোচিং ক্লাসে যাবার একটা বড় আকর্ষণ

ওখানে বেশ আলাদা করে বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলা যায়। একসঙ্গে গল্প করতে করতে ফেরা যায়। মাঝে মাঝে ম্যাটিনি শোয়ে দল বেঁধে সিনেমাও দেখে আসা যায়। গল্পের বিষয়বস্তু সিনেমা খেলাধুলা ও পড়াশোনাকে কেন্দ্র করেই চলে।

ছেলেমেয়েরা বন্ধুত্ব করুক। গল্পগুজব করুক, একটু-আধটু আড্ডাও দিক। এটা এটা এ বয়সের পক্ষে স্বাভাবিক এবং যেটা স্বাভাবিক সেটাই ভাল।

কিন্তু এই বয়সের আর একটা প্রবণতা হল বন্ধুরাই তখন তাদের পথপ্রদর্শক বা গাইড হয়ে ওঠে এবং যে সব ছেলেমেয়ের ব্যক্তিত্ব একটু কম, একটু বেশি ব্যক্তিত্বের বন্ধুরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

বন্ধুদের আড্ডায় দাদা জুটে যেতে পারে। দাদা কুপরামর্শ দিতে পারে।

সঙ্গদোষ

দেখা যায়, পড়াশোনায় ভাল ছাত্ররা বন্ধুদের একটা আলাদা গ্রুপ করে নিয়েছে। আর পড়াশোনায় খারাপ ছাত্ররাও তাদের এক বা একাধিক গ্রুপ গড়ে ফেলেছে। বন্ধুত্ব তাদের সঙ্গেই হয় যারা সমমনস্ক। একই দুঃখের বা হতাশার শরিক।

যারা পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকে তাদের ভাল করার জন্য সব মাস্টারমশাই সমান কেয়ার নেন না। কারণ এরা তো পড়াশোনায় ভাল নয়। এদের সাহায্য করলেও এরা কিছু উন্নতি করতে পারবে না এমন একটা ধারণা করেন মাস্টারমশাই। বাবা বেশি সময় দিতে পারেন না। মা অতটা বোঝেনও না শুধু ছেলের বা মেয়ের রেজাল্ট দেখে উদ্বেগে ভোগেন। চেঁচামেচি করেন। অনেক বাবা মারধরও করেন। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়।

অরুণ এমন একজন ছেলে যে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ভাল ছিল। কিন্তু সেভেনে উঠে তার অ্যালজেব্রা ও জ্যামিতি বেশ কঠিন লাগছে। ইংরেজিও হঠাৎ বেশ শক্ত ঠেকছে। টেন্স একদম বুঝতে পারছে না। ভার্ব কীভাবে বসাবে তা ঠিক করতে পারছে না। গ্রামার তার জটিল ঠেকছে।

অনেক ছেলেমেয়ের কাছে ইতিহাস ভূগোল খুব নীরস বলে মনে হয়। সেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অরুণের রেজাল্ট বেশ খারাপ হল। তিনটে বিষয়ে ফেল। হেডমাস্টার কিছুতেই ক্লাসে তুললেন না। অরুণের মতো আর চারজন ক্লাসে আটকে রইল। অন্য ইস্কুল হলে নাকি টিসি দিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু পরের বছরও অরুণ পাস করতে পারল না। তাকে টিসি দেওয়া হল।

অরুণ অপমানে লজ্জায় রাগে কী করবে ভেবে পেল না। বাবা-মায়ের কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেল। আসলে প্রথম বছর ফেল করার পর তার পড়ার আগ্রহটাই চলে গিয়েছিল। সে টিভি দেখত। মনের উদ্বেগ কাটাবার জন্য পার্কের প্রাচীরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বসত। ভাল ছেলেরা তাকে এড়িয়ে চলত। আড্ডার ছেলেরা বিভিন্ন স্কুলের ফেল করা ছেলে। তারা সমমনস্ক। সকলেই হতাশ। রাগী। তারা সবাই মনে করে তাদের বাবা-মাই তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। এইভাবে বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের ব্যবধান তৈরি হয়। তারা সিগারেট খায়। সিগারেটের সঙ্গে

গাঁজা খায়। মাঝেমাঝে একটা দোকানের পিছনে বসে মদও খায়। নিষিদ্ধ কাজ করছে বলে তাদের রোমাঞ্চও হয়। পরক্ষণে তাদের মনে অপরাধবোধও জাগে।

কলকাতার যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম তাকে তার শত্রুদের নাম লিখতে বলেছিলাম।

একটি নাম লিখেছিল, সেটি তার বাবার নাম।

আমি তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে একদম ঝগড়া করবে না। কিন্তু শুনলাম বাড়ি ফিরেই সে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। বাবার ওপর যা-তা ভাষা প্রয়োগ করেছে।

এইসব ছেলেরা যেন নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মতো হয়ে যায়। ধীরে ধীরে বাড়ির সব নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার বাইরে চলে যায়।

ওদের বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক সমস্যাকে ঠিকমতো মোকাবিলা করতে না-পারার জন্যই ওদের মতো হাজার হাজার ছেলেমেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কতগুলি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

সুবীরের গল্প

সুবীরের বাবা-মা দুজনেই ডাক্তার। সুবীর একমাত্র ছেলে। ছোটবেলা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে।

একদিন সুবীর তার এক সহপাঠীর একটি মোবাইল ফোন চুরি করে ধরা পড়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল ঘটনাটি চিঠি দিয়ে সুবীরের বাবা-মাকে জানালেন। সুবীর অপরাধীর মতো চুপ করে রইল। সুবীরের তো কোনওও অভাব ছিল না। তা হলে সে চুরি করল কেন?

অনেক সময় গরিবের ছেলেরা অভাববোধ থেকে চুরি করে। বড়লোকের ছেলেরা একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবার জন্য দুঃসাহসিক কাজ হিসেবে চুরি করে। কারও কারও মধ্যে ক্লেপ্টোম্যানিয়া বা চুরি করা মানসিক অসুখে দাঁড়িয়ে যায়।

সমর্পণ বলে আর একটি ইস্কুলের ক্লাস টেনের ছেলে এক ডাকাতের দলে যোগ দিয়েছিল। এই গ্যাং-এ কয়েকটি ইস্কুলের ড্রপ আউট ছেলে ছিল। সমর্পণ ও তার আরও পাঁচজন বন্ধু মিলে একদিন তাদের প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে চড়াও হয়ে ক্যামেরা, সেলফোন, ঘড়ি, নগদ টাকা ডাকাতি করে হাতিয়ে নিল।

গব্বরকে ভাড়া করল একজন

কলকাতার একটি অবাঙালি কলেজের ছেলে রাজীব চারলাখ টাকা দিয়ে গব্বর নামে এক ভয়ানক পেশাদার খুনীকে ভাড়া করে তার বান্ধবীর প্রেমিককে খুন করার জন্য। ভারতের সব শহরে কিছু ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের সঙ্গে অপরাধ জগতের একটা যোগসাজশ গড়ে উঠছে। প্রত্যেক পাড়াতেই গেলে দেখা যাবে একশ্রেণীর মস্তান গজিয়ে উঠেছে। এই মস্তানরা কারা? এক পাড়ারই ছেলে। এরা একদিন ইস্কুলে পড়ত। কিন্তু কোনও কারণে তাদের আর পড়াশোনা করতে ইচ্ছে

করল না। পারিবারিক কারণ হতে পারে। আর্থিক কারণ হতে পারে। অথবা তাদের তেমন মাথা নেই। পড়াশোনা বুঝতে পারত না।

কিন্তু কেউ আলাদা করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। তারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে লাগল। ক্লাসে ফেল করতে লাগল। তারপর ইস্কুল ছাড়তে বাধ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি-বাকরি জুটল না। সমমর্মী অনেক বন্ধু জুটে গেল। অপরাধীরা রিক্রুট করার জন্য এইসব ছেলেদেরই খোঁজে। প্রলোভন ও কিছু করার প্ররোচনায় তারা মস্তান হয়ে যায়। গায়ের জোর দেখিয়ে টাকা তোলে।

ইস্কুলের একটি নিরীহ নিষ্পাপ ছেলেও এইভাবে অপরাধ জগতের দিকে চলে যেতে পারে।

বদ্ধ জল পেলে সঙ্গে সঙ্গে মশার জন্ম হয় তেমনি সমাজের বর্তমান অবস্থাতেও একটি ভাল ছেলে সহজেই খারাপ হয়ে যেতে পারে। কেন না, তার সামাজিক পরিবেশ ওই বদ্ধ নোংরা জলের মতো।

* বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলছে টেলিভিশন আর হিন্দি সিনেমা। যেসব দৃশ্য বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেমেয়েদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে সেইসব দৃশ্য চ্যানেল ঘোরালেই চোখে পড়ে। আগে যখন শুধু দূরদর্শন ছিল তখন তার মধ্যে একটা ন্যূনতম শালীনতাবোধ ছিল। এখন প্রাইভেট চ্যানেলগুলির মধ্যে তা নেই।

* বিজ্ঞাপনগুলি প্ররোচনামূলক। এক নম্বর তারা শুধু লোভ দেখাচ্ছে। এটা কেনো ওটা কেনো। বলাবাহুল্য, এসবই প্রচুর দামী ভোগ্য পণ্য। কিন্তু কখনও শেখাচ্ছে না এইসব দামি জিনিস কেনার মতো টাকা সৎপথে থেকে কীভাবে উপার্জন করতে হবে। যাদের বুদ্ধি কম সেই সব ছেলেমেয়ে ভাবছে এগুলি না থাকলে জীবন বৃথা। খারাপ বন্ধুদের প্ররোচনায় কেউ কেউ বাবাকে খুনও করেছে। কেউ প্রচুর টাকা-পয়সা চুরি করেছে।

যারা ড্রাগ ধরেছে বা নেশা ধরেছে তারা পুলিশের কাছে কবুল করেছে বন্ধুরাই তাদের এসব শিখিয়েছে।

বন্ধুরাই শেখায় মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করতে। বন্ধুরাই শেখায় গাড়ি হাইজ্যাক করতে। বন্ধুরাই শেখায় বিপ্লবের নামে গলা কাটতে।

আর এই পনেরো-ষোলো বছর বয়সটায় ছেলেমেয়েরা বন্ধুর ওপরেই নির্ভর হয়ে পড়ে। ভাল বন্ধু হলে তারা জীবনধারাটাই পালটে দিতে পারে। তারা তোমাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে তোমাকে আমূল বদলে দিতে পারে।

বন্ধুদের কথা শুনে বাবা-মায়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে তোলা আর একটা বোকামো। বাবামায়ের সঙ্গে কারণে-অকারণে ঝগড়া বাধিয়ে তাদের চোখের জল ফেলে তোমার বড় হওয়া সম্ভব নয়। ঘৃণা বুকে চেপে রেখে সুখী হওয়া যায় না।

ভর্তৃহরি বলছেন, হরি সন্তুষ্ট হলে তবেই মানুষ পায় সদাচারী পুত্র। মনে রাখতে হবে আমরা ভারতীয়। ভারতীয়দের মূল্যবোধের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হল বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি।

বন্ধু নিয়ে আরও কথা

অমিত ক্লাস নাইনে পড়ে। তার বন্ধুদের একটা দল আছে। এদের মধ্যে তাদের ক্লাসের দুটি ছেলে আছে জয়দীপ আর সুমন। বাকিরা তাদের খেলার বন্ধু। খেলার মাঠে ওরা ফুটবল খেলতে যায়। এই খেলতে গিয়েই বাকি বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ। তাদের মধ্যে আছে রঞ্জিত, সঞ্জয় আর পূষণ। এরা অন্য ইস্কুলে পড়ে। সুজিত আর শঙ্খ কোনও ইস্কুলে পড়ে না। এরা বাড়িতেই বসে আছে। খেলার মাঠে ত্রিশ চল্লিশটি ছেলে আসে। কিন্তু এদের মধ্যে ছোট ছোট অনেক দলে বন্ধুরা বিভক্ত। কীভাবে এই দল গড়ে উঠল তা তারা বলতে পারে না। তবে মাঠে ছেলেদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ওরা এখন ছোটদের জন্যই মাঠটা ছেড়ে দিয়েছে। বড়রা আড্ডা দিতেই ভালবাসে।

তবে যারা কলেজে পড়ে তারা বেশ অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে আড্ডা দেয়। ওদের সাড়ে ছটার মধ্যে বাড়িতে ঢুকে পড়তে হয়। এজন্য ওদের ভীষণ রাগ। ওরা ঈর্ষা করে বড়দের। ওঃ, বড়রা কী স্বাধীন। ওদের বড় হতে কত দেরি? এখনও তিন-চার বছর।

ওদের আড্ডায় সাধারণত ফুটবল ক্রিকেট আর টিভি সিরিয়াল নিয়ে আলোচনা হয়। জয়দীপ আগে ছোট ছোট করে চুল ছাঁটত। একদিন দেখল সুমন বড় চুল রেখেছে আর ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামিয়েছে। জয়দীপও দেখাদেখি বড় করে চুল ছেঁটে এল। এ নিয়ে মায়ের কাছে বকুনি খেল। কিন্তু বকুনিকে বেশি গুরুত্ব দিল না।

একদিন সুজিত তাদের বলল, মারিজুনা বলে একটা দারুণ জিনিস আছে। কাগজের মধ্যে দিয়ে সিগারেটের মতো ধরিয়ে একটান দিলে তো সে যে কী দারুণ মজা লাগে। ওরা যদি চায় তাহলে তাদের ওই নেশাখোরদের ঠেকে (আড্ডায়) নিয়ে যেতে পারে।

সবাই ঠিক করল একদিন ওই ঠেকে গিয়ে বসবে। গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসবে। কিন্তু জয়দীপ বলল, না ভাই আমার ভীষণ ভয় করে।

তখন সবাই মিলে জয়দীপের ওপর পড়ল। তুই দেখছি ভীষণ কাওয়ার্ড। আরে আমরা তো মাত্র একদিন মজা করার জন্য যাচ্ছি। রোজ রোজ তো আর নয়।

বন্ধুরা পাছে তাকে চালাক-চতুর না ভাবে সেজন্য জয়দীপ এক রবিবার দুপুরে খেলতে যাচ্ছি বলে তার বন্ধুদের সঙ্গে সেই ঠেকে গেল।

সেটা একটা দোকানের পিছন দিক। একটা অল্প আলো জ্বলছিল। সুজিত আর শঙ্খের সবাই চেনা। সেই ঘরে বসে দুতিনটি ছেলে সিগারেটের মতো কী একটা টানছে আর মড়ার মত চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে। একটা দাড়িওয়ালা লোক এলে শঙ্খ তার সঙ্গে চুপি চুপি কী কথা বলল। লোকটি একটু পরে কাগজে মোড়া অনেকগুলি প্যাকেট নিয়ে এল। তারপর শঙ্খ দেখিয়ে দিল কীভাবে টানতে হয়।

সেদিন ছয় বন্ধু গিয়েছিল ওই ঠেকে। তার মধ্যে দুই বন্ধু রঞ্জিত আর সঞ্জয় এখন নিয়মিত ড্রাগ অ্যাডিক্ট।

রঞ্জিতের বাবা ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। হাত খরচের জন্য সে নিয়মিত ভাল টাকা বাবার কাছ থেকে পেত। বাবা যেদিন জানতে পারলেন ছেলে ড্রাগ ধরেছে তিনি টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু ড্রাগের নেশা একবার ধরে গেলে সে তখন পাগল হয়ে যায়। টাকার জন্য সে বাড়ির জিনিসপত্র চুরি করে বিক্রি করতে লাগল। আত্মীয়-স্বজনের কাছে মিথ্যে কথা বলে টাকা আনত। কাউকে বলতো বাবা আপনার কাছে পাঠালেন। একশোটা টাকা চেয়েছেন কী একটা চ্যারিটি শো হচ্ছে। টিকিটটা আনতে মনে নেই। কাল দিয়ে যাব। এমনি নানা বাহানায় সে টাকা আনত।

রঞ্জিত আমাদের নীচের ফ্ল্যাটেই থাকত। তাকে প্রায় রোজই দেখতাম। তার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সব সময় তার চোখের দৃষ্টি ছিল পাগলদের মতো। স্নানটান প্রায় করত না। একসময় ফিটফাট থাকত। পরে দেখলাম নোংরা সাতবাসি জামা-প্যান্ট পরে সে রাস্তায় ঘুরছে।

তারপর একদিন সকালে উঠে শুনি আগুন, আগুন চিৎকার। নীচের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে ধোঁয়া আসছে। তাড়াতাড়ি দমকলে ফোন করলাম।

শুনলাম রঞ্জিত কাল রাতে বিছানায় শুয়ে ড্রাগ নিচ্ছিল। তারপর মশারিতে আগুন ধরে যায়। দমকল এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ফ্ল্যাটের তেমন ক্ষতি হয়নি। শুধু মশারিটা পুড়ে গেছে।

হাসপাতালে দুদিন ভর্তি থেকে তিনদিনের দিন রঞ্জিত মারা গেল।

মেয়েদের বলছি

মেয়েদের বিশেষ করে বলছি তোমাদের বাবা-মা তোমাদের সকলের সঙ্গে মিশতে বারণ করেন এটা কিন্তু তাঁরা ঠিকই বলেন।

তোমাদের এখন ভালমন্দ বোঝার বয়স হয়নি। শুধু এইটুকু জেনে রেখে দাও মেয়েদের বিপদ আরও বেশি। তোমরা কখনই একা একা অপরিচিত জায়গায় যাবে না। নির্জন রাস্তা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। কোনও পুরুষের সঙ্গে একা কোথাও যাবে না। একা ঘরে থাকবেও না।

কেউ অসভ্যতা করলে বাবা-মাকে বলতে লজ্জা করবে না। বরং এই অসভ্যতা চেপে গেলে পরিণতি ভয়ানক হতে পারে। কিছুদিন আগে আমার কাছে একটি কলেজের ছাত্র এসেছিল। ছেলেটির জীবন নষ্ট করে দিয়েছে তার কাকার বয়সি একটি লোক। শুধু মেয়েরাই নয় বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেরাও বদলোকদের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। খারাপ বন্ধুরাও তাদের সমকামী হতে প্ররোচিত করে।

ছেলেটি যখন ইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে তখন লোকটি তার সঙ্গে ভাব জমায়। তারপর তাকে একদিন তার ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে আর কেউ ছিল না। লোকটি কতগুলি খারাপ খারাপ ছবি ছেলেটিকে দেখায় ও তাকে খারাপ কাজ করতে শেখায়। এইভাবে দিনের পর দিন চলে। ছেলেটির শরীর স্বাস্থ্য মানসিক চাপে

ভেঙে যায়। সে আমাকে বলে, আমি বুঝতে পারছিলাম আমি ক্রমশ খারাপ দিকে চলে যাচ্ছি। কিন্তু লজ্জায় ও ভয়ে কারও কাছে বলতে পারছি না। সেই থেকে আমার আত্মবিশ্বাস একদম কমে যায়। কলকাতায় হিন্দু ইস্কুলের মতো ইস্কুলে ভর্তি হয়েও আমি পড়াশোনায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ি।

এই বয়সেই মেয়েদের জেনে রাখা দরকার যে কেউ যদি কোনও মেয়ের দেহ স্পর্শ করে, তাকে জোর করে আদর করতে চায় এবং তাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে সেটা শ্লীলতাহানি অর্থাৎ অভব্য আচরণ। এটা সভ্য সমাজের নীতিবিরুদ্ধ শুধু নয়, আইন বিরুদ্ধও অনেক সময় অনেক গুরুজনস্থানীয় আত্মীয়-স্বজনও হঠাৎ হঠাৎ এমন আচরণ করে বসে।

শ্লীলতাহানি মারাত্মক অপরাধ। এই অপরাধীর শাস্তি জেল। কাগজ খুললেই আজকাল ধর্ষণের খবর পাওয়া যায়। ধর্ষিতাদের মধ্যে তোমাদের চেয়েও ছোট মেয়েরাও আছে। এগুলি সব সিনেমা আর টিভি সিরিয়াল দেখার কুফল। মেয়েরা সাবধান না-হলে এই অপরাধ দমনের তেমন পথ নেই।

এই ধরনের দুর্ঘটনা যে কোনও মেয়ের জীবনে ঘটতে পারে। অনেক মেয়ের জীবন এতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেখা গেছে পরিবারের নিকট আত্মীয়রা যেমন দাদা, কাকা, জেঠা, মামারা পর্যন্ত সুযোগ পেলে মেয়েদের ধর্ষণ করে তাদের লালসা মেটায়। মেয়েরা লজ্জায় এসব কথা বলতে পারে না। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া তোমারই দায়িত্ব। তোমাকে নিয়ে এসব ঘটনা ঘটলে চুপ করে থাকলে চলবে না। মতলব খারাপ দেখলে চেঁচাবে।

ছেলে ও মেয়েদের খারাপ পথে নিয়ে যাবার জন্য পরিবারের মধ্যেও লোকের অভাব নেই। ভয় বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির সময়কার মেয়েদের। তখন তারা ভালমন্দ বুঝতে পারে না। কখনও বয়স্ক পুরুষদের প্রলোভনে (সে পুরুষ হয়তো তার আত্মীয়) পড়ে যায় সে। কখনও খারাপ ছেলেরাও তাদের কুপথে টানে। শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারে মায়েরা মেয়েদের অনেকটা চোখে চোখে রাখে। কিন্তু গ্রামে তা সম্ভব হয় না। তা-ছাড়া নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরিব পরিবারে উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েদের ওপর বাপ-মায়ের শাসন শিথিল।

এমনও ঘটনার কথা জানা গেছে যেখানে ছ'বছরের এক শিশুকন্যার ওপর তার এক কাকা অশালীন আচরণ করছে। এখন ছ'বছরের মেয়ের তো প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই। এক্ষেত্রে বাবা-মাকেই মেয়েকে চোখে চোখে রাখা নিয়ম। কিন্তু পনেরো-ষোলো বছর বয়সের মেয়েদের তো প্রতিবাদের ক্ষমতা আছে।

তারা যেন প্রলোভনে না ভোলে। তাদের ওপর কেউ অসভ্য আচরণ করার ইঙ্গিত দিলে তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে এবং বলে, এমন করলে আমি কিন্তু বাবাকে বলে দেব।

সাধারণত দেখা যায় ইস্কুল কলেজের ফেট বা অনুষ্ঠানের দিন। সরস্বতী পুজো, দুর্গোপুজো বা খ্রিস্টমাসের মতো উৎসবের সময় ছেলেমেয়েরা বেশ খোস মেজাজে থাকে। এই সময় অনেক ছেলে মদ্যপান করে। এছাড়া বিয়ে বাড়ির উৎসব ও

হইহট্টগোলের মধ্যেও ছেলেমেয়েরা খুব কাছাকাছি আসে।

কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে দুর্বল হয়ে পড়লেই মুশকিল। বিশেষ করে মেয়েদেরই সতর্ক থাকতে হয় ছেলেরা যেন তাদের কোনও নির্জন অন্ধকার জায়গায় না-নিয়ে যায়।

এমনই একটা ঘটনা ঘটেছিল গোয়ার পানাজিতে। ঘটনাটি পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে দিলাম।

Girl gangraped by college seniors

PANAJI (PTI) : Four final-year students of a local arts college have been arrested for allegedly raping a junior student at a farewell party, police said.

Three students were arrested on Friday, while another was nabbed on Saturday morning following a complaint by the victim, DIG Karnal Singh said.

A group of students had raped the teenager in the toilet of the campus canteen last week, he said, adding that police teams have been sent to various parts of Goa to apprehend the other culprits.

Chief Minister Manohar Parrikar visited the police headquarters here and took stock of the investigations into the case.

আমি সব সময় মেয়েদের বলি, তোমরা ছেলেদের সঙ্গে মিশবে বন্ধুর মতো। কিন্তু তারা কোনও সুযোগ নিতে চাইলে তোমরা সতর্ক থাকবে।

সন্ধ্যার পর মেয়েদের একা একা নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটা উচিত নয়।

আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের ক্যারাটে শেখাটা খুবই জরুরি।

ভাল বন্ধু কোথায় পাব?

মনে রাখার তুমি যেমন প্রকৃতির ছেলে বা মেয়ে তুমি বন্ধুও পাবে সেইরকম প্রকৃতির। তুমি যদি পড়াশোনাতে ভাল নাও হও যদি শুধু ভদ্র হও তাহলে তোমার এই ভদ্রতার জন্যই তুমি ভদ্র বন্ধু পাবে।

ভাল বন্ধু মানেই যে ক্লাসের ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় হতে হবে তার কোনও মানে নেই। ভাল বন্ধু হল সে—

* **যে স্বার্থপর নয়।** স্বার্থপর ছেলেমেয়েরা তোমার কাছ থেকে শুধু সুযোগ সুবিধা নিতে চাইবে তোমায় কিছু দিতে চাইবে না। ধরো তোমার কাছ থেকে একটা বই নিল, খাতা নিল। কিন্তু তুমি যখন তার কাছে কোনও বই-খাতা চাইলে সে এড়িয়ে যাবে। নয়তো মিথ্যে কথা বলবে যে নেই।

* **ভাল বন্ধু হবে সবসময় উপকারী।** শুধু তোমার উপকার নয়, যার দরকার তাকেই সাহায্য করার জন্য সে মুখিয়ে থাকবে।

* ভাল বন্ধুর পোশাক-আশাক ভদ্র ও রুচিসম্মত হবে।

* ভাল বন্ধু হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

* ভাল বন্ধু তোমাকে তাঁর বাড়িতে ডাকবে এবং তোমার বাড়িতেও আসবে। ভাল বন্ধুদের বাবা-মায়েরা তোমায় ভালবাসবেন ও তোমার বাবা-মাও তাদের ভালবাসবেন।

* ভাল বন্ধু পরস্পরকে নিয়ে বিদ্রূপ ঠাট্টাতামাসা করবে না। কারও দুর্বলতা ধরার চেষ্টা করবে না।

* ভাল বন্ধু কখনও বন্ধুর ধর্মবিশ্বাস, ভাষা ও জাতপাতের কথা তুলবে না।

* ভাল বন্ধু যদি এমন কোনওও খবর পায় যেটা জানলে বন্ধুর উপকার হবে সে তখনই তাকে খবরটা দেবে।

* কোনও বই পড়ে ভাল লাগলে ভাল বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকে বইটা পড়তে দেবে না হয় বইটার কথা বলবে।

* ভাল বন্ধু বন্ধুর আচরণে মনে দুঃখ পেলে তা চেপে রাখবে না সঙ্গে সঙ্গে বলবে তোর কথায় খুব দুঃখ পেয়েছি। তখন বন্ধু তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলবে— আমি খুব দুঃখিত, কিছু মনে করিস না ভাই।

* ভাল বন্ধু সব সময় বন্ধুর অসাক্ষাতে অন্য বন্ধুর কাছে তার বন্ধুর নিন্দা করবে না।

* বন্ধু খারাপ সংসর্গে মিশলে বা খারাপ কাজ করলে ভাল বন্ধু তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে।

* ভাল বন্ধু তোমার ভাল কাজে তোমায় উৎসাহিত করবে।

* ভাল বন্ধুর পড়াশোনার বাইরে ভাল হবি থাকবে। যেমন লেখালেখি, ছবি আঁকা, মডেলিং, গান-বাজনা, ব্যায়াম, খেলাধুলো, নাটক ও আবৃত্তি। গল্পের বই পড়া এমন ধরনের কোনও না কোনও কাজে তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকবে।

* ভাল বন্ধু সুন্দর করে কথা বলতে পারবে। সে নিজে হাসিখুশি এবং মজার মজার কথা বলে জমিয়ে রাখতে ওস্তাদ।

* ভাল বন্ধু যে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু হলেও তার অহংকার থাকবে না। না হলেও তার মধ্যে হীনমন্যতা থাকবে না। বন্ধুত্বের সঙ্গে গরিব-বড়লোকের কোনও সম্পর্ক নেই। একথা মনেও আনা উচিত হবে না।

জীবনে ভাল বন্ধুর প্রভাব

আমাকে এক জার্মান ভদ্রলোক বলেছিলেন, ইস্কুল জীবনের পর আর প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় না। তাই ইস্কুল জীবনে শুধু জ্ঞান আহরণ নয়, বন্ধু আহরণেরও প্রকৃত জায়গা।

এই মুহূর্তে তুমি মনে মনে ভেবে নাও তোমার ইতিবাচক বন্ধুর সংখ্যা কত? তিন-চারজন, এমনকী, একজন থাকাও যথেষ্ট। তবে ক্লাসের সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব

রাখতে হবে। কারণ তা না হলে সবাই মনে করবে তুমি খুব দেমাকি।

ক্লাসে ভাল ছেলেদের সবাই যেমন ভালওবাসে তেমনি মনে মনে ঈর্ষাও করে। তুমি যদি ভালদের একজন হও তাহলে তোমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

তোমাকে সবার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে হবে। কেউ যেন না ভাবে তাকে তুমি 'ইগনোর' দিচ্ছ। আর তুমি যদি ভাল ছেলেদের এক জন হও তাহলেও সবাই তোমার বন্ধু হবে না। বেশির ভাগই তোমাকে এড়িয়ে চলবে। সন্দীপ বলে একটি ছেলে লিখছে, আমি সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তিনজন ছাড়া বন্ধুবান্ধবী পাইনি। প্রথমে ভেবেছিলাম, এ আমারই ত্রুটি। এগিয়ে গিয়ে হাত ধরতে চাইতাম অনেকের। পরে বুঝেছি আমার আরো একটা অপরাধ আছে—তা হল ঐ শ্রেণীগুলোতে আমি ধারাবাহিকভাবে First boy ছিলাম। তাই অন্যেরা আমায় হিংসে করত। বন্ধুত্বের খিদে আমার কলেজে গিয়ে নিরসন হয়েছে।

ফার্স্ট বয়দের অনেক সময় অন্তরঙ্গ বন্ধু হয় না। কারণ অন্যেরা তার সঙ্গে মিশতে সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু তা বলে তুমি ফার্স্ট হবে না তা তো হতে পারে না। তবে তখন তোমাকেই বেশি করে মিশুকে হয়ে প্রমাণ করতে হবে তোমার কোনও দেমাক নেই।

তেমনি বড়লোক বা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদেরও বন্ধু পাওয়া কঠিন। কারণ বড়লোক বলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের এড়িয়ে চলতে পারে।

পত্রবন্ধু করো

পত্রবন্ধু থাকলে চিঠি লেখার অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়। এটা খুব ভাল অভ্যাস। কারণ এতে গুছিয়ে কিছু লেখার ক্ষমতা হয়ে যায়। পত্রবন্ধু বিদেশি হলে আরও ভাল। তাহলে ইংরেজি লেখার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে।

পত্রবন্ধুর কাছে এমন কিছু লিখবে না যাতে তার মনে আঘাত লাগতে পারে। তার ভাষা সংস্কৃতি, আচার প্রথা নিয়ে কখনও ঠাট্টা করবে না। তার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কখনও কোনওও কথা তুলবে না। বরং তার ধর্ম সম্পর্কে তুমি আগ্রহ প্রকাশ করে জেনে নেবে।

অন্যধর্মে কেমন আচার-ব্যবহার।

তাদের বিয়ে-থা কীভাবে হয়।

তাদের ইস্কুল কীরকম।

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমার এক পত্রবন্ধু ছিল। সেও আমারই মতো এক গ্রামের ছেলে। তার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার মিঠানি গ্রামে। তার নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

আমরা কিছুদিন যাবৎ চিঠি লেখালেখি করেছিলাম। তারপর চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ছোটবেলায় বন্ধুকে ভুলতে পারিনি। বহুকাল পরে আমার বয়স তখন ষাট পেরিয়ে গেছে তখন একদিন আমার সেই ছেলেবেলার পত্র-বন্ধুর চিঠি পেলাম। আমার বই থেকে সে আমার ঠিকানা জোগাড় করেছে। আমার তো

খুব ভাল লাগল। আবার কতকাল পরে তাকে চিঠি লিখলাম।

ছোটবেলার বন্ধুর মতো অত মধুর আর কিছু হয় না। সেই কৃষ্ণ-সুদামার গল্প জানো তো। কৃষ্ণ আর সুদামা ছোটবেলার দুই বন্ধু। সুদামা গরিবই থেকে গেলেন। কৃষ্ণ বড় হয়ে দ্বারকার রাজা হলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে দীর্ঘকাল যোগাযোগ নেই। তারপর সুদামা একদিন দেখা করতে গেলেন রাজা কৃষ্ণর সঙ্গে। কৃষ্ণ ছোটবেলার বন্ধুকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুজনে মিলে কত সুখ দুঃখের কথা হল। গরিব বলে কৃষ্ণ তাকে কোনও অবজ্ঞা করেননি। বন্ধু বন্ধুই।

আমাদের সময় গ্রামে টেলিফোন ছিল না। এখন শুধু ডায়াল করলেই সারা পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় ফোন করা যায়। আমাকে তাই বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করতে হত চিঠি লিখে। কত জায়গায় কত চিঠি লিখতাম। বিভিন্ন ম্যাগাজিনে লেখা পাঠাতাম। খবরের কাগজে চিঠি পাঠাতাম। অনেক চিঠি ছাপাও হত। কারও সঙ্গে আলাপ হলে চিঠি লিখতাম। লেখকদের চিঠি লিখতাম।

এখন আমাকে বিভিন্ন বয়সি ছেলেমেয়েরা চিঠি লেখে। তাদের মধ্যে ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন আমার কোনও বই পড়ে আমায় মতামত দেয় তখন মনে হয় বড় একটা পুরস্কার পেলাম। সে এই বয়সেও আমার বন্ধু হয়ে গেল। পত্রবন্ধু।

কাকে চিঠি লিখবে

কাকে চিঠি লিখবে ভেবে পাচ্ছ না?

ভাবছ বন্ধুদের সঙ্গে তো রোজই দেখা হয় তাদের চিঠি লিখে কী হবে?

* বেশ তো, পুজোর ছুটিতে কোথাও বেড়াতে গিয়েছ তখনই না হয় বন্ধুকে চিঠি লেখো। তাই সব সময় সঙ্গে ইনল্যান্ড খাম বা পোস্টকার্ড নিয়ে যাবে।
* খবরের কাগজে চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি লিখতে পারো। যে কোনও সমস্যা নিয়ে।
* কোন বই পড়ে ভাল লাগলে লেখককে চিঠি দাও। তিনি কত খুশি হবেন। ঠিকানা জানা না-থাকলে প্রকাশকদের ঠিকানায় লেখো।
* প্রতিটি চিঠি লেখার সময় অভিধান দেখে বানান দেখে নাও। ভুল বানান হলে তোমার ভাবমূর্তি খারাপ হয়ে যাবে। শুদ্ধ বানানেই তোমার পরিচয়।

আট

কুসঙ্গ ও সুসঙ্গ

সাধারণত সবাই মনে করে শুধু যেসব ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে দিনরাত রোয়াকে বসে বা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়, মেয়েদের দেখলে টিটকিরি দেয় তারাই একমাত্র খারাপ। তাদের সঙ্গে মেশাটাকেই বলে কুসঙ্গ। কিন্তু পড়াশোনায় ভাল, ভদ্রবেশী, চাকরি-বাকরি করে বাইরেটা দেখতে নিরীহ এমন লোকও খুব খারাপ লোক হতে পারে।

আসলে কোনও কোনও লোককে বা কোনও ছেলেকে দেখলে খারাপ মনে হয় না, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশলে তবেই তাদের আসল পরিচয় বোঝা যায়। আমি একজন সাধুকে দেখেছি যে বারো চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করত।

অন্তরঙ্গভাবে কারও সঙ্গে মেলামেশার আগে সব সময় ভাববে বন্ধুত্ব হয় সমবয়সীদের মধ্যে। বয়সে বড় কারও সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশবে না। পড়াশোনায় ভাল এমন অনেক ছেলে ছোটবেলা থেকে সিগারেট, গাঁজা, চরস এমনকী, ড্রাগও খায়। এই ধরনের তথাকথিত ভাল ছেলেও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই মিশবে সবার সঙ্গে কিন্তু খুব সাবধানে। যখনই দেখবে ছেলেটি বা মেয়েটি সুবিধার নয়, তার মতলব খারাপ সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যাবে। সব ছেলেমেয়েই কিন্তু খারাপ হয় খারাপ বন্ধুদের সংসর্গ থেকে। নিজে নিজে কেউ ড্রাগ খায় না। খারাপ কাজ করে না। খারাপ বন্ধুরাই তাদের শেখায়।

তোমাদের এখন যা বয়স তাতে নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে কোনও কাজ করতে খুব ভাল লাগে। ধরো, এর ওর বাগান থেকে কিছু চুরি করা। চটজলদি পয়সা উপার্জনের জন্য বন্ধুরা পরামর্শ দেয় বাবা-মায়ের বাক্স ভেঙে টাকা চুরি করতে। আমি এমনও দেখেছি ড্রাগ কেনার জন্য একটি ছেলে নিয়মিত বাড়ির জিনিসপত্র চুরি করে বেচে দিচ্ছে। এই করতে করতে একদিন মায়ের গহনাও বেচে দিয়েছে।

খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অনেক ভাল ভাল পরিবারের ছেলেমেয়ে অপরাধী হয়ে যায়। এদের বলে শিশু অপরাধী। আঠারো বছরের নীচে বয়স হলে তাদের জুভেনাইল আদালতে বিচার হয়। সেখান থেকে অপরাধ সাব্যস্ত হলে তাদের কতগুলি সংশোধন হোমে পাঠানো হয়। কিন্তু নামেই হোম, আসলে সেগুলো জেলখানা। সেখানে একবার ঢুকলে কম ছেলেমেয়েই আবার ভাল হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

আমি যখন সাংবাদিকতা করতাম তখন অনেকবারই এইসব শিশু অপরাধীদের সঙ্গে দেখা করেছি। অধিকাংশই চুরি-ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। এরা কীভাবে অপরাধী হয়ে উঠল তা তাদের নিজমুখে শোন। আমি তাদের নামধাম পালটে দিয়েছি।

'আমার নাম সমীর। আমি ক্লাস নাইনে যখন পড়ি তখন আমার ক্লাসের এক বন্ধুর কাছে রাজুদার নাম খুব শুনতাম। রাজুদা আর একটি ইস্কুলে পড়ত। দুবার মাধ্যমিকে পাস করতে পারেনি। সে নাকি প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে।

আমার খুব ইচ্ছে করত আমি কিছু একটা সাহসের কাজ করে দেখাই। আমার বন্ধু রজত বলত তার পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না। পড়ে কোনও লাভ নেই। কত লোক বেকার। তার চেয়ে সে গোয়ায় গিয়ে একটা হোটেল খুলবে। সেটা নাকি খুব ভাল জায়গা। রাজুদা বলেছে তাকে কিছু পুঁজি জোগাড় করে দেবে।

রজত আমাকে একদিন রাজুর কাছে নিয়ে যায়। রজতের বাড়ির অবস্থা ভালই। তার বাবা সরকারি অফিসার। রাজুদা আমাকে প্রথমে মদ খাওয়া শেখায়। আমি কিছুতে খাব না। কিন্তু রাজুদা বলে এর নাম বিয়ার। এতে খুব নেশা হয় না। সব বড় বড় লোকেরা সবাই মদ খায়। মদ খেলে শরীর ভাল থাকে।

একদিন ইস্কুলে না গিয়ে রাজুদার সঙ্গে আমি ও রজত একটা জায়গায় গিয়ে এক বোতল করে বিয়ার খেলাম। আমার মাথা দপদপ করছিল। রাজুদা বলল, চল, আজই তোকে কিছু টাকা রোজগার করে দি। এই টাকা নিয়ে তুই রজতের সঙ্গে গোয়ায় চলে যা। এই বলে রাজুদা আমাকে আর রজতকে দুটো পিস্তল দিয়ে বলল, এগুলো খেলনা পিস্তল। কিন্তু এতেই কাজ হবে। সিনেমায় যেমন দেখিস তেমনি করে ধরবি। তারপর—

তারপর রাজুদা আমাকে সব বলে দিল। বড়বাজারে একটা জুয়েলারি দোকানে খদ্দের সেজে ঢুকতে হবে। তারপর ম্যানেজারের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বলতে হবে যা আছে দিয়ে দাও, নইলে গুলি খাবে। আমার ঠিক শোলে ছবির কথা মনে পড়ল। খুব ভয় করছিল। তবে উত্তেজনাও অনুভব করছিলাম।

আমরা দোকানে ঢুকে তাই করলাম। রাজুদা একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ভয় দেখাতেই লোকটা সুড় সুড় করে কয়েক বান্ডিল নোট দিয়ে দিল। রাজুদা ব্যাগের ভেতর পুরে আমাদের নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। আমরা সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে গেলাম। ট্রেনে উঠে বসেছি। এমন সময় দেখি কী করে পুলিশ চলে এসেছে। আমাদের পুলিশ ধরল। হাজতে পুরে কী মার মারল। তারপর আদালত থেকে আমাদের তিন বছরের জন্য এই হোমে পাঠিয়েছে।'

কদিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল বড়লোকের একটি মেয়ে ক্লাস নাইনে ফেল করে আর পড়েনি। সে এক রাশিয়ান পর্যটকের মানিব্যাগ চুরি করে। সে পুলিশকে বলেছে, 'আমি একটা দুঃসাহসিক কিছু করতে চেয়েছিলাম যাতে আমার নাম খবরের কাগজে বেরোয়।'

এইভাবে চারটে ইস্কুলের ছেলে মিলে একটি গাড়ি হাইজ্যাক করেছিল। দুটি

ছেলে আর দুজন বন্ধুর পরামর্শে তাদের পাশের ফ্ল্যাটে ঢুকে মোটা টাকা চুরি করে। ওদের মধ্যে একটি ছেলের নাম দীপেন। যে ফ্ল্যাটে চুরি হয় সেটি দীপেনের পাশের ফ্ল্যাট। ওই ফ্ল্যাটে দীপেন নিয়মিত যেত সেজন্য সে জানত কোথায় কী আছে। তারা সবাই ধরা পড়ে এবং প্রত্যেককেই হোমে পাঠানো হয়।

একবার ক্লাস সেভেনের ছাত্র সুজনের বাবা ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে চিঠি পেলেন। সুজন নিয়মিত ক্লসে আসছে না। সুজনের মা-বাবা তো অবাক। সুজন তো রোজই ইস্কুলে বেরিয়ে যায়।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল প্রায় দিনই সুজন ইস্কুলে যায় না। জেরা করে জানা গেল কয়েকটি ইস্কুলের চার-পাঁচটি ছেলের একটি দল তৈরি হয়েছে। তারা ইস্কুলে না-গিয়ে সিনেমা দেখে। ময়দানে গাছতলায় বসে সিগারেট খায়। একদিন নাকি এক সাধুবাবার কাছে গিয়ে গাঁজাও খেয়েছিল।

এই বয়সে সব ছেলেমেয়েরই মনে হয় পড়াশোনা করার চেয়ে এই ধরনের কাজকর্ম করে বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু যারা এসবের মধ্যে ঢুকে যায় তাদের বাকি জীবনটা এইভাবেই কাটে। কেউ পাকা অপরাধী হয়ে যায়। যখন বুঝতে শেখে তখন খুব দেরি হয়ে গেছে।

অপরাধ করে কেউ বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারে না। পুলিশের জাল সব জায়গাতেই পাতা। ঠিক তারা ধরা পড়ে।

দুঃসাহসিক কিছু যদি করতে ইচ্ছা করে তাহলে খেলাধুলো, অ্যাডভেঞ্চারে যে কেউ যোগ দিতে পারে। বয়স্কাউট, এনসিসিতে যোগ দিলে অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেওয়ার অনেক সুবিধা আছে। ইয়ুথ হস্টেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া নানা ধরনের অ্যাডভেঞ্চার করে। বহু প্রতিষ্ঠান ছুটিতে নানা ধরনের শিবির করে। সৃজনশীল কাজ যেমন ছবি আঁকা, নাটক করা, নানা ধরনের খেলাধুলো শেখা, বাজনা বাজাতে শেখা—করার কত কী আছে।

কিন্তু নেতিবাচক বন্ধুদের সঙ্গে মিশলে তারা খারাপ দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটি সম্ভাবনাময় জীবন নষ্ট করে দেয়। নেতিবাচক বন্ধুরাই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

২০০৩ সালের এপ্রিল মাসের দক্ষিণদাঁড়ির মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অভিজিৎ খুন হয়েছিল কোনওও পেশাদার দুর্বৃত্তের হাতে নয় তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের হাতেই। নিচের খবরটি বেরিয়েছিল লবণহ্রদ সংবাদ পত্রিকায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী খুন বন্ধুদের হাতে

সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া অভিজিৎ ২৬ এপ্রিল খুন হল তারই সমবয়সী বন্ধুদের হাতে। কোনো ত্রিকোণ প্রেমের জেরে নয়, বন্ধুকে অপহরণ করে তার বাবার কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় অভিজিৎকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে তার বন্ধুরা।

১৭ দক্ষিণদাঁড়ির নারায়ণ পালের চার ছেলেমেয়ের মধ্যে অভিজিৎই সকলের

বড়। ঘটনার দিন সদ্য চিকেনপক্স থেকে ওঠা অভিজিৎ বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পরনে ছিল ঘরে পরার গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট। এ সময় তারই সমবয়সি ৬ কিশোর জোর জবরদস্তি করে তাকে একটি টাটা সাফারি গাড়ি করে তুলে নিয়ে যায় জাগুলিয়াতে। সেখানে গিয়ে তাকে বলে মোবাইল থেকে ফোন করে তার বাবার কাছ থেকে ২৮ হাজার টাকা মুক্তিপণ চাইতে। এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় অভিজিৎকে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলে আমডাঙার রাস্তার মোড়ে ফেলে পালায়। পরে ধরা পড়ার ভয়ে অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন আত্মহত্যা করে এবং দুজন পালাতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে। পুলিশ বাকি ২ অভিযুক্তকে খুঁজছে।

যারা একদিন ডাকসাইটে অপরাধী হয় তারা হঠাৎ একদিনেই হয় না। তারা প্রথমে ইস্কুলে যায় কিন্তু পড়াশোনা করে না। ইস্কুল থেকেই সিগারেট মদ গাঁজা ড্রাগ ধরে। তারা ক্লাসের ছেলেদের পিছনে লাগে। পরীক্ষায় টোকাটুকি করে। মাস্টারমশাইদের ভয় দেখায়। ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে তারা মাথায় ওঠে। তারপর একটু একটু করে তারা পাকা অপরাধী হয়ে ওঠে।

২০০৩ সালের ১৮ মে হিন্দুস্তান টাইমসে সজল বলে একটি কিশোর অপরাধীর খবর ছবি দিয়ে ছাপা হয়েছিল।

সজল বারুই বলে ওই ছেলেটির মুখ দেখে কি কেউ বুঝবে সে এখন এক পাকাপোক্ত অপরাধী?

বাবা-মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না বলে সে একদিন তার বাবা-মা ও দুভাই-বোনকে খুন করে। তার যাবজ্জীবন জেল হয়। কিন্তু ২০০১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সে পালিয়ে যায়। অসুস্থতার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

পালিয়ে গিয়ে সে অপরাধের জগতে মিশে যায়। বিয়ে করে সে মুম্বইতে চলে যায়। মুম্বই থেকে সে পুনায় নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন বাস করে। তারপর শেখ রাজু নাম নিয়ে সে কলকাতা চলে আসে। কলকাতা থেকে সে ঝাড়খণ্ড ও মেদিনীপুরের অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে ঝাড়খণ্ডে চলে যায়। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খোঁজে। অবশেষে সে ধরাও পড়েছে। কিন্তু তাতে কী হবে? বড়জোর তার জেল হবে। আর তো তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যাবে না। একবার যে খারাপ পথে চলে যায় সে আবার ভাল হতে পারে যদি সে সত্যি সত্যি ভাল হতে চায়।

ভদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা কেন ক্রিমিন্যাল হয়ে যায় তার কারণ খুঁজতে যাব না। সেটি গবেষণার বিষয়। কিন্তু একটা বড় কারণ সঙ্গদোষ ও মায়ের অত্যধিক আদর। ছোটবেলা থেকে শিশুকে বেচাল দেখলেই বাবামায়ের উচিত সতর্ক হওয়া ও তাকে বিশেষজ্ঞের কাছে কাউন্সেলিং-এর জন্য নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে আর করে কটা লোক?

সঙ্গদোষ-এর আর একটি কারণ। মানুষের প্রবণতা হচ্ছে খারাপ কাজের দিকে

সে চট করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। গঠনমূলক নানা কাজে যুব ও ছাত্রদের যত না আগ্রহ তার চেয়ে বেশি আগ্রহ বেআইনি কিছু করার দিকে। বিনাটিকিটে যেতে বলো একজন দুজন ছাড়া সবাই রাজি। লরি থামিয়ে পুজোর চাঁদা তুলতে বলো সবাইকে পাবে। হামলা ভাঙচুর বিক্ষোভ দেখাবার লোক জোগাড় করতে বেশি বেগ পেতে হয় না। কিন্তু অসুস্থ প্রতিবেশীর অসুখে সেবা করতে বলো, কাউকে পাবে না। আমি যত গঠনমূলক কাজ করতে গিয়েছি পাশে খুব একটা কাউকে পাইনি। রামকৃষ্ণ মিশনই নতুন সন্ন্যাসী পাচ্ছে না। আমি তো কোনও ছার। নেতিবাচক চিন্তাই এখন ভারতে রাজত্ব করছে। আর নেতিবাচক বন্ধুরাই বাকি বন্ধুদের নেতিবাচক করে তোলে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে অনেকে ক্রিমিন্যাল হয়ে যায়।

মানুষের দুটো সত্তা। পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব। এ দুটো সমান পরিমাণে আছে। পরিবেশ যার পক্ষে অনুকূল তার মধ্যে সেই বিষয়ের প্রভাব তত বেশি।

* মনে রাখবে crime does not pay অপরাধ করে কেউ লাভবান হতে পারে না।

* খারাপ ও ভাল দুধরনের লোকের সঙ্গে না মিশে উপায় নেই। কিন্তু খারাপ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করলে তাদের অপরাধের দায় তোমার ওপরেও এসে পড়বে। খারাপ লোকেরা তোমায় খারাপ পরামর্শ দেবে। তুমি বিভ্রান্ত হবে। খারাপ লোকদের ভাল পরামর্শও নেবার দরকার নেই। তুমি তোমার মতে চলবে।

খারাপ বন্ধুরা সব সময় শেখাবে মার্কশিটে জালিয়াতি করতে। সিগারেট খেতে। পরীক্ষায় টুকতে। বিপরীত লিঙ্গের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে সুযোগ বুঝে তাদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক তৈরি করতে।

না তোমাদের তথাকথিত গুডবয় হতে বলছি না। Innocent বা ন্যাকা হয়ে থাকতে বলব না। ভাল ছেলে বলতে আমি নিঃসঙ্গ রুগণ্, চোখে পুরু চশমা পরা লাজুক, গম্ভীর অথবা অহংকারী কাউকে বোঝাচ্ছি না। ভাল ছেলে বলতে আমি বোঝাচ্ছি, এক বাস্তববাদী ছেলে যে চালাকির দ্বারা নয়, রীতিমতো খেটে কোনও কাজ করতে চায়। যে পড়াশোনা শুধু মন দিয়ে পড়াশোনাই করে না যা পড়ছে সেটুকু বোঝে। সে বাজে বন্ধুর প্রভাবিত হয় না। যে কথায় বড় না-হয়ে কাজে বড়।

অসীম ধৈর্য, বিশ্লেষণমূলক চিন্তা ও সুপরিণত বুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রম ছাড়া জীবনে চটজলদি সাফল্য আসে না। বন্দুকের নল কখনই শক্তির উৎস হতে পারে না। শক্তির উৎস মানুষের সুপরিণত মস্তিষ্ক। যা স্বাভাবিক তাই-ন্যায্য। যা ন্যায্য তাই স্বাভাবিক।

নয়

তুমি ও তোমার ভাবমূর্তি

Be yourself নিজের মতো হও। একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সর্বদাই এক মৌলিক ব্যক্তিত্ব। অপরকে অনুকরণ করলে দুদিনেই ধরা পড়বে। স্বকীয়তা অবলম্বন কর Be original.

Give Yourself a chance
by Gordan Byron.

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই গ্রুপ ফোটো আছে। এই ফোটোর মধ্যে তোমার ফোটোটিকে কেমন লাগছে? তোমার কী মনে হয় এদের মধ্যে তুমি খুব স্মার্ট। সবার চেয়ে তোমায় দেখতে ভাল।

অথবা তোমার কী মনে হয় তুমি অন্যের চেয়ে খুব রোগা? অথবা তুমি বড্ড মোটা? তুমি বড় ঢ্যাঙা। অথবা তুমি বড় বেঁটে। তোমার মুখখানি গ্রুপের সবার চেয়ে বেশ ভাল। তোমার চুলের স্টাইলটিও ভাল।

যদি তোমার আলাদা কোনও ফোটো থাকে, সেটা একবার ভাল করে দ্যাখো। তুমি যেমন তেমনটাই কি ফোটোতে উঠেছে? না, তার চেয়ে ভাল অথবা খারাপ উঠেছে।

প্রত্যেকেই চায় তাকে যেমন দেখতেই হোক ফোটোতে তাকে যেন বেশ হাসিখুশি চটপটে দেখায়। ফোটো তোলার কারসাজিতে অনেকের ফোটো সত্যি সত্যি তার আসল চেহারার চেয়ে ভাল দেখায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে তুমি বাস্তবে যা নাও, তুমি তোমাকে সেই রকম দেখতে চাও। তুমি চাও তোমাকে ত্রুটিমুক্ত দেখাক। অন্তত লোকে তোমার ফোটো দেখে যাতে ভাবে ছেলেটি বা মেয়েটি দেখতে সুশ্রী, চালাক-চতুর। তুমি নিজেকে যেভাবে লোকের কাছে মেলে ধরতে চাও অথবা লোকের তোমার সম্পর্কে যে ধারণা সেটাই তোমার ভাবমূর্তি। প্রত্যেকেই চায় বাস্তবে সে যেরকম ঠিক সেরকমটি নয়, তার চেয়ে ভাল এক ভাবমূর্তি যেন তার গড়ে ওঠে।

অনেকে মিথ্যা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে গিয়ে অপদস্থ হয়। কারণ কোনও মানুষের প্রকৃত ভাবমূর্তি আর তৈরি করা ভাবমূর্তির মধ্যে তফাতটা লোকে কিছুদিন পরেই ধরে ফেলে।

ধরো যে ছেলেটি পড়াশোনা করে না, কুসঙ্গে মেশে, সিগারেট খায় ও অন্য

নেশা করে সে পোশাকে-আশাকে নিজেকে আধুনিক স্মার্ট ছেলে হিসাবে নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারে। কিন্তু লোকে যখন তার সম্পর্কে জেনে যায় তখন তার এই স্মার্ট ভাবমূর্তি তাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। লোকের কাছে বখাটে ছেলে বলে তার পরিচিতি হয়ে যায়। পরিচিত ও বন্ধুবান্ধব মহলে প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের একটা ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে যায়। বাইরের সাজগোজ দিয়ে বা কথাবার্তা দিয়ে তা ঢাকা যায় না। বরং একটা ছেলে বা মেয়ে তার নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনেক কথা বলে তার নিজের সম্পর্কে মিথ্যা ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে তার কথাকে তেমন আমল দেয় না। বরং তাকে 'গুলবাজ', 'বাচাল' এইসব বলে।

সুতরাং প্রকৃত ভাবমূর্তি তৈরি করতে গেলে তোমার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে ঠিক তোমার কল্পিত ভাবমূর্তির মতোই তৈরি করতে হবে।

একবার লোকের কাছে একটা ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গেলে আর সেটা বদলানো বড় কঠিন।

তুমি যে ভাবে তোমার ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চাও আর লোকের চোখে তোমার যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গেছে এ দুটির মধ্যে ফারাক থাকলে বড় মুশকিল হয়। ধরো তুমি সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। যে যা বলে তুমি শোন। যে যেমন তোমাকে করতে বলে করো। মুখের ওপর তুমি না বলো না। পড়াশোনার ক্ষতি করেও বন্ধুরা তাদের সঙ্গে কোথাও যেতে বললে যাও।

তুমি চাও—ভাল ছেলে হিসেবে তোমার ভাবমূর্তি গড়ে উঠুক। তুমি তো পড়াশোনাতে যথেষ্ট ভাল। ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠতে গড়ে ৭০ নম্বর করে পেয়েছ। কিন্তু তোমার পরিচিত মহলে তোমার ভাবমূর্তি হচ্ছে ছেলেটি বড় সরল। পড়াশোনায় ভাল হলে কী হবে ও খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

তাহলে তোমার নিজের ভাবমূর্তির সঙ্গে লোকের চোখে তোমার ভাবমূর্তির সঙ্গে মিলল না। সেজন্য পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বজায় রাখতে গেলে তোমায় শুধু ভাল হলেই হবে না— লোকের চোখে ভাল হবার জন্য খারাপদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বন্ধ করতে হবে।

কোনও সাধু যদি চোরেদের সঙ্গে মেশে তাহলে সে নিজে চোর না হলেও সাধারণের কাছে তার ভাবমূর্তি মলিন হবে। তোমাকে নিজে ভাল হলে চলবে না লোকের চোখে ভাল হতে হবে। ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবমূর্তি ভাল রাখা দরকার এই কারণে যে ভাবমূর্তি ইতিবাচক হলে মাস্টারমশাই বন্ধুবান্ধব ও বয়স্কদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পাওয়া যায়। পড়াশোনায় সবাই ভাল হতে পারে না। কিন্তু ভদ্র, বিনয়ী ও সিরিয়াস ও সৎ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারলে সে সবারই ভালবাসা পায়।

তোমার ব্যক্তিত্বও তোমার ভাবমূর্তি গড়ে ওঠার পিছনে সাহায্য করে।

এবার দেখা যাক ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটা কী? যদিও এর ওপর আমার আপনি ও আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব বলে একটি আলাদা বই আছে তবু এই বইতে সংক্ষেপে

আমি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটু বলছি। ব্যক্তিত্ব হল এককথায় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। কতগুলি দোষ-গুণের সমষ্টিতে গড়া একটি সম্পূর্ণ মানুষের ছবি। ফোটোতে আমরা বাইরের চেহারাটা দেখতে পাই কিন্তু ফোটোর মধ্যে সব সময় ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে না। অনেক সুন্দর দেখতে ছেলেমেয়ে ভেতরে ভেতরে নিষ্ঠুর, অসৎ, অবাধ্য হতে পারে। খুব খারাপ দেখতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বহু ভাল গুণ থাকতে পারে।

চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তুমি কী ধরনের রঙ পছন্দ করছ, কী ধরনের ডিজাইন পছন্দ করছ, কেমন প্রসাধন করেছ, তা দিয়ে তোমার রুচিবোধ ধরা যায়। ধরো, তুমি একটা চোঙা প্যান্ট পরলে, তার ওপর লাল টকটকে একটি টি শার্ট চাপালে, চোখে গগলস পরে নিলে, এতে ফুটে উঠবে তোমার রুচি খুব মোটা দাগের।

অনেক মেয়ে ক্লাস এইট নাইনে উঠেই উগ্র সাজগোজ শুরু করে দেয়।

মুখে চড়া পেন্ট করে। ঠোঁটে আচ্ছা করে লিপস্টিক ঘসে।

এইসব মেয়েদের দেখে পাড়ার বখাটে ছোকরারা টিজ করে। মেয়েরা একটু সাজগোজ করবেই। এটা তাদের সহজাত। কিন্তু রুচিসম্মতভাবে সাজগোজ করা যায়। হালকা প্রসাধনেও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা যায়। একগাদা সোনার গহনা বর্জন করা যায়।

এই রুচিবোধ কিছুটা গড়ে ওঠে সহজাত গুণ হিসাবে। বাকিটা প্রভাবিত হয় বাবা-মায়ের, বন্ধুবান্ধব, সমাজ ও টিভি সিনেমার প্রভাবে। তবে যাদের বুদ্ধির গভীরতা কম তারাই টিভি সিনেমার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।

কিন্তু মানুষের গোটা ব্যক্তিত্বের বেশির ভাগটাই গড়ে ওঠে তার ভেতরের আচার আচরণের মধ্য দিয়ে। এই আচার-আচরণের এক নাম সংস্কৃতি। তাহলে তোমার ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তোমার ব্যক্তিগত সাংস্কৃতিক আচরণ ও তোমার ব্যক্তিগত চরিত্রের নিট যোগফল। ব্যক্তিত্বের এই সব ছোট ছোট অংশগুলির নাম trait বা অনুষঙ্গ।

প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন বহু trait আছে। তার মধ্যে কতগুলি প্রধান trait হল :

বুদ্ধি : বুদ্ধির আবার অনেক ধাপ আছে। তুমি অঙ্ক বুঝতে পারো কি না সেটাও বুদ্ধি, আবার ভাল ছবি বুঝতে পারো কি না, একটা উপন্যাস পড়ে বোঝ কি না সেটাও বুদ্ধি। আবার পাগলা ষাঁড়ে তাড়া করলে কী করবে সেটাও বুদ্ধি।

তুমি নিজেকে কতখানি জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারো সেটাও তোমার ব্যক্তিত্ব। তোমার ভাবমূর্তি যাতে আর সবার চোখে অমলিন থাকে তার জন্য কী তুমি সচেতন, না লোকে যা বলে বলুক তোমার কিছু যায় আসে না?

ধরো, যে ছেলেগুলো পড়াশোনা করে না, বাইরের পাঁচটা বই পড়ে না, রোয়াকে বসে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়, সিগারেট খায়, তারা তাদের ভাবমূর্তি সম্পর্কে ততটা চিন্তিত নয়। লোকে যা বলে বলুক, আমার কিছু যায় আসে না। এমন ভাব। মস্তানরা ভাবে তাদের পেশীর জোর আছে। হাতে অস্ত্র আছে। তাদের পিছনে রাজনৈতিক নেতারা আছে। সাধারণ লোকগুলো ভেড়া। তারা এই পেশীশক্তিকে

ভয় পায়। ভেড়াদের ভয় দেখিয়ে তোলা আদায়ের মধ্যে বীরত্ব আছে। লোকে আমাকে ভয় পায় এটাই আমার ভাবমূর্তি।

আবার বহু ছেলেমেয়ে ভাবে কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করে ভাল রেজাল্ট করে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে একটা চাকরি যোগাড় করব। কোনওও গোলমালের মধ্যে যাব না। লোকে আমাকে ভালবাসুক। সাহায্য করুক। এটাই আমার ভাবমূর্তি।

আবেগের বেগ

আবেগ-প্রবণতা ব্যক্তিত্বের একটি অংশ। প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু আবেগ থাকে। কারণ আবেগ না থাকলে কোনও নতুন কাজে মানুষ ঝুঁকি নিতে পারে না। তুমি ব্যবসা করবে, ঝুঁকি নিতে হবে। আবেগ চাই। তুমি একটা ক্লাব গড়ে সমাজের কিছু কাজ করবে—আবেগ চাই। একজন খঞ্জ, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি ও একটি মৃতদেহ দেখে বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেছিলেন, এটি আবেগ। ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের উদ্দেশে বোমা ছুড়েছিলেন যদিও সেটি ভুল করে তার পিছনেও ছিল আবেগ। অনেক ছেলে পরীক্ষায় ফেল করে সংবিৎ ফিরে পেয়েছে। পরের বছর দ্বিগুণ উৎসাহে পড়াশোনা করে ভাল রেজাল্ট করেছে এটিও আবেগ।

কিন্তু তুমি যুক্তির ধার না ধরে যদি সমস্ত সিদ্ধান্ত আবেগতাড়িত হয়ে নাও তাহলে সেটা বাস্তবসম্মত হবে না। অতএব আবেগ না থাকলে মানুষ রোবোটের মত কলের পুতুলে পরিণত হয় একথা যেমন সত্যি তেমনি আবেগ সর্বস্বতাও ভাল নয়। তাই তোমার ব্যক্তিত্ব আবেগসর্বস্ব না আবেগ ও যুক্তির সংমিশ্রণ সেটাও দেখতে হবে।

ধরো, তুমি কবিতা লেখো। তোমার মধ্যে আবেগ আছে। তুমি কবিতা লিখে আনন্দ পাও। কবিতার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করো—এটি আবেগ।

কিন্তু কবিতা লিখে কবি হিসাবে নাম করতে গেলে তোমাকে কঠোর অনুশীলন করতে হবে। কবিতার ভাষাছন্দ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দেশ-বিদেশের কবির কবিতা পড়তে হবে। সর্বোপরি ইস্কুল কলেজের পড়াটা ভালভাবে শেষ করতে হবে। কবি জয় গোস্বামী মাধ্যমিক পাস করেননি। কিন্তু সেটা উদাহরণ নয় ব্যতিক্রম। মহাকবি মাইকেল ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রচুর মদ্যপান করতেন। অনেক ছোটখাটো কবি, এমনকী, ব্যর্থ কবিও মদ্যপান করেন। ভাবেন তাঁরাও মাইকেল ও শক্তি হয়ে উঠবেন। এরই নাম আবেগ-সর্বস্বতা। এই সঙ্গে বাস্তববুদ্ধি না থাকলে তাকে ব্যক্তিত্বের ঘাটতি বলেই মনে করব।

বুদ্ধদেব যে আবেগের বশে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, তার পিছনে এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। তা বৃহত্তর জন-কল্যাণের উদ্দেশ্য। তাঁর মধ্যে আবেগের সঙ্গে শুভবুদ্ধি মিলেছিল।

তোমার ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝব তোমার মধ্যে যে সব স্থায়ী বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যের থেকে আলাদা, সেটা।

উদাহরণ দেওয়া যাক।

১. শৌভিক মণ্ডল
বয়স ১৪।
পড়াশোনায় ভাল। ক্লাসে সেকেন্ড হয়।
একটু অন্তর্মুখী অর্থাৎ চাপা স্বভাবের।
ঝগড়াঝাঁটি করে না।
নিজের মধ্যে থাকতে ভালবাসে।
কথাবার্তা সপ্রতিভ।
আবেগপ্রবণ।
সামাজিক। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।
শিল্প অনুরাগী, ছবি আঁকে।
পাঠাভ্যাস আছে। বাইরের বইপত্র পড়ে।
উদারমনস্ক : কেউ সাহায্য চাইলে সাহায্য করে।
২. শর্মিলা নাগ।
পড়াশোনায় মাঝারি।
চপল স্বভাবের। কোনওও কিছু তলিয়ে দেখে না।
বহির্মুখী ও প্রগলভ। মিশুকে। স্মার্ট।
আবেগসর্বস্ব নয়, বাস্তববাদী।
তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব সবল না দুর্বল তা তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো।

দুর্বল ব্যক্তিত্ব

১. আমি রোজ ভাবি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠব কিন্তু ওঠা হয় না।
২. আমি স্যার ও ম্যাডামের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারি না। ভীষণ ভয় করে।
৩. পরীক্ষার আগের দিনগুলিতে আমার ভীষণ ভয় করে।
৪. বাবা-মা ভাইবোনেরা না-থাকলে আমি একা ঘরে থাকতে ভয় পাই।
৫. অপরিচিত কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভয় করে।
৬. সমবয়সি ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারি না।
৭. আমি চাঁদা চাইতে পারি না।
৮. কোনওও বিতর্কসভায় বলতে উঠলে একটা দুটো কথা বলার পর আমি খেই হারিয়ে ফেলি।
৯. একা ট্রেনে উঠে কোথাও যেতে গেলে মনে হয় আমি ভুল জায়গায় চলে যাব।
১০. বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিছুতেই ছাড়তে পারছি না।

ওপরের প্রতিটি বিবৃতি দুর্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। তোমার ক্ষেত্রে যদি অন্তত এর চারটিও সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে তোমার ব্যক্তিত্ব দুর্বল। তোমাকে সচেতন হতে হবে।

পরীক্ষা নম্বর ২

তুমি বহির্মুখী না অন্তর্মুখী?

১. আমার প্রিয় বন্ধু/বান্ধবী ছাড়া আমি সব বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারি না।

২. চুপচাপ থাকতে আমার খুব ভাল লাগে।

৩. আউটডোর গেমের চেয়ে ইনডোর গেম আমার পছন্দ।

৪. আমাকে গল্পের বই দিলে আমি আর কিছুই চাই না।

৫. আমি ক্লাসে হইচই করা একদম পছন্দ করি না।

৬. পড়া না করে ক্লাসে যেতে আমার খুব ভয় হয়।

৭. আমাকে সবাই শান্তশিষ্ট বলে। এটা শুনতে আমার ভালই লাগে।

৮. কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি করতে আমার ভাল লাগে।

৯. আমি কোনও পুজো কমিটি বা ক্লাবে সক্রিয় অংশ নিই না কারণ এতে পড়ার ক্ষতি হয়।

১০. আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব ভাবি।

এর মধ্যে ৫টির উত্তর হ্যাঁ হলে তুমি অন্তর্মুখী।

বহির্মুখীদের ব্যক্তিত্ব যাচাইর জন্য নিচের দশটি প্রশ্ন রয়েছে। এগুলি মিলিয়ে নাও।

১. আমার দলবেঁধে কিছু করতে ভাল লাগে। যেমন পিকনিক, সিনেমা দেখা।

২. বন্ধুদের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতে ভাল লাগে।

৩. আমি একা একা একদম থাকতে পারি না।

৪. আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবি না। যা হয় হবে।

৫. আমি প্রতিদিনই অন্তত একঘণ্টা টেলিফোন করি।

৬. আমাকে কেউ চিঠি লিখলে তাকে উত্তর দি। আমি নিজে থেকেও একে ওকে চিঠি লিখি।

৭. আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে বেড়াতে এলে আমার খুব আনন্দ হয়।

৮. সমবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যেচে আলাপ করি। / অথবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দি।

৯. ইস্কুলের যে কোনও আইটেমে আমি যোগ দিয়ে থাকি।

১০. আমি খুব দ্রুত হাঁটি। মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠ দেখলে দৌড়তে ইচ্ছা করে।

এর মধ্যে অন্তত ছয়টি হ্যাঁ হলে তুমি বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব।

অন্তর্মুখী বা আপনমনা ব্যক্তিত্বকে বহির্মুখী ব্যক্তিত্বে পরিণত করা যে যায় না তো নয়। তবে তার জন্য প্রচুর চেষ্টা থাকা দরকার। অনেক সময় পরিবেশের প্রভাবে একটি ছেলে চুপচাপ মনমরা হয়ে থাকতে পারে। সে ভাল পরিবেশ পেলে আবার হাসিখুশি হয়ে উঠতে পারে।

মনোবিদরা বলেন, প্রত্যেকের শরীরে কতগুলি বিশেষ gland বা গ্রন্থির ক্ষরণের ওপর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। কতগুলি গ্রন্থিকে বলে endrocline (এনড্রোক্লাইন) গ্ল্যান্ড। যাদের মধ্যে এই গ্ল্যান্ডের ক্ষরণ নিয়মিত নয় তাদের আচরণে একটু অস্বাভাবিক হয়। তাদের শরীরের চামড়া শুকনো খসখসে হয়। অনেকে বয়স অনুসারে বাড়ে না। এদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে ক্ষরণ নিয়মিত নয়। থাইরয়েড ঠিকমতো কাজ না করলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, ক্লান্তি লাগে। সব সময় ঘুম আসে। খিদে হয় না। এমন হলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

তবে ব্যক্তিত্বের বহু ত্রুটি তুমি ইচ্ছা করলে নিজেই সংশোধন করে নিতে পারো। সামাজিকতা, সপ্রতিভতা, কোনও সমস্যায় পড়লে বিচলিত না হয়ে ভালমন্দ নিজে নিজে ভাবা। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজে কোনও ঘটনা বিশ্লেষণ করা, ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া। মনের জোর বাড়িয়ে কুঅভ্যাস ত্যাগ করা এই সমস্ত গুণগুলি তুমি চেষ্টা করলেই আয়ত্ত করতে পারো।

ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক হল চরিত্র। চরিত্র মানে কতগুলি বিশেষ মানসিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলি ভাল ও খারাপ দুই হতে পারে। এই প্রবৃত্তিগুলিও বদলানো যায়। তবে তার জন্য প্রচণ্ড খাটতে হয়।

সুপ্রবৃত্তিগুলি হল, মূল্যবোধ, সততা, তেজস্বীতা, ন্যায়পরায়ণতা, ঔদার্য, কৃতজ্ঞতা, সংযম। কুপ্রবৃত্তিগুলি হল : অসাধুতা, ভীরুতা, পক্ষপাতিত্ব, সংকীর্ণতা, অকৃতজ্ঞতা, অসংযম।

ঔদার্য কাকে বলে? আলেকজান্ডার বন্দি পুরুকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলেন, এটাই ঔদার্য। কোনওও বন্ধু তোমার মনে আঘাত দিয়েছে। তুমি প্রতিশোধ না নিয়ে, তাকে ক্ষমা করলে এটা তোমার ঔদার্য।

কৃতজ্ঞতা : উপকারীর উপকার না-ভোলা এবং প্রতিদানে তার উপকার করা এটি কৃতজ্ঞতা। তোমাকে যে নানাভাবে সাহায্য করেছে তার সাহায্যের কথা স্মরণে রেখে তোমার যখন সময় ও সুযোগ হবে তখন তুমি তাঁকে আবার তোমার সাধ্যমতো সাহায্য করলে সেটাই হবে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

সংযম : সংযম হল কোনও ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে নিজেকে সংযত রাখা। অনেক ছেলেমেয়ে বাড়িতে খুব রাগারাগি করে। হয়তো রাগ করে না খেয়েই থাকল অথবা জিনিসপত্র ভাঙচুর করল। বন্ধু-বান্ধবের প্রলোভনে খারাপ কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এই সব প্রলোভন ও প্ররোচনায় পা না দেবার নাম সংযম। খাওয়া-দাওয়া ঘুম এই দুই ব্যাপারে সংযম দেখাতে হয়। খাবার দেখলে লোভ হয়। কিন্তু যতটুকু পেটে ধরে তার বেশি খেলেই তুমি মোটা হয়ে যাবে। যা-তা খেলে হজম করতে পারবে না। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

ঘুমের ব্যাপারে বেশি রকম অসংযম ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা নায়। যে কোনও উত্তেজনা প্রশমিত করাই সংযম। কাম ও ক্রোধ এ দুটি মানুষের চিরশত্রু। তারা বার বার প্ররোচিত করে। প্ররোচনায় পা না দেবার সংযম। আহার নিদ্রা ও ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করা সংযম। যারা মাত্রাতিরিক্ত স্বমেহন করে বা সমকামী হয়ে ওঠে তারা অসংযমী।

যখন খুব ছোট ছিলে তোমার মা তোমায় কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতেন আর গান গাইতেন খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গি এলো দেশে।

ছোটবেলায় বেশি ঘুমের দরকার। একবছর দেড়বছর বয়স হয়ে গেলে খোকা যতক্ষণ জেগে থাকবে দুষ্টুমি করবে। তাই খোকাকে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারলে পাড়া যেমন জুড়বে, মাও তেমনি একটু স্বস্তি পাবে।

এ যুগের কুম্ভকর্ণ

কিন্তু অনেক ছেলেমেয়ে চিরখোকা থেকে যায়। তাদের বয়স বাড়ে কিন্তু ঘুম কমে না। আমি সকালে দুএক জন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখি সকাল আটটা পর্যন্ত তাদের খোকারা ঘুমচ্ছে। অন্যদের কী বলব। আমার ছেলেও সকাল আটটার আগে ওঠে না। আমেরিকাতে গিয়ে দেখেছি সেখানে ভারতীয়রা শনি রবি হলেই সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমোয়।

নবজাতক শিশু দিনে ২০ ঘণ্টা ঘুমোয়। কিন্তু বারো বছর বয়স পর্যন্ত ১০ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম দরকার। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা ঘুমের সময়ও কমিয়ে আনা যায়। ইন্দিরা গান্ধীর আমাকে বলেছিলেন তিনি রাতে দুতিন ঘণ্টার বেশি ঘুমোতেন না। সাধারণ মানুষের পক্ষে এত রাত জাগার দরকার নেই। কিন্তু একজন ছাত্রকে ঘুমোতেই হবে। বারোটা থেকে ভোর ছটা অথবা এগারোটা থেকে পাঁচটা ঘুমোবার প্রশস্ত সময়। তবে একবার ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু হলে ঘুমিয়ে পড়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

এমনিতেই আমরা আমাদের জীবনের তিনভাগের দুভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটাই। অর্থাৎ ৭৫ বছর যদি কেউ বাঁচে তাহলে ২৫ বছর আমরা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

সুতরাং অতিরিক্ত ঘুম আমাদের দেহে শুধু জড়তাই আনে না, আমাদের প্রয়োজনীয় সময় নষ্ট করে দেয়। মনে রাখো, প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে ঘুম কেটে সময় বার করতে পারলে মাসে ৩০ ঘণ্টা অর্থাৎ বছরে ৩৬০ ঘণ্টা সময় পাবে। অর্থাৎ প্রতিবছর ১৫ দিন। এই ৩৬০ ঘণ্টায় তুমি বছরে ৭০টি নতুন বই পড়তে পারো। ১২০টার মতো পছন্দসই গান শুনতে পারো।

মূল্যবোধের সন্ধানে

মূল্যবোধ : মূল্যবোধ কথাটা বড়দের কাছে খুব শুনতে পাবে। নেতারা তাঁদের বক্তৃতায় প্রায়ই বলেন মূল্যবোধ নেই। মূল্যবোধ নেই। মূল্যবোধ ব্যাপারটা কী কেউ তা ব্যাখ্যা করেন না।

মূল্যবোধ হচ্ছে কোনও বস্তুর কত দাম সে সম্পর্কে জ্ঞান। বাজারে আলু পটল বা গহনার দোকানে সোনার ভরি কত তা গেলেই জানা যায়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে টিভি, ফ্যান, ফ্রিজের দাম দেওয়া থাকে। কিন্তু সততা, প্রতিশ্রুতি পালন, কৃতজ্ঞতা, মানবতা এগুলোর দাম তো কোথাও লেখা থাকে না।

এগুলোর দাম কত তা এক একজনের কাছে এক এক রকম ধারণা।

আমাকে একবার এক পড়ন্ত জমিদারবাবু তাঁর একটি হিরে বেচতে পাঠিয়েছিলেন জহুরিদের কাছে। তা দেখলাম হিরেটা দেখে এক একজন এক একরকম দর দিলেন। কোনও নির্দিষ্ট দাম ওটার নেই।

তেমনি সাধুর কাছে সততার দাম সবচেয়ে বেশি। কিন্তু চোরের কাছে সততার কোনও দাম নেই।

ভক্ত প্রহ্লাদের কাছে ঈশ্বরের দাম অমূল্য। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর কাছে ঈশ্বরের কোনও দাম নেই। একজন প্রকৃত ধার্মিকের কাছে সব ধর্মই সমান। রামকৃষ্ণ বলতেন যত মত তত পথ। কিন্তু একজন মৌলবাদীর কাছে অন্য ধর্মের লোক মানেই কাফের। তাদের হয় আমার ধর্মে আনতে হবে, না-হয় তাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। দেশপ্রেমিক দেশের জন্য হাসতে হাসতে জীবন দেন। মাস্টারদা সূর্য সেন, বাঘা যতীন, মাতঙ্গিনী হাজরা, ভগৎ সিং, বিনয়-বাদল-দীনেশের মত শত শত ছেলেমেয়ের কাছে জীবন তুচ্ছ, দেশ বড়। কিন্তু সেই দেশকে বিদেশিদের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে কত গুপ্তচর। এদের কাছে দেশপ্রেমের দাম নেই। টাকার দাম সবচেয়ে বেশি।

আজ দেখো ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একদল লোক হাতে অস্ত্র পেয়ে নির্বিচারে শিশু-নারী বৃদ্ধকে হত্যা করছে। এদের কাছে শান্তি ও মানবতার কোনও মূল্য নেই। এদের কাছে শাসনক্ষমতা দখল করা অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই বড়।

তাহলে দেখছ চিরাচরিত যে সব গুণ এতদিন মর্যাদা পেয়ে এসেছিল আজ একদল মানুষ বলছে ওসবের কোনও দাম নেই।

সততা, আরে ছোঃ! বোকারাই সৎ হয়। যেভাবে পারিস কামিয়ে নে। সবাই চুরি করছে তুই করবি না কেন?

গায়ের জোর? হ্যাঁরে মাইট ইজ রাইট। বলং বলং বাহুবলং। গায়ের জোর দেখা। পেশীশক্তিকে সবাই ভয় করে। দুনিয়া টাকা আর শক্তির বশ। গায়ের জোর দেখালেই টাকা এমনিতেই এসে যাবে। নীতি? আরে দূর-দূর। নীতি আবার কী! যখন যেমন তখন তেমন!

ভগবান?

ভগবান টগোবান নেই। তাহলে পৃথিবীতে গরিব মানুষ এত কষ্ট পায়! গরিবরাই তো বেশি ভগবানকে ডাকে। আমরা যুক্তিবাদী! ওসব মানি না। তাতে আমাদের কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে।

ওপরে যে সব কথা লিখলাম তা সেই সব লোকদের কথা, যাদের মূল্যবোধ আলাদা রকম। তারা নিজেরাই তাদের মূল্যবোধ ঠিক করে নিয়েছে। আর এই দুনিয়ার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সেটা বেশ মিলেও যায়।

এই দুনিয়ায় একটু ধুরন্ধর আর ধান্ধাবাজ হতে পারলে অল্প পরিশ্রম করে অথবা একদম পরিশ্রম না-করে অনেক টাকার মালিক হওয়া যায়। টাকা দিয়ে তুমি নানা আরামের উপকরণ কিনতে পারো। আবার এই সব আরামের উপকরণ

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করেও কেনা যায়।

তোমার বাবা একটা বাড়ি করেছেন। তার জন্য সারাজীবন ধরে তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। তিনি একটু একটু করে টাকা জমিয়েছেন। বাকিটা হয়তো ধার করেছেন।

আর তোমাদেরই প্রতিবেশী বেশি বেতন পান না। সাধারণ চাকরি করেন। কিন্তু প্রচুর ঘুষ পান। সেই টাকায় তোমার বাবার চেয়েও বড় বাড়ি তৈরি করেছেন।

তুমি মধ্যবিত্তের ছেলে, কত কষ্ট করে পড়াশোনা করছ। আর তোমারই বন্ধুবান্ধব চারপাঁচটা টিউটর রেখেছে। গাড়ি চড়ে ইস্কুলে যাচ্ছে।

তোমার কি হিংসা হয়?

যদি হয় তাহলে বলবে এই হিংসার মনোভাব ত্যাগ করো। মনে রেখে দেবে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সৎপথে থেকে যে আয় করতে পারবে সেই আয়ই তোমার অর্জিত আয়। এটাই তোমার প্রাপ্য। অন্যভাবে যারা আয় করে তারা কখনও মনে মনে সুখ পায় না। কেন বল তো?

মনের ভেতর মন

আগেই বলেছি আমাদের প্রত্যেকের মনের ভেতর থাকে ইদ, ইগো আর অল্টার ইগো। ইদ হল সহজাত প্রবৃত্তি। এর মধ্যে নানা কুপ্রবৃত্তিও থাকে।

মানুষ ভগবান নয়। তার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা সব থাকে। ইদ এই প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করে আত্মতৃপ্তি পেতে চায়।

সে কোনওও নীতি মানে না। ইদের চিন্তাধারা এলোমেলো। তাকে একজায়গায় করে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে চরিতার্থ করায় ইগো। ধরো, ইদের মধ্যে আছে লোভ। দোকানে রসগোল্লা দেখলেই তার খেতে ইচ্ছা করবে। যাদের মধ্যে ইদের প্রভাব বেশি সে চুরি করে রসগোল্লা খাবে। ইদকে দাবিয়ে রেখে ইগো শক্তিশালী হলে ইগো বলবে উপার্জন করো। তারপর সেই টাকায় রসগোল্লা কেনো। অথবা বাবামায়ের কাছে টাকা চাও।

সবার ওপরে আছে সুপার ইগো। সে হচ্ছে বিবেক। সে বলবে, বাপু হে লোভ সংবরণ করো। সংযত হও। টাকা থাকলেই যে পেট পুরে রসগোল্লা খেতে হবে তার মানে নেই। কোনও কিছুই অতিরিক্ত ভাল নয়। যাদের মধ্যে সুপার ইগো প্রবল তারাই সততা, নীতিবোধ, মানবিকতাকে মূল্য দেয়। হিটলারের কাছে মানবিকতার কোনও মূল্য ছিল না। তিনি পরিচালিত হতেন ইদের দ্বারা। গান্ধী পরিচালিত হয়েছিলেন সুপার ইগোর দ্বারা।

তোমার মধ্যে কোন শক্তিটা বেশি? সুপার ইগো শক্তিকে তুমি শক্তিশালী করতে পারো এজন্য সব সময় প্রার্থনা করতে হবে। যে প্রার্থনার কথা আগেই বলেছি।

তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও? খুব বড়লোক একজন? তা হও না। ধনী হওয়া খারাপ ইচ্ছা নয়। ধনী হলে তুমি অনেককে সাহায্য করতে পারো। বিল গেটস এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী। কত কোটি কোটি টাকা তিনি মানুষের উপকারে

ব্যয় করছেন। কিন্তু তিনি ঘুষ খেয়ে, কালোবাজারি করে ভেজাল দিয়ে ধনী হননি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, নিজের প্রতিভা দিয়ে ধনী হয়েছেন।

তোমরা প্রতিজ্ঞা করো : আমি খেটে বড়লোক হব। কিন্তু বড়লোক হয়ে গরিব মানুষদের ভুলব না। বিল গেটস ভোলেননি।

শুধু অসাধু ধনীরাই নন, অসাধু ছোটখাটো সচ্ছল ব্যক্তিও মনের ভেতরে অশান্তি আর উদ্বেগে ভোগেন। কারণ একটা সময় ইদ, ইগো আর অলটার ইগোর মধ্যে মনের ভেতরেই লড়াই চলে। তোমরা শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ নাটকের গল্প পড়েছ। ম্যাকবেথ আর তাঁর স্ত্রী তাঁদের শুভানুধ্যায়ী রাজা ডানকানকে হত্যা করে রাজা হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেকের যন্ত্রণায় দুজনেই পাগল হয়ে যান। আমার এক পরিচিত সরকারি অফিসারের বাড়ি থেকে দুকোটি টাকা নগদ পাওয়া গেল। সব টাকা বাজেয়াপ্ত হল। তিনি গ্রেফতার হলেন। তাহলে তাঁর কী শাস্তি হবে জানি না। কিন্তু আমি শুনেছি তত টাকা ঘুষ নিয়ে বিলাস-ব্যসনের মধ্যে থেকেও তিনি রাতে ঘুমোতে পারতেন না। অথচ তিনি যখন একজন ছোট অফিসার ছিলেন। অল্প বেতন পেতেন তখন তাঁর সঙ্গে আমি প্রোগ্রাম করতে যেতাম। কি সুন্দর হাসিখুশি এবং সুখী মানুষ ছিলেন তিনি।

প্রশ্ন। তাহলে কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা করব না?

উত্তর। নিশ্চয়ই করবে। তবে বড় হবার ইচ্ছে না থাকলে কেউ বড় হতে পারে না। তবে বড় হবে নিজে পরিশ্রম করে।

প্রশ্ন। শুধুমাত্র সৎপথে থেকে কি বড় হওয়া যায়?

উত্তর। নিশ্চয়ই যায়। অনেক উদাহরণ দিতে পারি। তবে আমি তাকেই বড় বলব যে সৎভাবে নিজের সমস্ত শক্তিকে তার ইচ্ছাপূরণের কাজে লাগিয়েছে। তবে এক কাপে যতটা জল ধরে তার বেশি ধরবে না। তোমার নিজের ধারণ ক্ষমতা কতখানি তা আগে জানো। সবাই সব কাজ পারে না। এজন্য পারে না যে প্রত্যেকেরই একটা সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে। একটা মোটরগাড়ি যত জোরে যাবে একটা প্লেন তার চেয়েও বেশি জোরে যাবে। তুমি মোটর গাড়ি না প্লেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

তুমি নিজে গাড়ি না চালালেও অনেক সময় ড্রাইভারের পাশে বসে যদি লক্ষ্য করো, দেখবে, কোনওও ড্রাইভার রাস্তা ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও স্পিড তুলছে না। হয় ভয় পাচ্ছে বেশি জোরে চালাতে, নয়তো দরকার মনে করছে না। কিন্তু গাড়ি তো স্বচ্ছন্দে ৮০ কিলোমিটার স্পিডে যেতে পারে। তুমি যদি ৫০ কিলোমিটারে চালাও সেটা তোমার ব্যাপার। গাড়ির দোষ নয়।

তেমনি তোমার সর্বোচ্চ গতি কত হতে পারে পরীক্ষা করে দ্যাখো। দিনে মন দিয়ে ১০ ঘণ্টা করে পড়ে দেখো যে তোমার রেজাল্ট ভাল হচ্ছে কি না। যদি না হয় তাহলে বুঝবে যে এটাই তোমার সর্বোচ্চ স্পিড।

আবার এমনও হতে পারে যে বিষয়ের ওপর তোমার ভাল দখল সেই বিষয়টা নিয়ে পড়লে পরবর্তীকালে তোমার রেজাল্ট ভাল হয়ে গেল।

দশ

উৎসাহ-উদ্দীপনা

ওঠো, জাগো—যতক্ষণ না তোমার লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছ, থেমো না।

উপনিষদ

যে সব ছেলেমেয়ে সব কিছুর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায় না তাদের জীবনে দাঁড়ানো খুব কঠিন। উৎসাহ হল কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত হওয়া। অর্থাৎ সব কাজে আগ্রহ প্রকাশ করা।

আমার ছোটবেলায় সব ধরনের কাজে আগ্রহ ছিল। যেমন গল্পের বই পড়তে ভালবাসতাম। একটা গল্পের বই আনতে চার-পাঁচ মাইল হেঁটে যেতাম, তেমনি নাটক করতে, আড্ডা দিতে, হাতের লেখা ম্যাগাজিন বার করতে, সমাজ সেবার জন্য ঝোপঝাড় কাটতে, পিকনিক করতে সমান উৎসাহ পেতাম। ভাল খেলতে পারতাম না। কিন্তু টিমের সঙ্গে ভিন গাঁয়ে যেতাম, টুর্নামেন্ট চালাতাম। গল্প কবিতা লিখতাম আবার পড়াশোনা করতাম। আমি খুব ভাল ছাত্র ছিলাম না আবার খুব খারাপ ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু সব ব্যাপারে ছোটবেলা থেকে উৎসাহ থাকার জন্য ভাল ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে তাল দিয়ে আমার পছন্দমতো সাংবাদিকতার চাকরি করে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিলাম। এই যদি ছোটবেলা থেকে নাক সিটঁকোতাম, এটা ভাল লাগে না ওটা ভাল লাগে না তাহলে খুঁতখুতে হয়ে উঠতাম। কিছুই আর পছন্দ হত না।

ইস্কুল জীবনে সব কিছুতেই তোমাকে উৎসাহী হতে হবে। আর কোনও ব্যাপারে উৎসাহী হলে সে কাজটা উদ্দীপনার সঙ্গে করতে হবে। উদ্দীপনা মানে যে কাজটা করবে সেটা আনন্দ করে করবে। মনে করবে এটাই যেন আমার চরম লক্ষ্য।

আমি যখন বাজারে ডিম বিক্রি করতাম, মেলায় পাঁপর ভাজতাম তখন ভাবতাম আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডিম বিক্রেতা। আমিই একমাত্র ভাল করে পাঁপর ভাজা জানি। আমি আমার ঠাকুর্দার নামে একটি ফুটবলের একটি চ্যালেঞ্জ কাপ খেলাতাম। আমি এত সিরিয়াস ছিলাম যে মনে করতাম এটা বুঝি আই এফ এ শিল্ড।

আমি যখন গল্প-কবিতা লিখতাম তখন আমি নিজেকে একজন পাকা লেখক বলে মনে করতাম, ছাপা হোক বা না হোক সে সব লেখাপত্র পত্রিকায় পাঠাতাম।

আমি যেবার স্কুল ফাইন্যাল পাস করলাম তার মধ্যেই কলকাতার নামী কাগজে আমার লেখা বেরিয়েছে। প্রকাশিত কবিতায় খাতা ভরে উঠেছে।

জীবনকে ভালবাসতাম বলেই আমার দারিদ্র্যকে দারিদ্র্য বলে মনে হয়নি। কখনও মনে হীনমন্যতা আসেনি যে আমি গরিব। কারণ আমি বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশতাম। তাদের সঙ্গে গল্প করতাম। সাহিত্যসভায় যেতাম। দেশ দেখব বলে কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় (এখন এগারো ক্লাস) আমি সারা উত্তর ভারত ঘুরে এসেছি। মনে মনে আত্মবিশ্বাস থাকলেও কিন্তু কখনও কারও কাছে এমন ভাব দেখাতাম না যে আমি সব জানি, বরং বড়দের কাছ থেকে তাঁদের জ্ঞানের অতি সামান্য অংশ নিতে পারলে ধন্য হতাম।

আমার জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা আজ এই বয়সেও শিশুর মতো।

বড়রা ছোটদের ভালবাসে তাদের পোশাক, চেহারা বা বড়লোক বলে নয়। ভালবাসে তাদের বিনয়, জানার ইচ্ছা আর বড়দের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা দেখে।

আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তার মধ্যেই আমার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। যেমন ধরো, তখনকার মন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। তরুণকান্তি ঘোষ, বিধায়ক কানাইলাল দাস, ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এশিয়া পত্রিকার সম্পাদক বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, সংহতি পত্রিকার সম্পাদক সুরেন নিয়োগী। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী অমলেন্দু দাশগুপ্ত, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। সাহিত্যিক ইন্দিরা দেবী, কবি রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। লেখক কুমারেশ ঘোষ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ গান্ধীবাদী লেখক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক নিঃশ্বাসে এই সব নাম মনে পড়ে গেল।

ভেবে নাও আমি এক গ্রামের ছেলে। তাও গরিব ঘরের ছেলে। এঁদের সকলের সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাল ছাত্রও নই। সাধারণই বলতে পারো। ক্লাসে সেকেন্ড থেকে ফোর্থের মধ্যে হতাম। কখনও ফার্স্ট হইনি।

আমাকে বড়রা সবাই ভালবাসতেন আমার ব্যবহারের জন্য। আমি বড়দের প্রণাম করতাম। তাঁদের সঙ্গে সবিনয়ে কথা বলতাম। যাকে বলে অসম্মান করা তা কখনও করতাম না। আমার মতামত দিতাম। আমি খুব বেশি কথা বলতাম না। আবার চুপচাপও থাকতাম না। আর তাঁদের সবাইকে সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে থাকতাম।

তাঁরাও আমাকে সবাই সাহায্য করেছেন।

মনে আছে ১৯৫৫ সালে তখন আমি স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছি। মালদহে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মেলন হবে। খুব ঘটা করে সম্মেলন হত সে সময়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যাবেন। সে সময়কার কংগ্রেস সভাপতি ইউ.এন. থেবর আসবেন। আমি ঠিক করলাম আমিও যাব। কিন্তু আমার পকেটে পয়সা নেই। চলে এলাম কলকাতা। আমার চেনা গ্রামের এক প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী হরেনদা, আমার টিকিটটা কেটে দিলেন। কিন্তু ট্রেনে খাবার মতো পয়সা নেই। ট্রেনে আলাপ হয়ে গেল এক বিধায়ক নিশাপতি মাঝির সঙ্গে। আমাকে তাঁর এত পছন্দ হল যে তিনি আমাকে সঙ্গে রাখলেন ও যাতায়াতের পথে আমায় খাওয়ালেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয় স্কুলে যেবার ফাইন্যাল

পরীক্ষা দিলাম সে বছরেই। তিনি আমার বাড়ির অবস্থার কথা জেনে আমাকে কলেজে পড়ার জন্য ত্রিশ টাকা করে মাসিক বৃত্তি দিয়েছিলেন। কলেজের পড়া শেষ করার পর তিনিই আমায় তাঁর কাগজ যুগান্তর পত্রিকায় চাকরি দেন। আমি যাতে রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে বিনা খরচে কলেজে পড়তে পারি সেজন্য প্রফুল্ল-চন্দ্র সেন মশাই তৎপর হয়েছিলেন। যাই হোক, সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। আর গল্প লিখে ক্লাস টেনে পড়ার সময় আমার লেখক জীবনের প্রথম পারিশ্রমিক আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন বিনোদবিহারী চক্রবর্তী। তাঁর ছেলে বিভাস চক্রবর্তী এখন নাটক করে খুব নাম করেছেন। আমার কথা লেখার জন্য এই বই নয়। আমি শুধু প্রাসঙ্গিক বলেই আমার কথা বললাম।

আমাকে যদি আবার জন্ম নিতে হয় এবং আমাকে যদি বিধাতাপুরুষ বলেন, তুমি কোথায় জন্ম নিতে চাও, গ্রামে না শহরে? বড়লোকের ঘরে না মধ্যবিত্তের ঘরে? আমি বলব গ্রামে মধ্যবিত্ত বাবামায়ের ঘরে। আমি তিল তিল করে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠতে চাই। আমি যেটুকু যা করেছি তা আমার কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জন করেছি।

আমি তাই তোমাদের বলি, তোমরাও অর্জন করো। অর্জন করো মানুষের ভালবাসা, স্নেহ, মমতা আর সহযোগিতা। আর তার বিনিময়ে দাও তোমার কঠোর শ্রম, আন্তরিকতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের উৎসাহ উপচে পড়ুক। ভালবাসো জীবনকে। ভালবাসো, বাবা-মা-ভাইবোন, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও দেশকে।

কেমন লাগছে, ভাল তো?

প্রতিটি কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করাটা সুস্থ জীবনের লক্ষণ। এর অর্থ হচ্ছে তুমি কাজটাকে এনজয় করছ অর্থাৎ উপভোগ করছ। কাজটা তোমার ভাল লাগছে।

কিন্তু কাজটা ভাল লাগছে বলেই শুধু সেই কাজটা নিয়ে পড়ে থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই। যতক্ষণ যে কাজটা করবে ততক্ষণই সে কাজটা উৎসাহের সঙ্গে করবে। কোনও কাজকে বোঝা মনে করবে না। এটা তখনই সম্ভব যদি তুমি মনে করো এই কাজটা করলে তোমার ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি হবে।

আমি যে কাজটা করি সে কাজটাকে বোঝা মনে করি না। মনে করি এতে আমিই উপকৃত হচ্ছি। তা সে সরস্বতী পুজো করাই হোক বা ক্যারম খেলাই হোক। সরস্বতী পুজোর মধ্য দিয়ে তোমার সাংগঠনিক শক্তি, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা বিকশিত হয়। একটা মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা কিন্তু যথেষ্ট সৃজনশীল কাজ। চাঁদা তোলা, ভিড় ম্যানেজ করা, হিসাব রাখা, প্রতিমা বাছাই করা সব কিছু কাজের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক ক্ষমতা বাড়ে। এমনি ক্যারম খেলার মধ্যেও নৈপুণ্য ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। দাবা খেলাতে প্রকাশ পায় বুদ্ধি আর বিচার ক্ষমতা ও তাস খেলার মধ্য দিয়ে তোমার ঝটিতি পরিস্থিতি বোঝার মতো মানসিক ক্ষমতা জন্মায়।

আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো মস্তিষ্ককে যত চালনা করবে মস্তিষ্কের ক্ষমতা তত বাড়বে। আর মস্তিষ্ককে যত অলস রাখবে ততই সে শয়তানের কারখানা হয়ে উঠবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাপারেও তাই। কোনও ব্যায়াম না করে বসে খাও আর ঘুমোও' দেখবে মোটা হয়ে যাচ্ছ। কাজ করার ইচ্ছেটাও চলে যাচ্ছ। সব সময় ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। শেষমেশ তোমার কর্মক্ষমতাও চলে যাচ্ছে। অনেক ছেলেমেয়ে ছবি আঁকা শেখে, আবৃত্তি শেখে, কম্পিউটর শেখে আবার খেলাধুলা করে, সাঁতার শেখে। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলেন, ছেলেমেয়েদের সর্ববিদ্যাবিশারদ করে কী হবে? আরে বাপু ডাক্তারি পড়বি তো ছবি আঁকা শিখে কী হবে? আমি বলব সৃজনশীল বিভিন্ন কাজের মধ্যে যুক্ত থাকাটাই এখানে বড় কথা। শিল্পী হতেই হবে তার মানে নেই।

তুমি কেমন দুঃসাহসী?

দুধরনের দুঃসাহসিক কাজ আছে। গাড়ি হাইজ্যাক করে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়াটা যেমন দুঃসাহসিক কাজ তেমনি পাহাড়ে ওঠা কিংবা সাইকেলে করে ভারত পরিক্রমাও দুঃসাহসিক, পার্কের এক কোণে বসে গাঁজা খাওয়াটা যেমন দুঃসাহসিক তেমনি নদীতে সাঁতার কাটাটাও দুঃসাহসিক। শেষেরটা হল ইতিবাচক দুঃসাহস। আর প্রথমটা হল নেতিবাচক দুঃসাহস।

আমি যখন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পাশ দিয়ে যাই দেখি কত ছোট ছেলে বক্সিং প্র্যাকটিস করছে। হেদো ও কলেজ স্কোয়ারে দেখি কত ছোট ছোট ছেলে সাঁতার কাটছে আবার ময়দানে কত ছেলেমেয়ে নানা ধরনের খেলা শিখছে। এক একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় শত শত ছেলেমেয়ে অংশ নিচ্ছে। এদের দেখে মনে হয় এরা বড় হয়ে জীবনযুদ্ধে ঠিকই জিততে পারবে। কারণ, এদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে। কিন্তু আবার যখন দেখি পাড়ার চায়ের দোকানে, রোয়াকে একটু বড় ছেলেরা বসে নিছক আড্ডা দিচ্ছে আর সিগারেট টানছে তখন দেখে দুঃখ হয়। কোনও অ্যাকশন বা সক্রিয়তা তাদের অনুপ্রাণিত করে না। তারা নিজেরাই নিজেদের শেষ করছে।

দেখবে আর পাঁচটা কাজে তাদের উৎসাহ কম। উদ্দীপনাও নেই। নেতিবাচক চিন্তা যত করবে তত উৎসাহ কমতে শুরু করবে।

প্রশ্ন। নেতিবাচক চিন্তা কী?

উত্তর। নেতিবাচক চিন্তা হল সব সময় ধরে নেওয়া এটা হয় না। ওটা হয় না।

প্রশ্ন। ঠিক বুঝতে পারলাম না। আর একটু বিশদভাবে বলবেন?

উত্তর। ধরো, তুমি তোমার বন্ধুকে বললে, ইস্কুলে যা পড়ানো হয় না বইটা পড়লাম। বেশ ভাল লাগল। তুই পড়বি?

বন্ধু বলল, আমার ওসব বাজে বই পড়ার সময় নেই। ইস্কুলে যা পড়ানো হয় তাই পড়তে পারছি না, আবার যা পড়ানো হয় না পড়তে হলেই তো হয়েছে।

এবার তুমি বললে, না বইটা পড়ে জীবনে কেমনভাবে চলতে হবে তা শেখা যায়।

এবার বন্ধু বলল, কেমনভাবে চলতে হবে সবই আমার জানা। লেখক আর কী নতুন করে শেখাবে।

নেতিবাচক লোকেদের নতুন কোনও কিছুতে উৎসাহ নেই। তারা গতানুগতিকতার বাইরে কোথাও যেতে চায় না। তারা কোনওও স্বপ্ন দেখতে শেখে না। অন্যকেও স্বপ্ন দেখাতে পারে না। তারা ঝুঁকি নিতে পারে না।

স্বামীনাথনের স্বপ্ন দেখা

দশ বছরের স্বামীনাথন স্বপ্ন দেখতেন কফির চারা পুঁততে এখন অনেক সময় লাগে। কোমর নিচু করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে গেলে গা হাত পা ব্যথা হয়ে যায়। আচ্ছা এমন কোনও যন্ত্র বার করা যায় না যাতে অতি দ্রুত চারা পোঁতা যায়। মানুষের কষ্ট লাঘব হয়। দশবছরের স্বামীনাথন দেখতেন কফির যত চারা পোঁতা হয় সব বাঁচে না। অনেক চারা শুকিয়ে যায়। আচ্ছা এই চারাগুলোকে বাঁচানো যায় না? স্বামীনাথনের যখন ১৭ বছর বয়স তখন একদিন কাগজে দেখলেন কলকাতায় দুর্ভিক্ষ চলছে। হোটেলের সামনে হাজার হাজার লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে। স্বামীনাথন ভাবলেন দুর্ভিক্ষে ধনীরা নয় গরিবেরাই মারা যায়। তাই দেশে বিরাট খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। ফলন বাড়াতে হবে।

ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন বড় হয়ে বিরাট কৃষিবিজ্ঞানী হয়েছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক ধান চাল গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর হয়ে উন্নতমানের ধানের বীজ আবিষ্কার করেন। সেই অধিক ফলনশীন ধান গম এখন পৃথিবীতে খাদ্য মজুতের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছে। ভারতে এখন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত। স্বামীনাথনের স্বপ্ন সার্থক।

পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে তা একদিনে হয়নি। অনেক ব্যর্থতা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক যখন সফল হয়েছেন তখন দেখলেন তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তার সামান্যই মাত্র করতে পেরেছেন। লোকে তাকে দুয়ো দিয়েছে। এই তো এতদিন ধরে লোকটা বলে আসছিল না জানি একটা বড় আবিষ্কার করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্বতের অশ্বডিম্ব প্রসব করল লোকটা।

কিন্তু তারা তখন ভুলে যায় ওই অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত বস্তুটি হল শুরু মাত্র। এরপর অসংখ্য বৈজ্ঞানিক যৌথভাবে ওই অসমাপ্ত কাজটি শেষ করেছেন। আজ যে ছাপার অক্ষরে এই বইটি পড়ছ, এটা আধুনিক ডিটিপি-তে ছাপা। DTP মানে Desk Top Publishing অর্থাৎ কম্পিউটরে ছাপা। DTP একটি প্যাকেজ।

কিন্তু এই মুদ্রণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হতেই পাঁচশো বছর লেগে গেছে।

ছাপার হরফের প্রথম আবিষ্কর্তা গুটেনবার্গ ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১২৮২ পাতার একটি বাইবেল প্রকাশ করেন। এই ১২৮২ পাতা বড় বড় হরফে বইটি ছাপতে অনেক বছর লেগেছিল। গুটেনবার্গ তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ এই আবিষ্কারের জন্য

ব্যয় করে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তাঁর শেষ জীবনের দুবছর এক ভদ্রলোক তাঁকে একটু আশ্রয় দিয়েছিলেন।

তোমার নেতিবাচক বন্ধু বলবে, গুটেনবার্গ ব্যর্থ লোক। এত বছর ধরে চেষ্টা করে ঢাউস একটা বই বার করল। বইটার কী ছিরি। বড় বড় টাইপ। অস্বাভাবিক চওড়া বই। এর চেয়ে হাতের লেখা পুঁথিই ভাল ছিল। কত ছবি থাকত তাতে।

১৯২৫ সালের ২ অক্টোবর বেয়ার্ড একঘর থেকে আর এক ঘরে ছবি পাঠিয়ে প্রথম টেলিভিশন চালু করলেন।

জন লগি বেয়ার্ড (১৮৮৮—১৯৪৬) আগে একটা ব্যবসা করতেন। অসুখের জন্য ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এর জন্য তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়েনি। ১৯২৫ সালে ইংলন্ডের হেস্টিংস শহরে একটি ছোট কারখানা তৈরি করে তিনি আলোকসম্পাত নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন, আলোর সাহায্যে কীভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছবি পাঠানো যায়। বেয়ার্ডের এই গবেষণার কথা অনেকে শুনেছিল যে বেয়ার্ড এক ঘর থেকে আর এক ঘরে এভাবে ছবি পাঠিয়েছেন। কিন্তু নেতিবাচক লোকেরা ব্যাপারটিকে তেমন পাত্তা দিল না। একঘর থেকে পাশের ঘরে ছবি পাঠানো তাও ছবিটা আবার কাঁপে, কী এমন কেরামতি হল বিজ্ঞানের? তারা বলল। বুঝেছি বাপু। এর বেশি আর ক্ষমতা নেই তোমাদের।

আজকের টেলিভিশনে কী দেখছ? বিশ্বকাপ হচ্ছে। ইরাকের যুদ্ধ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা দেখছ। সময় লেগেছে এজন্য। কিন্তু একটা শুরু তা যাই হোক না কেন, একটা জায়গা থেকেই তো করতে হয়। অসংখ্য ইস্কুল প্রথমে চালা ঘরে চার পাঁচ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে তৈরি হয়। সল্টলেকে আনন্দলোক নামে একটা বিশাল হাসপাতাল হয়েছে। আগাগোড়া শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি। ডি. কে. সরাফ বলে এক ভদ্রলোক এটি তৈরি করেছেন। তিনি একটি গ্যারেজঘরের মধ্যে এটি প্রথম করেছিলেন।

বিখ্যাত নিরমা সাবান কোম্পানি শুরু হয়েছিল একটি গ্যারেজ ঘরে। বিখ্যাত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টার শুরু হয়েছিল রয়টারের দু কামরার ফ্ল্যাটে। কোনও বড় কিছু একদিনে হয় না। একজন তার মতো করে সামান্যভাবে শুরু করে। তার পরে বহু লোক তাতে হাত লাগায়। সকলের সাহায্যে সেটি একদিন বিরাট প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। এখন নেতিবাচক লোকেরা সব সময় চেষ্টা করে সেটাকে ছোট করে দেখাবার। সাবধান, এই নেতিবাচক লোকেরা যেন তোমার উৎসাহ-উদ্দীপনাকে দাবিয়ে দিতে না পারে।

ছোট থেকে শুরু করো

যে কোনও বড় জিনিসই খুব ছোট অবস্থা থেকেও শুরু করা যায়। একসঙ্গে কখনও সবটা করা যায় না। এই পৃথিবীটা সৃষ্টি হতেই কত কোটি বছর লেগে গেল।

যারা ভাবে একেবারে প্রথম থেকেই বিশাল কিছু করে ফেলব সেজন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে তাদের সেই শুভদিন আর আসে না। তাদের চেয়ে যারা ছোট করে এখনই কিছু শুরু করে তারা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখতে হবে বড় কিছু করার কিন্তু সুযোগ ও বাস্তব অবস্থা পরিস্থিতি অনুযায়ী এখনই যা হাতে আছে তা নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে হবে।

আমি যে শহরে থাকি সে শহরে দেখলাম একটি হোটেল আজ দশবছরের ওপর ধরে তৈরি হচ্ছে। আজও তা শেষ হয়নি। অথচ তার অনেক পরে তার পাশের জমিতে একটি হোটেল তৈরি হয়ে অনেক দিন ধরে জাঁকিয়ে বসেছে।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা অন্যায় নয়, বরং খুবই ভাল। কিন্তু স্বপ্নটা মাথায় রেখে তাকে এখনই উঠে বসতে হবে। তারপর দাঁড়াতে হবে তারপর অন্তত লাখ পয়সা উপার্জনের রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে। লাখ পয়সা কত বলতো—মাত্র একহাজার টাকা। তাই এখনই কিছু শুরু করো। কালকের জন্য ফেলে রেখে দিও না। বড় খেলোয়াড় হতে চাও, শিল্পী হতে চাও, লেখক হতে চাও, বিজ্ঞানী হতে চাও—এখন থেকে দিনে আধঘণ্টা সময় দাও তার জন্য।

এখন ভাবতে পারো তুমি যা চাও তা হয়েই গেছ। কারণ তুমি একটা জায়গায় থেকে শুরু করেছ।

তোমায় দিল্লি যেতে গেলে অন্তত টিকিটটা তো কাটতে হবে। আর যাবই এই ইচ্ছা মনে রাখতে হবে। দুমাস পরে যাত্রার তারিখ। কিন্তু তুমি এখনই টিকিট না-কাটলে যেতে পারবে কি? টিকিট কাটলে বরং ট্রেনটা লেট হলেও গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌছবে। তবে দিল্লি যেতে গেলে দিল্লির টিকিট কাটতে হবে আর দিল্লির ট্রেনেই উঠে বসতে হবে। ফেলুমামার মতো কোরো না। ফেলুমামা আমার লেখা হাসির গল্পের এক দারুণ মজার চরিত্র। (ফেলুমামার সপ্তকাণ্ড, ফেলুমামার আরও কাণ্ড বই দুটি পড়লে বুঝবে)।

ফেলুমামা একবার পুজোর ছুটিতে মামিমাকে নিয়ে হরিদ্বার যাবেন। রিজার্ভেশন ছিল না। কুলি তাঁকে বলল, সাইডিং-এ যেখানে কামরাগুলো থাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে আপনাকে খালি কামরায় বসিয়ে দিচ্ছি। কুলি নিয়ে খালি কামরায় তাঁদের বিছানা করে শুইয়ে দিল। বলল, ঘুমিয়ে পড়ুন। রাত্তির বেলা এই কামরা ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেবে। ফেলুমামা ও মামি ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন ভোরে উঠে দেখেন যেখানে ছিলেন সেই হাওড়া সাইডিংয়েই আছেন। তাঁর স্যুটকেশ ও মালপত্র উধাও।

খুঁতখুতে হয়ো না

অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে খুঁতখুতে হবার প্রবণতা দেখি। খুঁতখুঁতে ভাব নেতিবাচক মনোভাব। এদের কোনও কিছুই যেন পছন্দ হয় না। এরা সব কিছুরই সমালোচনা করে। এটা ভাল না। ওটা ভাল না।

মন্দিরা মেয়েটি এমনিতে ভাল কিন্তু বড্ড ভীতু। রত্নাকে দেখতে ভাল কিন্তু কী বিশ্রী সাজগোজ করে। কোনও সেন্স নেই। তুহিন পড়াশোনায় ভাল কিন্তু

হাতগুলো প্যাকাটির মতো। পথের পাঁচালি সিনেমাটা তুলেছে ভাল। কিন্তু বড় প্যানপেনে। খুঁতখুতেরা কখনও সন্তুষ্ট হয় না। তার জন্য কেউ কিছু উপহার দিলে কিন্তু তার পছন্দ হয় না। তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে সে অর্ধেক আইটেমই খায় না কারণ তার খাওয়াতেও নানা বাছ-বিচার।

আমার কাছে একটি ছেলে এসেছিল। সে বারবার তার বিছানার চাদর পাতে। সব সময় তার মনে হয় চাদরটা কুঁচকে আছে। বয়স্কা মহিলাদের শুচিবাই রোগ হয়। তারা বারবার ঘরে গঙ্গাজল ছিটোয়। বারবার হাত ধোয়। পরিচ্ছন্নতা ভাল। কিন্তু তার তো একটা মাত্রা আছে। মাত্রা ছাড়ালেই সেটা মনের অসুখে পৌঁছে যায়।

আমার এক পাঠক চিঠি দিয়েছেন তাঁর মনে হয় বইগুলিকে সোজা আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখলে মনে হয় বই বড় ব্যথা পাচ্ছে। তাই তিনি সব বই শুইয়ে রাখেন।

যারা সব কিছু নিখুঁতভাবে করতে চায় অন্যের করা কাজ যাদের পছন্দ হয় না তাদের বলে Perfectionist. এরা চায় সব কিছু নিখুঁতভাবে করতে। এজন্য তারা যা করে তাতে সময় লাগে। যেমন স্নান করছে তো করছেই। পাউডার মাখছে তো মাখছেই। জামাকাপড় পরে বেরুতে বেরুতে তাদের সময় লাগে। এরা নিখুঁত হতে গিয়ে দেরি করে ইস্কুলে আসে। পরীক্ষার খাতা একবার রিভিশন দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু তারা ধীরে ধীরে লেখে। কাটে আবার লেখে। আমি পরীক্ষার খাতায় সঠিক প্রশ্ন লিখে গোটা প্রশ্ন কেটে দিয়ে অনেক ছাত্রকে শূন্য পেতে দেখেছি।

নিখুঁতবাদী ছেলেমেয়েরা কোনও অজানা উদ্বেগে ভোগে। তাদের মনে সব সময় ভয় এই ভুল হয়ে গেল।

এক ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব নিখুঁতবাদী। তিনি বিছানার চাদর একটু-ওদিক হয়ে গেলে, জামা-প্যান্ট উলটো করে রেখে দিলে দিনরাত চেঁচামেচি করেন। এর ফলে তাঁর পরিবারের লোকেরা এখন উদ্বেগে ভোগেন। এই বুঝি কোথাও ভুল হয়ে গেল।

দ্রুততার সঙ্গে সব কাজ করতে হবে। কারণ এখন পৃথিবীটাই খুব জোরে চলছে। আগের মতো ঢিলেঢালা জীবন আর নেই। ভাবতেও হবে চটপট। সিদ্ধান্ত নিতে হবে চটজলদি। ভেবে দেখি বলে কোনও সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখার সময় এখন নেই। তাই দ্রুত ভাবনা এবং সে ভাবনা দ্রুত কার্যকর করে তুলতে হবে। তাই চিন্তার গতিও দ্রুত করে তুলতে হবে।

ঝটিতি চিন্তা করে নেবে তোমার সিদ্ধান্তের ভালমন্দ উভয় দিকই। নিজে বিভ্রান্ত হয়ে গেলে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাবে। তাঁর মতামতটাই তখন নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু এটা মনে রাখবে দ্রুত কাজ করতে গেলে কিছু না কিছু ভুল হতেই পারে। আমি তো দীর্ঘ ৩৯ বছর খবরের কাগজে কাজ করেছি। খবরের কাগজের স্লোগান : এখনই করো নয়তো কোনওদিনই কোর না। আর অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কাজ হয় বলে বলা হয় সাংবাদিকতা হল দ্রুত লেখা ইতিহাস।

কিন্তু এই দ্রুত কাজের মধ্যে ভুল যে হয় না তা নয় কিন্তু তার চেয়ে বেশি

ভুল করেন সেই সব লেখকেরা যাঁরা চার-পাঁচবছর ধরে হয়তো একটা বই লেখেন। নিখুঁতবাদী হলে এই দ্রুততার যুগে কোনও কাজ করাই সম্ভব নয়। ভুল হতে পারে জেনেও দ্রুত কাজ করতে হবে। যতখানি সম্ভব ত্রুটিমুক্ত থাকার জন্য সচেতন থাকতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতাবোধ, সৌন্দর্যবোধের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। বিছানার চাদর যদি একটু গুটিয়েই থাকে তা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড না করে হয় তা উপেক্ষা করো, না হয় কিছু না বলে সেটা ঠিক করে দাও। মনে রাখবে পৃথিবীতে এমন কোনও মহাপুরুষও জন্মাননি, যাঁর চরিত্রের কোনও না কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু সে সব ত্রুটি ছাপিয়ে গেছে তাঁদের চরিত্রের মহান গুণগুলি।

তোমার গুণগুলিকে বড় করে তোল। দোষগুলি যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করো। না পারলে তা নিয়ে দুঃখ কোর না। তুমি যদি তোমার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকো তাহলেই যথেষ্ট। ত্রুটিগুলিকে যথাসম্ভব ঢেকে রেখে তোমার গুণগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তাকে বেশি করে সাধারণের কাছে প্রকাশ করো।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কলা-কৌশল

* কেউ কোনও বিপদে পড়েছে একথা শুনলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ভাববে তোমার এমন বিপদ হলে তুমি কী করতে। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়লেই এমন হাজারো সমস্যার সন্ধান পারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে। ভাববে তুমি হলে কী ভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে?
* যে কোনও বিবর্তনমূলক ঘটনার মীমাংসা কী ভাবে হতে পারে তুমি তোমার মতামত আগে থেকে ভেবে রেখে দাও।
* কেউ প্রশ্ন করলে নির্দিষ্ট ও সঠিক জবাব দিতে শেখো। কখনও বলবে না, আমি জানি না, আমি কিছু বলতে চাই না।
* তুমিই তোমার মনের জগতের একমাত্র অধিপতি। সদিচ্ছার সঙ্গে আন্তরিকভাবে সিদ্ধান্ত নাও। ভুল হয় হবে।

এগারো

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

যখন এ পৃথিবীতে এসেছ একটা দাগ রেখে যাও।

স্বামী বিবেকানন্দ

আমার কাছে ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা যখন কিছু না কিছু পরামর্শ নেবার জন্য আসে তখন আমি তাদের প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি : আচ্ছা বল তো, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?

কেউ কেউ খুব স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না। কেউ বলে, ভাল, একটা চাকরি-বাকরি করে পাঁচজনের মত সংসার ধর্ম করব।

জীবনের একটা উদ্দেশ্য না-থাকলে জীবনটা এলোমেলো হয়ে যায়। ইতর প্রাণীদের জীবনধারণ হল বেঁচে থাকা। খিদে মেটানো আর বংশবৃদ্ধি করা। সকাল থেকে সন্ধ্যা এই ধান্ধাতেই তারা ব্যস্ত থাকে। কারণ এর বেশি তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। তোমরা যখন সুন্দরবনে বা কোনও জঙ্গলে বেড়াতে যাও তখন বনের শোভা দেখে আনন্দ পাবার জন্য যাও। কিন্তু বনের যারা বাসিন্দা, সেই বাঘ ভালুক হরিণ তাদের কিন্তু বনের সৌন্দর্যের দিকে মন নেই। অথবা বলতে পারি সৌন্দর্য উপভোগ করারও ক্ষমতা নেই। সকাল থেকে বাঘের চিন্তা কী ভাবে একটা হরিণ মেরে খাব। আর হরিণের চিন্তা কীভাবে বাঘের হাত থেকে বাঁচব আর পেটপুরে ঘাস লতাপাতা খাব।

মানুষেরও খিদে মেটানো দরকার। আর এর জন্য তাকে রোজগার করতে হবে। আর যে যেমন লেখাপড়া শিখতে পারবে এবং তার যোগ্যতা উদ্যোগ সুযোগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুসারে যত বেশি রোজগার করতে পারবে সে তত ভালভাবে জীবন কাটাতে পারবে। সে তখন গাড়ি ঘোড়া চড়বে, ভাল বাড়িতে থাকবে, দেশ-বিদেশ বেড়াবে। তার ছেলেমেয়েদের আবার ভাল ইস্কুলে পড়াতে পারবে। এটা নিশ্চয়ই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষের জীবনের দুটো উদ্দেশ্য। এক : জ্ঞান অর্জন করা। দুই : আনন্দ লাভ করা। বাঘ-সিংহ হরিণের জ্ঞান অর্জন করার দরকার নেই। কেমন করে পালাতে হয় জানলেই হয়ে গেল। এ তো জ্ঞান নয়, এটা নৈপুণ্য। আমাদেরও চাকরি-বাকরি পেতে গেলে বা হাতের কাজ শিখতে গেলে কিছু বিশেষ নৈপুণ্য থাকলেই চলে। জ্ঞান ও নৈপুণ্যের মধ্যে তফাত হল জ্ঞানের

পরিধি আরও বড়। কেমন করে ট্রেন চালাতে হয় এটা জানা নৈপুণ্য। কেমন করে ইংরেজি লিখতে হয়, ব্যবসা সংগঠন চালাতে হয়, এগুলো নৈপুণ্য। আর কেন এটা হয় এটা জানাই জ্ঞান।

সব বিষয়েই কিছু জানতে হবে

জ্ঞান নিজেকে একটা বিষয় আবদ্ধ রাখে না। জ্ঞান কলা-বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের সীমারেখা মানে না। তুমি যদি ইতিহাস নিয়ে পড়ো এবং ইতিহাসে জ্ঞান অর্জন করতে চাও তাহলে একটা অংশে থেমে থাকবে না। যেমন ইংরেজরা ভারতবর্ষে কীভাবে এল এটা পড়তে পড়তে তোমার জানতে ইচ্ছে করবে একটা ছোট্ট দ্বীপের মানুষেরা এত জায়গা থাকতে এই ভারতবর্ষে এসে জুটল কীভাবে? তাহলেই চলে যেতে হবে ইংলন্ডের সেসময়কার সামাজিক অবস্থায়। কারণ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই দেশের মানুষের মন গঠন করে। ইংলন্ডের ইতিহাস পড়তে পড়তে সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির দিকে মন চলে যাবে। তারপর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে গেলেই বিজ্ঞানের অবদানের কথা আসবে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং অভিযাত্রীদের দেশ-বিদেশ আবিষ্কার সব কিছুই নিজের দেশের সমাজকে শুধু নয় বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করে।

জার্মানিতে জন্মেছিলেন মার্টিন লুথার কিং। তিনি ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপের নানা অন্যায় ও জুলুমবাজির প্রতিবাদ করে খ্রিস্টানদের মধ্যে নতুন সম্প্রদায় প্রোটোস্ট্যান্ট সংঘ তৈরি করলেন। এর প্রভাব গিয়ে পড়ল সারা বিশ্বে।

ধর্ম সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান থেকে ভূগোল সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এজন্য জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যত ওপরে উঠবে দেখবে সব শাস্ত্র হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু অনেকদিন ধরেই তাঁর পড়ানোর বিষয় দর্শন। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল সাহিত্যতত্ত্ব বা পোয়েটিকস লিখেছেন। সেইসঙ্গে লিখেছেন আবার রাজনীতির বই। দার্শনিক প্লেটোর রিপাবলিকও রাজনীতির বই। দুটি বই লিখে হইচই ফেলে দেন চার্লস ডারউইন। একটি হল অরিজিন অফ স্পেসিস (জীবের উৎস), আর একটি হল দি ডিসেন্ট অব ম্যান (মানুষের আবির্ভাব), তিনি কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। ছিলেন ডাক্তারির ছাত্র। কিন্তু স্কুলজীবন থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়।

লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫) যিনি অ্যানথ্রাক্স ও র‍্যাবিসের টিকা আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত এক অসামান্য চিত্রকর ছিলেন। ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁকেন। যে কেমিস্ট্রির জন্য তাঁর এত নাম, কলেজে ভর্তির পরীক্ষায় সেই কেমিস্ট্রিতে তিনি ফেল করেন। এতে তাঁর একবছর নষ্ট হয়। তারপর তিনি মন দিয়ে পড়াশোনা করে অ্যাডমিশন টেস্টে প্রথম হন। তারপর তিনি ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি দুটোতেই সমান দক্ষতা অর্জন করেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক সিগমান্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৮৩৯)-এর ইচ্ছা ছিল

তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানী হবেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ডাক্তারিতে। আগ্রহ জন্মালো শারীরবিজ্ঞান বা ফিজিওলজিতে। ছ বছর শারীরবিদ্যা নিয়ে পড়ে তিনি দেখলেন মেডিসিন পড়াটা বেশি অর্থকরী। তিন বছর হাসপাতালে থেকে মেডিসিনের ডাক্তার হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। এরপর প্যারিসে পড়তে এসে তিনি একটি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণীর চিকিৎসা করতে গিয়ে মনোবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এতদিন ধরে ডাক্তারদের মধ্যে ধারণা ছিল যে হিস্টিরিয়া শুধু মেয়েদেরই হয়। ফ্রয়েড বললেন, না, ছেলেদেরও হতে পারে। তিনি ভিয়েনায় ফিরে এ নিয়ে একটি বক্তৃতা দিতেই মেডিক্যাল অধ্যাপকরা চটে গেলেন। ফ্রয়েডকে তাঁরা একরকম একঘরে করে দিলেন। কিন্তু ফ্রয়েড সম্পূর্ণ নতুন দিকে তাঁর জ্ঞান চর্চাকে নিয়ে গেলেন। সেটি মনোবিদ্যার দিক। ১৯০০ সালে প্রকাশিত হল তাঁর সাড়া জাগানো বই 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিম' বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের জনক ফরাসি বিজ্ঞানী ক্লড বার্নাড (১৮১৩-১৮৭৮) ইস্কুল কলেজে বিজ্ঞান পড়েননি। তিনি হিউম্যানিটিজের ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনাতেও ভাল ছিলেন না। আঠারো বছর বয়সে আর্থিক দুরবস্থার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কাজ নেন এক ওষুধ কোম্পানিতে। সেখানে কাজ করতে করতেই শরীরের ওপর ওষুধের প্রয়োগ নিয়ে তাঁর মধ্যে আগ্রহ দেখা দেয়। তিনি পড়াশোনা করে এ নিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। এ সময় তিনি নাট্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে একটি নাটক লিখে তিনি অভিনয় করেন। পরে তিনি প্যারিস শহরে আসেন। তখন একজন নাট্যসমালোচকের কাছে তাঁর নাটকটি নিয়ে মতামতের জন্য গেলে তিনি তাঁকে বলেন, তোমার নাটকটি ডাক্তারি বিষয় নিয়ে। বেশ ভালই লিখেছ। তোমার এদিকে প্রবণতা আছে। তুমি ডাক্তারিতে ভর্তি হয়ে যাও। বার্নার্ড সেই কথা শুনে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব মেডিসিনে ভর্তি হয়ে গেলেন। ডাক্তারি পাস করলেন, কিন্তু খুব ভাল রেজাল্ট হল না। ডাঃ ক্লয়েড বার্নাড কখনও ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেননি। তিনি সারাজীবন জ্ঞানচর্চায় জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর বড় বড় আবিষ্কার ছিল মানুষের শরীর নিয়ে। নার্ভ বা স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা, পরিপাক যন্ত্রে প্যানক্রিয়াসের কাজ, লিভারের কাজ এইসব। তাঁর এই অবদানের কথা মনে রেখে ফ্রান্সের রাজা নেপলিয়ন থ্রি তাঁকে ফরাসি সংসদের সাংসদ মনোনীত করেন।

বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী আরউইন শ্রোডিঙ্গার (১৮৮৭-১৯৬১) যিনি ওয়েব মেকানিক্সের সূত্র আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি হিউম্যানিটিজ নিয়ে স্কুল-কলেজে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি ফিজিক্স পড়েন।

প্রকৃত জ্ঞান কিন্তু বহুমুখী। বিশেষীকরণ বা স্পেসালাইজেশনের নিশ্চয়ই দাম আছে। তুমি যদি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাও তাহলে বিজ্ঞানের কোনও শাখা নিয়ে পড়বে সেটা তোমায় আজ না হোক উচ্চমাধ্যমিকের সময়ই ঠিক করতে হবে। তেমনি ইতিহাস পড়লে কোনও যুগের ইতিহাসে তোমার বেশি আগ্রহ—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ না আধুনিক যুগ। তেমনি যত ওপরে যাবে ততই পিরামিডের চূড়ায়

গিয়ে উঠবে। গ্রাজুয়েশন করার সময় একটা বিশেষ বিষয় বেছে নিয়ে পড়তে হবে। এম.এ. এম এস-সি, এম কম-এ সেই বিষয়টি আরও গভীরভাবে পড়তে হবে। আবার পিএইচডি করতে গেলে তারই একটা শাখা যার প্রতি তোমার বেশি আগ্রহ সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আর সব দিকের জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে রাখবে। জেমস ওয়াটসন (১৯২৮) যিনি DNA এর কাঠামো আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন, তিনি ছোটবেলায় পাখি দেখায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে ভাল বিতর্ক করতেন। পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রাণিবিদ্যা পড়েন। তারপরে তিনি জেনেটিক্সে আগ্রহী হন। অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে তাঁর এত আগ্রহ ছিল যে জেনেটিক্স ও কেমিস্ট্রি কোনওটা নিয়ে এমএসসি করবেন তা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না।

আমার পরিচিত অনেক ছাত্রছাত্রীই হিউম্যানিটিজ থেকে পরে বিজ্ঞানে গেছে। আবার বিজ্ঞান থেকে হিউম্যানিটিজে এসেছে। আমাদের দেশে আগেরটা হয় না। বিদেশে হয়। সেদেশে ইচ্ছেমতো যেকোন সময় বিষয় বদলানো যায়। অথবা বিভিন্ন বিষয় থেকে মিশিয়ে বিষয় নেওয়া যাবে। তুমি ইতিহাস ও ফিজিক্স দুটো বিষয় নিতে পারো। অথবা গণিত ও দর্শন। আচরণ বিজ্ঞানের জনক বি এফ স্কিলার (১৯০৪-১৯৯০) আমেরিকান। তিনি ছোটবেলায় ছুতোর মিস্ত্রির কাজ শিখেছিলেন। কলেজে তিনি ইংরেজিতে অনার্স নেন। ইচ্ছা ছিল লেখক হবেন। হননি। তিনি এমএসসি করেন হার্ভার্ড থেকে। সাইকোলজিতে ডিগ্রি নিয়ে তিনি সাইকোলজির প্রফেসর হন। সাইকোলজির যে দিকটাকে বলে আচরণবাদ তিনি সেটাতে বিশেষ গবেষণা করেন।

এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়কে যতখানি পারা যায় একসঙ্গে করে নানা ধরনের কাজ হচ্ছে। একে বলে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ওয়ার্ক। যেমন ফিজিক্স ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে কেউ গবেষণা করল। অর্থনীতি ও জেনেটিক্স নিয়ে কাজ হতে পারে। আজকাল বিজ্ঞান নিয়ে যারা পড়ে তারা অধিকাংশই আর্টস বিষয়ে কিছু পড়তে চায় না। সাহিত্য তো নয়ই। অথচ দেখো, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), পরশুরাম (রাজশেখর বসু) কী দারুণ সাহিত্য লিখে গেছেন। তাঁরা সবাই বিজ্ঞানের ছাত্র। স্বক্ষেত্রেও কৃতী।

আমি নিজে বাংলার ছাত্র। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়িয়ে এলাম মাস কমিউনিকেশন অর্থাৎ গণজ্ঞাপন। কিন্তু সেটা করতে করতেই আমি মনস্তত্ত্ব এবং আচরণ বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশোনা করে আগ্রহ বাড়ালাম। এখন তার ওপরেই লেখালেখি করি আবার সাহিত্যের বই প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাসও লিখি। আমার এখন আগ্রহ দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে। বিজ্ঞানে আমার যে আগ্রহ নেই তা বলব না। তবে সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞান আমি

তেমন বুঝতে পারি না। ছোটবেলা থেকে চর্চা করিনি তাই খুব একটা আগ্রহ জন্মায়নি। তবে বিজ্ঞান না-জানলে সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস পড়াটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর সমাজতত্ত্ব না-জানলে সাহিত্য পড়া সম্পূর্ণ হয় না।

আবার বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও সাহিত্য বুঝতে হবে। কারণ সাহিত্য তোমার জ্ঞানকে নানা দিকে ছড়িয়ে দেবে। উপন্যাস পড়লে সমাজ ও সমাজের মানুষকে ভাল করে বুঝতে পারবে।

কেন মানুষ হিংসা করে কেন ভালবাসে? মানুষ কী চায়, কীসের জন্য মানুষে মানুষে সংঘাত—এসব গল্প-উপন্যাস না পড়ে বোঝা যায় না।

জ্ঞান শুধুমাত্র তথ্যের বোঝা নয়। তথ্যকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। এজন্য একটা কবিতা পড়ে তার ভাবার্থ লিখতে দেওয়া হয় অথবা একটা বিষয়ের ওপর রচনা লিখতে দেওয়া হয়, বিষয়টির কত গভীরে তুমি ঢুকতে পেরেছ তা জানার জন্য।

আনন্দের সন্ধান করো

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন জীবনের আর একটি উদ্দেশ্য আনন্দ। আনন্দ তাকেই বলব যে কাজটা করলে, দেখলে বা শুনলে আমাদের খুব ভাল লাগে। মনটা প্রসন্ন হয়ে যায়। আমাদের মনে তৃপ্তি জাগে। যে কাজে মন পরিপূর্ণভাবে সায় দেয়। অনেক লোকের আনন্দ হয় অপরের ক্ষতি হতে দেখলে। যেমন রোম যখন পুড়েছিল তখন নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন। লোকের আর্তচিৎকার শুনে নিরোর খুব আনন্দ হচ্ছিল। একজন সমাজবিরোধী গুণ্ডা বদমায়েশ লোককে খুন করে, মারধর করে আনন্দ পায়।

খারাপ লোকের আনন্দ

এক গ্রামে একটি বদমায়েশ লোক বাস করত। তার কাজ ছিল গ্রামের সবাইকে উত্যক্ত করা। এই করে সে মজা পেত। তার খুব আনন্দ হত। একদিন সে গ্রামের লোকদের বলল, তোমাদের অনেক জ্বালিয়েছি। এখন বুড়ো হয়েছি। কবে মারা যাই তার ঠিক নেই। তোমাদের কাছে অনুরোধ আমি মারা গেলে আমার দেহটা একটা গাছে ঝুলিয়ে রেখো।

একদিন লোকটি মারা গেল। তারপর তার শেষ ইচ্ছামতো গ্রামের লোকেরা সত্যি সত্যি তার দেহটা গ্রামের বটগাছে ঝুলিয়ে রাখল।

ব্যস, আর যাবে কোথায়? খবর পেয়ে পুলিশ এল। তাদের সন্দেহ হল গ্রামবাসীরা লোকটিকে খুন করে তার দেহ ঝুলিয়ে রেখেছে। গ্রামবাসীদের অনেককে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। বহুদিন পর বহু ঝুটঝামেলা করে তবে গ্রামের লোকেরা নিষ্কৃতি পেল। তারা বুঝতে পারল যারা বদলোক তাদের বদমায়েসি মৃত্যুকালেও যায় না। কারণ অপরের ক্ষতি করেই তাদের আনন্দ।

অসৎ লোকের এই আনন্দ বিকৃত আনন্দ। তারা মানসিক অসুখে ভুগছে। এরা স্বাভাবিক নয়।

বই-এর বিকল্প নেই

স্বাভাবিক সুস্থলোকেরা আনন্দ পায় সুন্দর দৃশ্য দেখে। মরমি মানুষের সঙ্গে দুদণ্ড গল্পগুজব করে। নিজের পছন্দমতো হবি অনুসরণ করে। যেমন ছবি আঁকা, বাগান করা, মডেলিং করা, ডাকটিকিট জমানো, খেলাধুলা করা। নাটক করা, পাখি দেখা, সমাজসেবা করা—এমনি বহু হবি আছে। গল্পের বই পড়া, কবিতা গল্প লেখা, ম্যাগাজিন বার করা খুব ভাল হবি। ছোটবেলায় আমার হবি ছিল গল্পের বই পড়া। একটা ভাল বই কারও কাছে আছে বা কোনওও লাইব্রেরিতে আছে জানতে পারলে আমি তিন-চার কিলোমিটার হেঁটে সেখানে চলে যেতাম।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ছাত্র অবস্থায় একবার খোঁজ পেয়েছিলেন এক ধনী ভদ্রলোকের বাড়িতে অনেক বই আছে। কিন্তু তার বাড়ি যেতে গেলে নদী পেরিয়ে যেতে হয়। আব্রাহামের কাছে খেয়া পেরুবার মতো পয়সা ছিল না। তিনি তাই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে সেই নদী সাঁতার কেটে সেই ধনী ব্যক্তির বাড়ি গিয়েছিলেন ও তাঁর লাইব্রেরিতে বসে নিয়মিত বই পড়তেন।

আমার কাছে বই পড়া এত আনন্দের ছিল যে ইস্কুলের লাইব্রেরি থেকে একটি বই পেলে ধন্য হয়ে যেতাম। ইস্কুলে আমাদের ইংরেজির মাস্টার সন্তোষবাবু সপ্তাহে একদিন করে ক্লাসে কিছু বই নিয়ে আসতেন। যে পড়া পারবে তাকেই তিনি বই দিতেন। আমরা অনেকে বই নেওয়ার লোভে পড়া করে যেতাম।

ছাত্রজীবন শেষ করে বহুবছর পর ইস্কুলের রিইউনিয়নে গিয়ে দেখি ইস্কুলে লাইব্রেরির জন্য দোতলায় একটা পুরো ঘরই বরাদ্দ হয়েছে। বসে পড়ার মতো একটা রিডিং রুম হয়েছে কিন্তু শুনলাম এখনকার ছেলেরা আর বই পড়তে চায় না। তারা আর বই পড়ে আনন্দ পায় না।

আমার এই বইটি তো ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য লিখেছি। কিন্তু তারা কতজন পড়বে মনে খটকা থেকেই যাচ্ছে। কারণ এখন নাকি ক্লাসে পড়ার চাপ খুব বেশি। তা বাদে সারা বছর ক্রিকেট ফুটবল ম্যাচ লেগেই আছে যা টিভিতে সারাদিন ধরে দেখানো হয়। তা ছাড়া টিভিতে কত প্রোগ্রাম হয়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কিছুটা আড্ডা তো দিতেই হয়। কোচিং নিতে যেতে হয়। ছেলেমেয়েদের হবি অনুসরণ করার সময় নেই। গল্পের বই পড়ার সময় নেই। আমার ছোটবেলায় টিভি ছিল না। রেডিও খুব কম বাড়িতে ছিল। আনন্দের বড় উপকরণ ছিল বই। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত এমনি কত লেখকের বই ইস্কুল জীবনে শেষ করে ফেলেছিলাম। বই পড়ার অভ্যাস আমি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আমার মা অনেকদিন রোগে ভুগে ৮৪ বছর বয়সে মারা যান। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি বই পড়তেন। বই ছিল তাঁর আনন্দ।

বই-এর কোনও বিকল্প নেই। হবেও না। রাশিয়া, জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা এত বড় হয়েছে তার একটা কারণ ওদেশে লোকে অনেক বেশি বই পড়ে। একবার

আমি মস্কো শহরে গিয়ে দেখি যে রাস্তার ধারে লোকে বিরাট কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার? সে বলল, আজ একটা নতুন বই বেরিয়েছে। তাই কেনার জন্য লাইন।

মন ভাল রাখো

মন ভাল রাখার উপায় হল সব সময় খোশমেজাজে থাকার চেষ্টা করা। যেটা তোমার মনের মতো হয় না তাতেই তোমার রাগ হয়। আর রাগ হলে অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যাকে যা খুশি বলে দাও। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এ-নিয়ে মারধরও হয়। কথা তো বন্ধ হয়েই যায়। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

আমি একবার আমার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সমীক্ষা করে দেখেছিলাম ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে রাগ বেশি। অথচ বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না।

রাগ করলে ব্লাডপ্রেসার বাড়ে। মাথা দপদপ করে। শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়। সাময়িকভাবে মাথার ঠিক থাকে না। পরে অনুতাপ হয়।

যাদের এমন হয় তাদের উচিত রাগ হলেই সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গিয়ে অন্য কোনও কথা ভাবা। কোনও উত্তর না-দেওয়া। উত্তর দিলেই ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে।

পৃথিবীতে সব ঘটনা তো তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না। অন্যের ব্যবহারের ওপর তোমার কোনওও হাত নেই। হয়তো সেদিন বাড়িতে তার ভাইবোন বা মায়ের সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে মনটা খিঁচড়ে আছে। সেই রাগটা গিয়ে পড়ল তোমার ওপর। এখন তুমি যদি চটে গিয়ে কিছু একটা বলো তা হলে তুলকালাম কাণ্ড হবে। তার মধ্যে তুমিও জড়িয়ে পড়বে।

তর্কে বহুদূর

তর্ক বা ঝগড়া করে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। তর্কে তর্ক বাড়ে। ধরো তুমি জানো এটা লাল রঙ। আর একজন চিৎকার করে যদি বলে এটা কালো, তুমি তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝালেও সে বুঝবে না, সে কালোই বলে যাবে। কী হবে অনর্থক তর্ক করে তোমার উত্তেজনা বাড়িয়ে।

তর্ক করবে বিতর্ক সভায় গিয়ে। কোনও ইস্যুর ওপর তোমার যুক্তি দেবে। সেখানেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করবে না। শুধু যুক্তিজাল বিছাতে হবে তারপর সুন্দরভাবে গুছিয়ে তোমার কথা বলতে হবে। যা কিছু সৃজনশীল তার সঙ্গে যুক্ত থাকাটা আনন্দের।

সৃষ্টি একা একা করা যায়। যেমন বাড়িতে বসে গল্প কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, ফুলের গাছ করা। যা ছিল না অথবা যা ছোট্ট আকারে ছিল তাকে ধীরে ধীরে সজীব করে তোলা ও তার সঙ্গে তোমার মনে মাধুরী মিশিয়ে দেওয়াটাই সৃজনশীলতা। এমনকী, ল্যাবরেটরিতে একটি পরীক্ষা করে তুমি যদি সফল হও সেটাও সৃজনশীলতা। একজন শিল্পী যেমন সৃজনশীল। একজন চাষিও তেমন সৃজনশীল।

আনন্দ খোঁজো

আনন্দের জন্য একমাত্র বাইরের ঘটনার ওপর নির্ভর করে থাকলে হতাশ হতে হয়। কারণ বাইরের ঘটনাগুলি নিত্য পরিবর্তনশীল। সেজন্য আনন্দের সন্ধান করতে হয় নিজের ভেতরে। অনেকের বাবা-মা ছোটবেলায় মারা যায়। তাতে করে তারা এত আঘাত পায় যে আর জীবনে দাঁড়াতে পারে না।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন যাঁদের ছোটবেলায় বাবা মা মারা গিয়েছেন। কিন্তু মনের দুঃখ জয় করে তাঁরা তাদের লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন ও বিরাট বড় মাপের মানুষ হয়েছেন।

যেমন পেনিসিলিন আবিষ্কর্তা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর যখন ৭ বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। অ্যালফ্রেড বিনেট (১৮৫৭-১৯১১) যিনি প্রথম বুদ্ধির পরিমাণ (আই কিউ) মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ছোটবেলায় তাঁর বাবা-মা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যান। বিনেট মামার বাড়িতে মানুষ হন। স্বদেশি যুগের বিরাট পণ্ডিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসু শৈশবে পিতৃহীন হন। বিশ শতকের সেরা রসায়নবিদ লিনাসপলিং-এর বয়স যখন বারো তখন তার বাবা মারা যান। তাঁর মা এত অসহায় হয়ে পড়েন যে তিনি খবরের কাগজে চিঠি লিখেছিলেন ছেলেকে কীভাবে এই পরিস্থিতিতে মানুষ করবেন তা জানতে চেয়ে।

সত্যজিৎ রায় যখন মায়ের গর্ভে তখন তাঁর বাবা সুকুমার রায় মারা যান। কিন্তু যাঁরা প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন কোনও অবস্থাতেই তাদের দাবিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু সাধারণ ছেলেমেয়েরা একটু বিপর্যয়ে ভেঙে পড়ে। সাধারণ হোক আর অসাধারণই হোক। আনন্দের সন্ধান সবসময় করতে হয় নিজের মধ্যে।

মনটাকে ছোটবেলা থেকে এইভাবে তৈরি করতে হয় :

ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সফল শক্তি, নেব অভয় তব শঙ্খ।

ছোটখাটো আনন্দের সন্ধানে

বাইরে থেকে যদি আনন্দের সন্ধান করতেই হয় তাহলে খুব ছোটখাটো জিনিসের মধ্যে আনন্দ পেতে শিখতে হবে।

আমি যখন কলকাতায় খ্রিস্টোফার রোডে সিআইটি বিল্ডিংসে থাকতাম তখন মাঝেমাঝে একটি বস্তির মধ্য দিয়ে বাস ধরতে যেতাম। যাবার সময় লক্ষ্য করতাম বস্তির ছেলেমেয়েরা কী গভীর আনন্দের সঙ্গে রাস্তায় খেলা করছে, হাসছে, তা দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যেত।

আমার মন যখন খারাপ লাগে তখন আমি বারান্দার দরজাটা খুলে দেই। দেখি

আমার চাঁপাগাছটিকে। কারও তোয়াক্কা না করে সে আপন মনে ফুল ফুটিয়ে চলেছে। উঁচু গাছ। কেউ নাগাল পায় না। অজস্র ফুল ফুটে ঝরে পড়ে যায়। গাছটির কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। ফুল ফোটানোই তার কাজ।

চাঁপাগাছটি কখনও জিজ্ঞাসা করে না, আচ্ছা ফুল ফুটিয়ে, সুগন্ধ ছড়িয়ে কী হবে? মানুষজনেরা আমার ফুল কুড়িয়ে কেউ তো পুজোয় দেয় না। আমার দিকে কেউতো তাকায় না। সে শুধু ফুল ফুটিয়েই যায়। কারণ এতেই তাদের আনন্দ।

এই বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যই। তা না-হলে প্রকৃতিতে এমন সুন্দর সুন্দর জায়গা তৈরি হত না। আমরা পুরী, দিঘা, ওয়ালটেয়ার, মুম্বই যাই সমুদ্রের অসামান্য রূপ দেখার জন্য। দার্জিলিং যাই, কালিম্পংও গ্যাংটক যাই খুব কাছ থেকে হিমালয়ের শোভা দেখার জন্য। কেন যাই? না প্রকৃতির শোভা দেখে আনন্দ পাবার জন্য।

সুন্দরকে ভালবাসো

আনন্দ পেতে গেলে ছোটবেলা থেকে সুন্দরকে ভালবাসার মতো মন তৈরি করতে হবে। যে ছবি আঁকছে সেই কিন্তু একমাত্র শিল্পী নয়। ছবি দেখে যার ভাল লাগছে সেও শিল্পী। কারণ, তার আছে শিল্পী মন। সে আর্টকে ভাল লাগাতে জানে। যে লেখক সে যেমন স্রষ্টা, যে পাঠক সেও কিন্তু স্রষ্টা। কারণ তার মনের ভেতর একজন সৃজনশীল মানুষ বাস না-করলে সে অন্য কোনও সৃষ্টির গুরুত্ব বুঝতে পারবে না।

প্রত্যেকের মনের ভেতর একজন করে সৃজনশীল শিল্পী বাস করে। তাকে জাগাতে গেলে ছাত্র অবস্থা থেকেই ট্রেনিং চাই। তাহলে দেখবে আনন্দ পাবার জন্য নেশার দরকার হচ্ছে না। ছবি এঁকে ছবি দেখে, গান শুনে বা গান গেয়ে, বাজনা শুনে বাজনা বাজিয়ে আনন্দ পাচ্ছ। নাটক যারা করে আর নাটক যারা দেখে তারা সমান আনন্দ পায়।

কিছুদিন আগে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমার কাছে তাঁর কয়েকটি বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শের জন্য এসেছিলেন। তিনি কথায় কথায় বললেন, তাঁর ছেলে কলেজে পড়ে। দেখলেন, ছেলের কিছু বন্ধুবান্ধব জুটেছে। তাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করছে ছেলেটি। তিনি ছেলেকে একটি গিটার কিনে দিলেন। গিটার শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। ছেলেটি গিটারের মধ্যে যেই আনন্দ খুঁজে পেল অমনি বাজে আড্ডা দেওয়া বন্ধ করে দিল।

কোনও কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেলে সে কাজটাকে আর বোঝা মনে হয় না। আমি হিসেব করে দেখলাম সারা জীবনে যা লিখেছি তার ছাপা পৃষ্ঠার সংখ্যা হবে অন্তত কুড়ি হাজার পাতা। এই কুড়ি হাজার পাতা লেখার জন্য আমার যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক কম টাকা পেয়েছি। কেউ দশ হাজার টাকা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাত্র দুহাজার টাকা দিয়েছেন। কেউ কিছুই দেননি।

কুড়ি হাজার পাতা লেখা খুব পরিশ্রমের কাজ। বহু মানুষ দিনে এক প্যারাও কিছু লিখতে চান না। তোমরা হোমটাস্ক করার সময় দুতিন পাতা লিখেই ক্লান্ত হয়ে যাও। কিন্তু আমি ক্লান্ত হইনি। তার কারণ প্রতিটি পাতা লেখার সময় আমি আনন্দ পেয়েছি। আনন্দ পেয়েছি বলেই লেখা আমার কাছে কখনও একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি।

তোমরা জীবনে আনন্দের জায়গা খুঁজে বার করো। লেখা, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, ব্যায়াম, খেলাধুলা, বক্তৃতা দেওয়া। এমনকি, রান্নাবান্না, বাড়িকে ফিটফাট রাখার মধ্যেও আনন্দ আছে। যার মধ্যে কিছু সৃষ্টি আছে সেটাই আনন্দ।

উপনিষদ বলছে আনন্দ থেকেই জীবনের জন্ম। আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম মানে যাকে পেলে জীবনের চরম পাওয়া বলে গণ্য হয় সেই অবয়বহীন বস্তু। আগেই বলেছি যে নিজেকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখার অভ্যাস খুবই ভাল।

ভবিষ্যৎ জীবনে তো কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় দিতে হবে। তখন আর মনে হবে না যে এত কাজ পেরে ওঠা যায় না। কারণ অবিরাম কাজ করার অভ্যাস ছোটবেলা থেকে গড়ে উঠেছে।

এছাড়া আমাদের অবচেতন মনে নানা উদ্বেগ-অশান্তি জমা হয়ে চলেছে। হয়তো তুমি যা চাইছ পাচ্ছ না। তখন মনের ভেতর অবসাদ ও হতাশা এসে গেছে। সৃজনশীল কাজের মধ্যে থাকলে এই হতাশা বড় হয়ে মনের মধ্যে আর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। মনের প্রফুল্লতা বজায় থাকে। আইনস্টাইন, ওপেনহাইমার ভাল বেহালা বাজাতেন। তুমিও বেহালা কিংবা অন্য যে একটা বাজনা শেখো না। যখন দেখবে খুব বোর লাগছে তখন বেহালা, গিটার বা সেতার একটু বাজালে, অথবা একটা ছবি আঁকলে, অথবা হারমোনিয়াম বাজিয়ে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে অথবা একটা দুটো কবিতা লিখলে দেখবে মনের সব ভার হালকা হয়ে গেছে।

সুন্দর মনের অধিকারী হও

* তোমার দেহ যদি সুন্দর হয় তার জন্য কৃতিত্ব তোমার নয়। দৈহিক সৌন্দর্য আসে জিন থেকে। সেটি উত্তরাধিকার। কিন্তু তোমার মনের সৌন্দর্যের রূপকার তুমি নিজে।
* মনের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় তোমার উদারতায়। অধিকাংশ লোকেই সংকীর্ণ চিত্ত। অন্যের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু আত্মত্যাগ করতে চায়। একমাত্র সুন্দর মনের অধিকারীরা অন্যকে নীরবে ভালবাসে, ছবি দেখতে বা আঁকতে ভালবাসে, সাহিত্য ভালবাসে, প্রকৃতি ভালবাসে সে একটু একটু করে সুন্দর মনের অধিকারী হয়।

বারো

আত্মমর্যাদার সন্ধানে

বল বীর চির উন্নত মম শির

নজরুল

এই বইয়ের গোড়ায় বয়ঃসন্ধির যে চরিত্র লক্ষণের কথা বলেছিলাম তা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই বয়সে আমেরিকার জন, বাংলাদেশের সোলেমান ও কলকাতার বর্ণালী মোটামুটি একই আচরণ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি লোকের আলাদা আলাদা একটা চরিত্র আছে। তাকে মনোবিদরা বলেছেন ব্যক্তিগত উন্নয়ন বা Personal Development.

সেদিন আমার কাছে এম.এ. পাস করা একটি ছেলে কাউন্সেলিং-এর জন্য এসেছিল। ছেলেটি একটা সময় পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল। কয়েকটি কারণে শেষের দিকে তার রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেছে। সে বলল, বন্ধুবান্ধবরা তাকে বলে অপরিণত—Immature. আবার আর একটি ছেলে এল—তার অন্য সমস্যা। কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস খুব বেশি। অনেক ছেলেমেয়ে আসে তাদের সমস্যা তারা দুর্বল মুহূর্তে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ছেলেমেয়েরা কুসঙ্গে পড়ে বদ অভ্যাস শেখে। নেশাভাঙ করে, শরীর স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলে।

তোমার বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে সবাই তো সমান নয়। এক একজন এক এক রকম। চেহারা ও প্রকৃতিতে কেউ কারও সঙ্গে মেলে না। তবু তার মধ্যে যতটুকু যার মেলে সে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে।

এই যে কেউ কারও মতো নয়, এক একজন একজনের মতো এটা কেন হয়?

এটা হয় কয়েকটি জিনিসের প্রভাবে। প্রথম প্রভাবটি হল হেরিডিটি বা বংশক্রম। বংশ বলতে জাতপাত নয় কিন্তু। নীচু জাত উঁচু জাত। ভাল ধর্ম, খারাপ ধর্ম বলে কিছু নেই।

দোষে-গুণে মিলে সব মানুষ। পিতৃপুরুষের বা মাতৃপুরুষের দোষ বা গুণ সন্তানের দেহে ক্রমোজমের সঙ্গে চলে আসে। তবে বাবা-মায়ের সব দোষ-গুণই সন্তানের মধ্যে আসবে না। চোর ডাকাতের ছেলে-মেয়েও সৎ হতে পারে আবার সাধুর ছেলেও চোর হতে পারে। আবার চোরের ছেলে চোর হতে পারে। কোনও অবস্থাতেই নিজেকে অপরের চোখে হেয় হতে না দেওয়া আত্মমর্যাদাবোধ বা Self esteem.

আত্মমর্যাদাবোধ আসে নানাভাবে। এই বোধ একটা গর্ব। এটি ভাবগত। প্রত্যেকেরই একটা বংশমর্যাদা আছে। বংশমর্যাদা একটা বোধ বা ধারণা। শুধু বনেদি পরিবারেই এই বংশমর্যাদাবোধ থাকবে তা নয়, এটি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারেও থাকতে পারে। মানুষ আগে পিতৃপুরুষের পুজো করত। এখনও হিন্দুরা তর্পণের সময় মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল দেয়। তার মানে কী? মানে হল যাদের রক্তের ধারা তুমি বহন করে চলেছ সেই পরম্পরার প্রতি গর্ববোধ।

দ্বিতীয়ত, আত্মমর্যাদাবোধ আসে প্রজাতি বোধ অর্থাৎ eithnicity থেকে। ভারতবাসী হিসাবে আমরা গর্ববোধ করি। গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আমাদের আছে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা। পৃথিবীর আদিতম গ্রন্থ বেদ রচিত হয়েছিল আমাদের দেশে। আমাদের সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কত পুরনো। কত ধর্মের মিলনভূমি আমাদের এই দেশ। কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে ভারতবর্ষে। আমাদের ইতিহাসও বীরের ইতিহাস। দেশকে ভালবেসে কত মানুষ যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, এমনকী জীবনও। ভগবান বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথকে তো সারা পৃথিবীতে চেনে। তারপর আমরা গর্ব করি আমাদের ভাষা নিয়ে। আমরা বাঙালি। বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা। মাত্র হাজার বছর আমাদের সাহিত্যের বয়স। কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে এই ভাষায়। প্রতিবেশী বাংলাদেশ তো বাংলাভাষাকে নিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রই গড়ে ফেলল।

এইসব নিয়ে আমাদের আত্মমর্যাদা বোধ গড়ে উঠেছে।

তবে মনে রাখতে হবে আত্মমর্যাদা ও অহংকারের মধ্যে যে সরু দেওয়ালটি আছে সেটা যেন কোনওমতেই ভেঙে না যায়।

এই ফারাকটা একটু দেখিয়ে দেওয়া যাক।

আত্মমর্যাদাবোধ	অহংকার
* আমি বাঙালি, বাংলাভাষাকে ভালবাসি। তাই বাড়িতে বাংলাতেই কথা বলি। বাঙালি আদবকায়দা মেনে চলি।	আমি ইংলিশ মিডিয়মের ছাত্র। বাংলা পড়ে গরিব ও গাঁয়ের ছেলেরা। আমাকে আমাদের সমাজের উপযোগী হতে হবে। ইংরেজিতেই আমি সবার সঙ্গে কথা বলব।
* আমার বাবা-মা আমাকে কষ্ট করে মানুষ করেছেন। তাঁদের মনে ব্যথা দিয়ে কোনওও কাজ করব না।	আমার বাবার টাকার অভাব নেই। মাস্টারমশাই যদি বাড়ি এসে পড়াতে রাজি না থাকেন আমি অন্য মাস্টার দেখব। টাকা ছড়ালে প্রাইভেট টিউটরের অভাব হবে না।
* আমার বন্ধু বিমানের মা আমাকে অনেকবার নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন। আমারও উচিত তাকে নেমন্তন্ন করা।	আমার বাবা মন্ত্রী বলে বিমানের মা আমাকে হাতে রাখবার জন্য এত খাতির করেন। আমি তাঁকে পান্টা খাওয়াতে যাব কোনও দুঃখে?

* আমার ধর্ম কোনও ধর্মের চেয়ে খারাপ নয়।	আমার ধর্ম পৃথিবীর সবধর্মের সেরা। যতদিন না পৃথিবীর সমস্ত লোককে আমরা আমাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারব ততদিন আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে।
* আমার ভাষা আমার অস্তিত্ব। এই ভাষার মর্যাদা আমি রক্ষা করব।	যারা অন্যভাষী তারা আমাদের শত্রু। আমাদের রাজ্যে অন্যভাষীদের জায়গা নেই। তাদের হঠাতে হবে।

আত্মমর্যাদাবোধ কীভাবে অর্জন করা যায়?

পরিবারের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে।

* জাতীয় হিরোদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে। যেমন গান্ধীজী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখের জীবনাদর্শ গ্রহণ করলে।

* দেশকে ভালবাসলে।

* ধর্ম ভাষা জাতপাত ও অর্থের ভিত্তিতে মানুষের বিচার না করে মানবতার নিরিখে মানুষের নব মূল্যায়ন করলে।

* অপরকে হেয় প্রতিপন্ন না করে।

* বিপন্ন মানুষকে যথাসম্ভব সাহায্য করে।

* মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে।

* শারীরিক শক্তি বাড়িয়ে।

* ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বাড়িয়ে।

* পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে। পরীক্ষায় ভাল ফল করে।

* মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা বিনয়ের দ্বারা কর্তব্য পরায়ণতার দ্বারা নিজেকে শুধরে নিলে।

আত্মধৃতি বা self concept উজ্জ্বল করবে কীভাবে?

তোমার নিজের সম্পর্কে যতক্ষণ না ইতিবাচক বা Positive ধারণা করতে পারছ ততক্ষণ তুমি কিছুতেই সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

নিজের আত্মধৃতি কেমন তার জন্য একটা পরীক্ষা করো।

খালি গায়ে আয়নার সামনে দাঁড়াও। এবার দেখা তোমার দেহটি সুঠাম কি না। তুমি কালো, শ্যামবর্ণ বা ফর্সা যা কিছু হতে পারো। তোমার নাক খ্যাঁদা, চোখ ছোট, কান লম্বা হতে পারে। এসবই তোমার জন্মগত। এর পিছনে তোমার হাত নেই।

তুমি শুধু দ্যাখো, তোমার পেটের তুলনায় বুকটা চওড়া কি না। তলপেটে চর্বি জমছে কি না। না ও হাতের পেশী খুব সরু কি না। তোমার মুখ জুড়ে প্রসন্নতা আছে কি না।

তোমার দেহে কোনও চর্মরোগ আছে কি না। চোখের দৃষ্টি চশমা নেওয়ার

পরও ঠিক আছে কি না। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে কি না। উচ্চতা অনুসারে ওজন ঠিকঠাক আছে কি না।

চর্মরোগ থাকলে, দাঁতের অসুখ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নাও। চোখে দেখার অসুবিধা হলে চোখের ডাক্তার দেখাও। দেহকে সুঠাম করতে গেলে নিয়মিত যোগব্যায়াম করতে হবে। যারা খুব রোগা, ওজন কম তাদের খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। যাদের ওজন বেশি তাদের নিয়মিত স্কিপিং বা ছোটছুটি করতে হবে। চর্বি ও শর্করাজাতীয় খাদ্য খাওয়া কমাতে হবে।

দেহের স্বাস্থ্যঘটিত যা কিছু ত্রুটি তা সারানো তোমার হাতে। কিন্তু দোহাই লম্বা হবার জন্য হাতুড়েদের পরামর্শে ওষুধ খেতে যেও না। ফর্সা হবার জন্য ক্রিম বা পাউডার ঘষে হাস্যস্পদ হয়ো না। ভারতবর্ষের ৯০ শতাংশ লোক কালো। সেটা তাদের অপরাধ নয়। ভারতীয়রা এক মিশ্র জাতি। তাই কেউ ফর্সা, কেউ কালো, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কারও নাক বোঁচা, চোখ ছোট। এর পিছনে কারও হাত নেই। নিজের যা চেহারা আছে তাকে মেনে নিয়ে দেহটিকে সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান করে তোল। অসুখ-বিসুখ থেকে সতর্ক থাকো। সুঠাম দেহ হল যাকে বলে গুড ফিগার আর লেখাপড়া ভাল করে করলে, মনের মধ্যে উদ্বেগ পুষে রেখে না দিলে মুখে চোখে প্রসন্নতা ফুটে উঠবে। সামাজিক হও। ভাল কথা বলতে শেখো। দেখবে নিজের ছবিটা তোমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যার কাছে যাবে সেই বলবে, বাঃ ছেলেটি তো বেশ সপ্রতিভ। তোমার নামটা কী ভাই? অথবা তোমার নামটা কী বোন। তোমার নিজের কাছে তোমার ছবি যত উজ্জ্বলতর হবে তোমার আত্মমর্যাদাবোধ তত প্রখর হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর এর ফলে তুমি পড়াশোনায় ক্রমশ ভাল হয়ে উঠবে।

পড়াশোনায় ভাল হতে চাও তো আত্মধৃতি উজ্জ্বল করো। আত্মবিশ্বাস বাড়তি।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে আত্মধৃতি

ছাত্রজীবনে আত্মধৃতি অনেকটাই নির্ভর করে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টের ওপর। আমাদের সামাজিক পরিবেশে অভিভাবকদের ধারণার ওপরেও আত্মধৃতি নির্ভর করে।

আমি অঙ্কে ভাল ছিলাম না। কিন্তু বাংলায় ভাল ছিলাম। কিন্তু সমাজের লোকদের ধারণা বাংলা পড়ে কিস্যু হয় না। একারণে আমার আত্মধৃতি খুব নীচের দিকে ছিল। কিন্তু এই বাংলায় ভাল হওয়ার জন্য আমি জীবনে যা অর্থ উপার্জন করেছি তা একজন গড় ইঞ্জিনিয়র বা বিজ্ঞানীর আয়ের চেয়ে কম নয়। বাংলায় লিখে আমার চেয়ে পাঁচগুণ টাকা রোজগার করছেন অনেক লোক। আবার বাবামায়ের কথামতো ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে খুব বেশি সফল হতে পারেননি অনেকে। আত্মধৃতি উজ্জ্বল করতে গেলে যে বিষয়ে তুমি দড়, সেই বিষয়ে নিজেকে নিবদ্ধ করো। যদি সংস্কৃতে ভাল হও। সংস্কৃত পড়ো। সংস্কৃতে বড় পণ্ডিত হয়ে এখন দেশ-বিদেশে সম্মান পাওয়া যায়। যদি গণিতে অন্তত আশি শতাংশ পাও তবেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার কথা ভাববে।

ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার নৈপুণ্য ও সাংস্কৃতিক নৈপুণ্য বাড়াবার জন্য অনেক শিবির হয়। এইসব শিবিরে সবার সঙ্গে একসঙ্গে থেকে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনের হীনমন্যতা ঘুচে যায়। পড়াশোনায় যারা পিছিয়ে থাকে তারা হয় পড়ে না, না হয় তাদের মাথা নেই। দুটোরই প্রতিবিধান আছে। যে পড়ে না সে আজই আবার মন দিয়ে পড়া শুরু করতে পারে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পড়াশোনা যার মাথায় ঢোকে না তাকে যেভাবে হোক মাধ্যমিকটা অন্তত পাস করতেই হবে। তারপর তাকে ভাবতে হবে কোনও কাজটায় তার আগ্রহ। প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই মনোমতো একটা বিষয় থাকে। কারও প্রবণতা যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা। আমি মাঝে মাঝে দেখি কালিঝুলি মাখা ছেলেরা কেমন অক্লেশে গাড়ি সারিয়ে দিচ্ছে। আমি কি তা পারব? এমনকী, অমর্ত্য সেনও হয়তো পারবেন না। আমার ভাইঝি মন্দাকিনী চমৎকার গান গায়। সে বহু সর্বভারতীয় পুরস্কার পেয়েছে। সে ডাক্তারি ভর্তির পরীক্ষা দিয়েছিল পারেনি। তাতে কী হল! সে গান নিয়ে কলেজে পড়ছে। সে যদি বড় শিল্পী হতে পারে তাহলে একজন সাধারণ ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতি ও যশ পাবে।

তুমি যদি অন্তত একটা বিষয়ে খুব ভাল জানো তাহলে তোমার আত্মসম্মান বোধটি খুব পাকাপোক্ত হয়। আমি খবরের কাগজের সাংবাদিকতার সব কাজ জানি। আমায় কেউ পুরস্কার দিক বা না দিক আমার মধ্যে এই গর্ববোধ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার কখনও মনে হয়নি যে আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, এম.বি.এ. হতে পারলাম না বলে আমার জীবন বৃথা।

আমার ছেলেমেয়ে কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র নয়। আমি তাদের কখনও বলিনি যে একমাত্র ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র ছাড়া জীবন বৃথা। আমি শুধু তাদের বলেছি তোমাদের যে বিষয় ভাল লাগে সেটাই পড় তবে সে বিষয়টিকে ভালবাসবে। জোর করে বিয়ে দিলে যেমন ছেলেমেয়ে সুখী হয় না, তেমনি জোর করে বিষয় চাপিয়ে দিলেও ছেলেমেয়েদের কর্মজীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

এখানে তোমার মতই চূড়ান্ত মত আর তোমার মধ্যেও যদি বিভ্রান্তি থাকে তাহলে কেরিয়র কাউন্সেলরের সঙ্গে কথা বলো।

সারাজীবন আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচো। সম্মানের সঙ্গে বাঁচো।

নিজের কাজ নিজে করো

স্যার আশুতোষ নিজের জুতো নিজে পালিশ করতেন শুনে ওঁর এক ইংরেজ সহকর্মী বলেছিলেন, স্যার আশুতোষ তুমি নাকি নিজেই নিজের জুতো পালিশ করো? স্যার আশুতোষ বলেছিলেন, তুমি কার জুতো পালিশ করো?

নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে লজ্জা তো নেই-ই বরং সেটা গৌরবের। এতে আত্মসম্মানই বাড়ে। কারণ তুমি যত স্বনির্ভর হতে পারবে ততই তোমার মনের উন্নতি ঘটবে। স্বাধীনতার মত মূল্যবান বস্তু আর কিছুই নয়। লেখাপড়া শেখার অন্যতম উদ্দেশ্যই হল তোমরা যাতে প্রত্যেকে উপার্জন করতে সক্ষম হও। একজন

নিরক্ষরকে একটা চিঠি লিখতে বা চিঠি পড়াতে অন্য লোকের কাছে যেতে হয়।

ছোটবেলা থেকেই মানুষের প্রবৃত্তি হল স্বাধীন ভাবে কাজ করা। তুমি যখন ছোট ছিলে বাবা-মা তোমায় হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। কিন্তু তোমার ইচ্ছে হত হাত না ধরে স্বাধীনভাবে হাঁটতে। তোমার কী মনে আছে তোমার কাকু কিংবা মামুর বিয়েতে সবাই যখন খেতে বসেছে তখন তোমার ইচ্ছা হত তুমিও পরিবেশন করো। অন্তত জগে করে জল নিয়ে সবাইকে জল দিতে পারলেই তোমার শান্তি।

ছোটখাটো দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরতা বোধ গড়ে ওঠে। সব ছেলেমেয়েই কিছু না কিছু স্বাধীন দায়িত্ব পালন করতে ভালবাসে। কিন্তু অবস্থাপন্ন অনেক বাবা-মা বিশেষ করে মায়েরা ছেলেমেয়েদের কাজ করতে দিতে চান না। এতে তাদের নাকি পড়ার ক্ষতি হয়।

গ্রামের ছেলেমেয়েরা এদিক থেকে যথেষ্ট স্বনির্ভর। মেয়েরা ছোট থেকে ইস্কুলে যায়। পড়াশোনা করে তেমনি ঘর দোর ফিটফাট রাখে। বাসন মাজে। গরুর পরিচর্যা করে।

ছেলেরা একটু বড় হলে চাষের কাজেও বাবা-মাকে সাহায্য করে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাজার করে, রেশন তোলে। কিন্তু ঘরের ছেলেমেয়েদের কোনও কায়িক শ্রম করতে দেওয়া হয় না। এর ফলে তারা খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে যায়। ছেলেরা অনেকে তবু খেলাধুলো করে কিন্তু অধিকাংশ মেয়ের আউটডোর গেম খেলার কোনও সুযোগই নেই।

ছেলেমেয়েদের এজন্য নিজেদেরই আগ বাড়িয়ে বাড়ির কায়িক শ্রমের কাজ করতে হবে। ঘর দোর ঝাড়পোঁছ, বইপত্তর রোজ গুছিয়ে রাখাও একটা কাজ। মাঝে মাঝে তোমার ঘরের ঝুল ঝাড়া, বাগান করা, কোনও পোষা জন্তু থাকলে তার পরিচর্যা—এমনকী, জলতেষ্টা লাগলে মাকে হুকুম না করে নিজে জল গড়িয়ে খেলে তোমারই উপকার বেশি হবে।

বাড়ির কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন না করলে তোমার পরিবারের সঙ্গে তোমার মমত্ববোধ গড়ে উঠবে না। আজকের ছেলেমেয়েরা সব সার্বজনীন দুর্গাপুজোর প্রতিমার মতো ছাড়া ছাড়া। মা দুর্গা একদিকে, লক্ষ্মী একদিকে, সরস্বতী এক দিকে, কার্তিক গণেশের মধ্যে তো দেখা সাক্ষাৎই নেই।

তা কেন হবে? পরিবার হল রাষ্ট্রের সবচেয়ে ছোট ইউনিট। পরিবারের প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসবে। তোমার বাড়িতে যদি দাদু-দিদা থাকে তবে তুমি ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী। তোমাকে ভালবাসার আর একজন লোক পেলে। যদি কাকা বা জেঠামণি থাকে তাহলেও ভাল। ষোলো বছর বয়সে বাবা তো বড় বন্ধু। কিন্তু আমি দেখেছি এই বয়স থেকেই বাবার সঙ্গে ব্যবধান শুরু হয়। অনেক ছেলে বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে শেখে। গান্ধীজীর শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল স্ব-নির্ভরতা। খাদি গ্রামে গান্ধী আশ্রমে গিয়ে দেখেছি আশ্রমের লোকেরা ভোর চারটে থেকে উঠে আশ্রমের সব কাজ নিজের হাত করছেন।

অতবড় আশ্রমটাকে ফিটফাট রাখছেন আশ্রমিকরাই। এমনকী, তাঁরা পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন।

আত্মনির্ভরতা হল অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া। চাকর-বাকরদের ওপর নির্ভর না করে যে কাজটা নিজে করা যায় সেটা করা। তোমরা বড় হয়ে যদি ইওরোপ আমেরিকায় যাও তাহলে দেখবে সেখানে সব কাজ নিজেকে করতে হচ্ছে। গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে ঘরদোর রঙ করা। ছোটখাটো মেরামত করা, রান্নাবান্না, ডিশধোওয়া সব নিজেদেরই করতে হয়। যদিও নানা ধরনের সহায়ক যন্ত্র বেরিয়েছে তবু মানুষকেই তো সেই সব যন্ত্র চালাতে হয়।

যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁদের কর্মচারীর ওপর নির্ভর করলে চলে না। নিজেকেও সব কাজ জানতে হয়। বুঝতে হয়, যদি কোনও কর্মচারী অনুপস্থিত হয় তাহলে প্রয়োজনে তার কাজটা মালিকই চালিয়ে নিতে পারেন। তা ছাড়া পুরো কাজটা না জানলে কর্মচারীরা তাঁকে ঠকাতে পারে। স্বনির্ভরতা ট্রেনিং ছাত্র অবস্থা থেকেই নিতে হয়।

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের ঘরের কাজ শেখানো হয়। কিন্তু ছেলেদের শেখানো হয় না। মেয়েরা রাঁধতে শেখে অথচ বেশির ভাগ ছেলেই কীভাবে মাছ মাংস বানায় বা ভাত বানায় জানে না। এমনকী, চা বানানোর সাধারণ প্রক্রিয়াও অনেক ছেলের জানা নেই।

তা কেন হবে? আগামী দিনগুলোতে কাজের লোক পাওয়া যাবে না। ছেলেমেয়ে সবাইকে সমানভাবে বাড়ির ঘর-গৃহস্থালির কাজ শিখতে হবে।

শুধু মেয়েদেরই রান্নাঘরে ঠেলে দেওয়া হবে কেন? বাড়িতে অতিথি এলে শুধু মেয়েদের হাত দিয়েই চায়ের ট্রে কেন পাঠানো হবে?

আমার বাড়িতে অতিথি এলে আমি তাদের উচ্ছিষ্ট প্লেট ও চায়ের কাপ নিজেই নিয়ে যাই। কারও ওপর নির্ভর করি না। মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের সময় সবাই বড় বড় কাজের দায়িত্ব হাতে নেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণদের পা ধোয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রমের মর্যাদাকেই সম্মান দেন। এতে তিনি নিজেকে সম্মানিত করেছিলেন।

তেরো

অহংকার থেকে পতন

আত্মবিশ্বাস আর অহংকার যে এক নয় একথা আগে বলেছি। আত্মবিশ্বাস যে কোনও সাধারণ মানুষকে বড় করে আর অহংকার যে কোনওও বড় মানুষকে ও সমূলে ধ্বংস করে।

তুমি যদি ক্লাসের ফার্স্ট বয় হও অথবা ভাল স্পোর্টসম্যান হও, কিংবা ভাল গান করো তাহলে তোমাকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। কেন না, তখন তোমাকে বহু লোকে প্রশংসা করবে আর প্রশংসার ইতিবাচক দিকের মতো একটা নেতিবাচক দিক আছে। প্রশংসা আর হাততালি পেতে পেতে মানুষের ধারণা হয় সে জীবনের চেয়েও বড়। এটা একটা ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধারণা।

প্রথম কথা শ্রেষ্ঠত্ব শব্দটি আপেক্ষিক। গ্রামের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ জেলার মধ্যে তার হয়তো কোনও পজিশন নাও থাকতে পারে। আবার জেলা চ্যাম্পিয়ান রাজ্যস্তরে গিয়ে অনেক পিছনে পড়ে যেতে পারে।

আমি বহু ছেলেমেয়ে দেখেছি গ্রামের ইস্কুলে ফার্স্ট বয় ছিল। কিন্তু শহরে বড় ইস্কুলে এসে একেবারে পাত্তা পেল না। মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করল—প্রায় আশি শতাংশ নম্বর। মনে অহংকার এসে গেল। সবাই তাকে হাততালি দিতে লাগল। তার ধারণা হল যে সত্যি একজন প্রতিভাবান। পড়াশোনায় ঢিলে দিল। হায়ার সেকেন্ডারিতে মাত্র ষাট বাষট্টি পেয়ে পাস করল। অথবা সেকেন্ড ডিভিশন পেল।

সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা কোনোটাকেই জীবনের চিরস্থায়ী ঘটনা বলে মনে করা উচিত নয়। সাফল্য এলে মনে করতে হবে বিরাট চ্যালেঞ্জ এল। চ্যালেঞ্জ হল, সাফল্যকে টিকিয়ে রাখা। তখন স্তাবকতায় গ্যাসবেলুনের মতো ক্রমাগত ফুলে উঠলে চলবে না। কারণ গ্যাস বেশি হলে বেলুনটা ফেটে যাবে অথবা সুতো আলগা হলে আকাশে উড়ে যাবে।

ব্যর্থতা এলেও ভাবতে হবে একটা ব্যর্থতা ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য অভিজ্ঞতার শিক্ষা। একবার আইনস্টাইন বলেছিলেন, তিনি মাত্র শতকরা একটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, তাহলে কী ধরে নেব, আপনি ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ?

আইনস্টাইন জবাব দিয়েছিলেন, তা কেন? ওই নিরানব্বইটি পরীক্ষা আমায় এই অভিজ্ঞতা দিয়েছে যে এইভাবে সফল হওয়া যায় না। তা থেকে অভিজ্ঞতা

সঞ্চয় করেছি বলেই তো শততম ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। তোমরা যখন একটা শক্ত অঙ্ক কষতে বসো, তখন সবাই কি একবারেই অঙ্কটা রাইট করতে পারো? অনেকেই তাদের মতো করে অঙ্কটা কষে দেখো উত্তর মিলছে না। তখন আর একবার কষে দ্যাখো। এইভাবে বারবার করতে করতে অঙ্কটা রাইট হয়। তাহলে কি বলব আগের ভুল অঙ্ক কষার কোনওও দাম নেই? তা কেন? আগের ভুলগুলিই তোমাকে সঠিক পথে নিয়ে গিয়েছে।

ভুল না শোধরানো অপরাধ

ভুল জানা বা ভুল করাটা অপরাধ নয়, কিন্তু কেউ যদি যুক্তি দিয়ে সেই ভুলটা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে তার কথাটা উড়িয়ে দেওয়া ও সেই মত ভুল সংশোধন না করাটাই অপরাধ। নির্বিচারে ও অন্ধভাবে কোনও তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে থাকাটা কুসংস্কার। একটা সময় সাধারণ মানুষ কুসংস্কারের বশে শাস্ত্রকারদের ভুল বিধান ও ব্যাখ্যাকে সত্য বলে আঁকড়ে বসে থাকত। যখন একদল শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষ যুক্তি দিয়ে এই ভুল ভেঙে দিতে গেলেন। তখন লোকে তাঁদের উড়িয়ে দিল। তারপর অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল ওই সব তত্ত্ব ভুল ছিল। কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছা করেই ওইসব ভুল তত্ত্ব প্রচার করে গেছে। সুতরাং ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় নেতারা যা বলে গেছেন সবই ঠিক একথা মনে করার কারণ নেই। আবার তাদের সব কথাই ভুল একথা বলব না। বলব সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করে তবে গ্রহণ করতে। গ্রহণ করতে হবে তা একালের উপযোগী কি না তা বিচার করে।

দেখা গেছে, আগেকার দিনের বৈজ্ঞানিকেরা কিংবা সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকে হাজার হাজার বছর ধরে এমন সব তথ্য প্রচার করে গেছেন, যা পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অথচ তাঁরা সংশোধন করেননি। যেমন ধরো যিশুখ্রিস্টের জন্মের পর ১৭০০ বছর ধরে তখনকার পাদ্রীরা বলতেন কোনও ভারী বস্তু ও হালকা বস্তু দুটো একসঙ্গে ওপর থেকে ফেললে ভারীটা আগে মাটিতে পড়বে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ও গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) প্রমাণ করলেন এ তত্ত্ব ভুল। তাও লোকে বিশ্বাস করে না। শেষে গ্যালিলিও একদিন সবাইকে পিসার হেলানো মিনারের নীচে ডাকলেন। তিনি মিনারে উঠে একটি এক পাউন্ড ভারী বস্তু ও আর একটি ১০০ পাউণ্ড ভারী বস্তু একই সঙ্গে মিনারের ওপর থেকে ফেললেন। দুটোই এক সঙ্গে মাটিতে পড়ল।

এটাই গ্যালিলিওর পেণ্ডুলাম তত্ত্ব। হালকা বা ভারী যাই হোক, সব পেণ্ডুলামই ঠিক একই সময় ধরে দুলবে।

চার্চের পাদ্রীরা যে অশিক্ষিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বহু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা সেই ধারণা নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী বসে থাকতেন। কেউ ধারণা বদলাতে এলে তাঁরা নিজেদের বদ্ধমূল ধারণা যুক্তি তর্ক দিয়ে যাচাই করতে গররাজি ছিলেন। ১৫০ খিস্টাব্দে একজন বৈজ্ঞানিক টলেমি একটি তত্ত্ব প্রচার করেন যার নাম হচ্ছে ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব। পৃথিবীটা মহাবিশ্বের মাঝখানে স্থির

আর সূর্য চারিদিকে ঘুরছে। ষোড়শ বছর ধরে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই এটা বিশ্বাস করত। গ্যালিলিও যখন বললেন, এই তত্ত্ব ভুল। সূর্য নয়, পৃথিবীই ঘুরছে। তখন চার্চের পাদ্রীরা তাঁকে ছ্যা ছ্যা করতে লাগল। বলল, গ্যালিলিও শত শত বছর ধরে প্রচারিত তত্ত্বের উলটোটা বলছেন। গ্যালিলিও ততদিনে টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছেন। তার ভেতর দিয়ে দেখলে সুদূরের গ্রহ-নক্ষত্রকে খুব কাছে দেখায়। এমন অনেক গ্রহতারা আছে যারা আমাদের থেকে এতদূরে যে তাদের খালিচোখে দেখা যায় না। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু চার্চ বলল গ্যালিলিও ডাকিনী বিদ্যা দিয়ে এইসব গ্রহনক্ষত্রকে কাছে এনে দেখাচ্ছেন। ওই বিপজ্জনক লোকটাকে গ্রেফতার করো। গ্যালিলিও তাঁর মতামত প্রচারের অপরাধে বাড়িতে নজরবন্দি হয়ে রইলেন। শেষজীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন।

গ্যালিলিওর প্রতি রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ যে ব্যবহার করেছিল তা তাদের ভুল শিক্ষার ফল। অবশেষে ৩৫০ বছর পরে ১৯৮৩ সালে জন পোপ পল চার্চের ভুল স্বীকার করেন। পোপ পল প্রকাশ্যে স্বীকার করেন গ্যালিলিও ঠিক, চার্চই ভুল ছিল।

অজ্ঞতা ও কুশিক্ষা থেকে লোকে যেমন ভুল করে, তেমনি এক ধরনের ভুল করে অহংকার ও আত্মদর্প থেকে। যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তার পরিণামের কথাও মনে রাখতে হয়।

ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, পরিণাম না ভেবে বলদর্পী সিদ্ধান্ত নেবার ফলে তার প্রতিক্রিয়া কিন্তু মারাত্মক হয়েছে।

যেমন ধরো জাপানের ওপর আমেরিকার পরমাণু বোমাবর্ষণ। তার আগে জাপানের আচমকা পার্ল হারবার আক্রমণ। তোমরা জানো ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় ইওরোপে। একদিকে হিটলারের জার্মানি, মুসোলিনির ইতালি, অন্যদিকে ব্রিটেন রাশিয়া ও ফ্রান্স। এই যুদ্ধের প্রথমদিকে আমেরিকা নিজেদের সরাসরি জড়ায়নি।

কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন তখন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আমেরিকাকে বোঝান যে আপনারা যুদ্ধে না নেমে পড়লে হিটলার সারা দুনিয়া দখল করে নেবে। আমেরিকা তবুও সরাসরি যুদ্ধে নামেনি। কিন্তু মিত্র শক্তিদের যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছে।

ওই বছর ৭ ডিসেম্বর জাপান হাওয়াই দ্বীপের আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজের পোতাশ্রয় পার্ল হারবারের ওপর আচমকা আক্রমণ চালায়। এতে প্রচুর লোক মারা যায়। আমি হাওয়াই গিয়ে পার্লহারবার বন্দর দেখে এসেছি ও পার্লহারবার আক্রমণের একটি তথ্যচিত্রও আমি দেখি। এইবার আমেরিকা সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়ে। আমেরিকা জাপান আক্রমণ করে। প্রায় দুবছর ধরে যুদ্ধ করেও আমেরিকা কিছুতেই জাপানের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছিল না। ইওরোপের যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ায়। জাপান এশিয়ার অনেকগুলি দেশ দখল করে নেয়।

অবশেষে ইওরোপে বার্লিনের পতন হয় অর্থাৎ হেরে যায় জার্মানি। সেখানে যুদ্ধ শেষ হলেও যুদ্ধ চলতে থাকে এশিয়ায়। আমেরিকা সে সময় গোপনে তৈরি

করছিল পরমাণু বোমা। তাড়াতাড়ি যুদ্ধ থামানোর জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাপানের ওপর এই পরমাণু বোমা ফেলার আদেশ দেন। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকির ওপর আমেরিকার ফেলে পরমাণু বোমা। তার ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করে বটে কিন্তু পরমাণু বোমার প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়াবহ।

জাপানও ভুল করেছিল

ঐতিহাসিকরা বলেন, জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ ছিল একটা বিরাট ভুল। কারণ তা নাহলে আমেরিকা দ্বিতীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত না। হিরোসিমা নাগাসাকির ওপর আণব বোমাও পড়ত না। পরমাণু বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করে দেয় আমেরিকা। তার ফলে আজ পৃথিবীর ছটি দেশ আরও বিধ্বংসী পরমাণু বোমা তৈরি করেছে। ভারত ও পাকিস্তানের মতো গরিব দেশও পরমাণু বোমা তৈরি করে পরস্পরকে ভয় দেখাচ্ছে। এর সূচনা কিন্তু সেই ১৯৪৫ সালে।

জাপান এক সময় ভুল করেছিল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের নেশায় মেতে উঠে। ক্ষমতার দম্ভে মেতে উঠে সে দুর্বল প্রতিবেশীদের উপর আক্রমণ চালায়। ১৮৭৪ সালে সে চীনের হাত থেকে ফরমোজা কেড়ে নেয়। ১৯০৪ সালে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোরিয়ার ওপর তার প্রভুত্ব কায়েম করে। দখল করে মাঞ্চুরিয়া। ১৯১০ সালে কোরিয়া পুরোপুরি জাপানের দখলে আসে।

১৯১৪ সালে জাপান প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেয়। সে তখন ছিল জার্মানির বিরুদ্ধে ও ব্রিটেনের পক্ষে। এর বিনিময়ে সে চীনের ওপর অনেকটা প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে দেখে জার্মানির কাছে ফ্রান্স ও হল্যান্ড হেরে গেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এই দুই দেশের উপনিবেশগুলির টালমাটাল অবস্থা। এই সুযোগে যদি দেশগুলি দখল করা যায়। এই মনে করে ১৯৪১ সালে সে যুদ্ধে নেমে পড়ে। যুগপৎ ফিলিপিনস, মালয় দখল করে সেখানে যুদ্ধবন্দিদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। জাপানি সৈন্য আন্দামানও দখল করে নিয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল আজাদহিন্দ ফৌজও, কিন্তু তাদের খুব বেশি জোর খাটাবার উপায় ছিল না। আমি একাধিকবার আন্দামানে গিয়ে পুরনো অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। নিষ্ঠুরতায় জাপানি সৈন্যদের আর জুড়ি ছিল না।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এই জাপানকে এর জন্য কী মূল্যই না দিতে হয়েছে।

হিরোসিমা ও নাগাসাকি জাপানের দুটি ছোট ছোট শহরে। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকালে হিরোশিমার ওপর আমেরিকার বোমারু বিমান B29 এনোল গে লিটল বয় নামে ইউরেনিয়ম বোমাটি ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ১৩ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে যা ছিল সব ধ্বংস হয়ে যায়। মারা যায় ৭০ হাজার লোক। তার তিনদিন পরে নাগাসাকি শহরের ওপর ফেলা হয় আর একটি প্লুটোনিয়ম বোমা। এই শহরেও মারা যায় আরও লাখখানেক লোক। কিন্তু যারা বেঁচে থাকল তারা তেজস্ক্রিয়ায় বিকলাঙ্গ হয়ে গেল।

যুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পরাজিত জার্মানিকে যেমন ব্রিটেন-ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া ভাগাভাগি করে নিয়েছিল তেমনি জাপানকে আমেরিকা তাদের অধীনে প্রায় এক যুগ ধরে রেখে দিয়েছিল।

অতি অহংকারের ফলে জাপানের এই পতন। এরপর প্রচণ্ড অপমানের মধ্যে জাপানের যুদ্ধোত্তর প্রজন্ম বুঝতে পারে আর যুদ্ধ নয়, আক্রমণ নয়, শান্তির পথেই দেশ গড়া যায়। জাপান সেই পথ ধরেই চলছে।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে আমি দশদিনের জন্য জাপানের বিভিন্ন শহর ঘুরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। শিল্পে তার স্থান এখন বিশ্বে তৃতীয়। একটা ছোট দেশ যার লোকসংখ্যা মাত্র এককোটি আর যে দেশের বেশির ভাগটাই পাহাড় পর্বত বন, সেই দেশ এখন একটা ছবির মতো। টোকিও শহরের জনসংখ্যা কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এমন সুন্দরভাবে শহরটি সাজানো, যানবাহন চলাচলের জন্য এত অসংখ্য ফ্লাইওভার যে ভাবাই যায় না এই শহরে এত লোক বাস করে।

এসবই হয়েছে বর্তমান প্রজন্মের জাপানিদের জন্য। কী তাদের বড় হবার মূল কথা? দেশকে ভালবাসা। কঠোর পরিশ্রম, কম কথা কাজ বেশি। জাপানিরা বেশি কথা বলে না। কিন্তু কাজ করে বেশি। আর আছে আত্মসম্মানবোধ। একজন জাপানির আত্মসম্মানবোধ এত প্রখর যে সে যখন মনে করে তার নিজের দোষে তার বা তার পরিবারের সম্মানহানি হয়েছে তখন সে পেটে ছোরা মেরে হারাকিরি করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে সব দেশকে জীবনের বিনিময়ে খেসারত দিতে হয়েছে তারা আজ বুঝতে পেরেছে যুদ্ধ নয় শান্তিই জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু। প্রথম মহাযুদ্ধে কত লোক মারা গিয়েছিল জানো? ১ কোটি ৭০ লক্ষ। আর সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের মৃত্যু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। একা রাশিয়ার ২ কোটি লোক মারা যায়। সৈনিকের চেয়ে সাধারণ লোকের মৃত্যুই ছিল বেশি।

দু-দুটো মহাযুদ্ধের ধ্বংসময় পরিণাম দেখে পরবর্তীকালে অনেক দেশই সতর্ক হয়ে গিয়েছে। তারা আর যুদ্ধ চায় না, তার প্রমাণ ২০০৩ সালে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই সাধারণ মানুষ।

অহংকারী যুদ্ধবাজদের পরিণতি দেখে সব দেশের রাষ্ট্রনায়করা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তা বলা যায় না। যদি এই শিক্ষা তাঁরা গ্রহণ করতেন যে যুদ্ধের দ্বারা বা হিংসার দ্বারা কোনও সমস্যার সমাধান করা যায় না। তাহলে ২০০২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে আত্মঘাতী আঘাত হেনে চারহাজার মানুষের মৃত্যু ঘাটত না সন্ত্রাসবাদীরা।

ভুলের মাশুল দিলেন হিটলার

জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলর অ্যাডলফ হিটলারের কথাই ভাব। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানি হেরে যাবার পর জার্মানির আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। হিটলার ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি যখন ক্ষমতায় এলেন তখন ৬০ লক্ষ জার্মান বেকার।

হিটলারের নেতা হবার মতো যথেষ্ট গুণ ছিল।

হিটলার ছিলেন অতি সাধারণ গরিব ঘরের ছেলে। তাঁর বাবা মুচির কাজ করে জীবিকা শুরু করেন। পরে একটি সরকারি চাকরি পান। হিটলারের ছোটবেলায় লেখাপড়ায় মন ছিল না। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে টেনেটুনে মাধ্যমিকটা পাস করে একটা সরকারি চাকরি জুটিয়ে নিক। হিটলার খুব ভাল ছবি আঁকতেন। তাঁর ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল তিনি শিল্পী হবেন।

হিটলারের যখন ১৪ বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা যান। বাবা মারা যাবার পর হিটলারের মা হিটলার আর তার ছোট বোনকে নিয়ে গ্রামে বাস করতে থাকেন। তাদের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় তবু মা আশা করেছিলেন হিটলার যেমন তেমন করে ইস্কুলের পড়াটা শেষ করে বাবার ইচ্ছামতো সরকারি চাকরি করবেন। কিন্তু হিটলার আর পড়তে চাননি। এই সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এক বছরের জন্য পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়। তারপর আবার ইস্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু রেজাল্ট খুব খারাপ হল। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জ্যামিতি সব বিষয়ে ফেল একমাত্র ছবি আঁকায় খুব ভাল নম্বর পেয়েছেন। হিটলার এতেই খুশি। কারণ ফেল করেছেন, তাই আর পড়তে হবে না। কী মজা! মাধ্যমিক ফেল হিটলার এবার ভবঘুরের মত আজ এখানে কাল সেখানে বেড়িয়ে বেড়ান। আত্মীয়-স্বজনরা বলে, তোর বিধবা মা, ছোটবোনের মুখ চেয়ে কিছু রোজগারের চেষ্টা কর। এভাবে বাউন্ডুলে হয়ে আর কতদিন ঘুরে বেড়াবি। হিটলার এই সব কথা শুনে খুব বিরক্ত হতেন। বাবার পেনশনের সামান্য কটা টাকায় মায়ের সংসার চলে না। ষোলো বছর বয়স থেকে হিটলারের জীবনে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তিনি অপেরা থিয়েটার দেখতে ভালবাসতেন—একটি যাত্রা বা অপেরা দেখে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন আসে। ওই অপেরায় দেখানো হচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু আর বুয়োররা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

রাজনীতি তখন থেকে হিটলারকে আকৃষ্ট করল। এতদিন বই ছিল তাঁর কাছে বিষ। এখন তিনি লাইব্রেরিতে গিয়ে দিনরাত বই পড়তে লাগলেন। বিশেষ করে পড়তে লাগলেন জার্মানির ইতিহাস ও জার্মান পৌরাণিক কাহিনি। এইভাবে বিশ্ব ইতিহাস হিটলারের এমন সড়গড়ে হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তীকালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি তাঁর প্রভূত প্রশংসা করেছেন।

১৯০৭ সালে হিটলার ভিয়েনায় চলে আসেন সেখানকার বিখ্যাত চারুকলা আকাদেমিতে ভর্তি হয়ে ছবি আঁকা শিখবেন বলে। কিন্তু ভর্তির পরীক্ষাতেই তিনি ফেল করেন। পরের বছর তিনি আবার পরীক্ষায় বসেন, এবারও পাস করতে পারেন না। হিটলার খুব দুঃখ পেয়ে আকাদেমির ডাইরেক্টরকে অনুনয় করে চিঠি লেখেন। ডাইরেক্টর উত্তরে লেখেন, তোমার পক্ষে চিত্রশিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। তুমি বরং আর্কিটেকচার পড়ো।

কিন্তু আর্টিটেকচার পড়তে গেলে মাধ্যমিক পাস করতে হবে। হিটলার তো মাধ্যমিক পাস করেননি। তাই তাঁর আর্কিটেক্ট হওয়া হল না।

এর মধ্যে মায়ের মৃত্যু হল। ১৮ বছর বয়স তখন হিটলারের। মা-বাবা যেতে

হিটলারের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। হিটলারের তখন দুবেলা খাবার জুটছে না। হিটলার চলে এলেন ভিয়েনায়। অস্ট্রিয়ার পথে পথে ঘুরছেন। পার্কে রাত কাটাচ্ছেন। মাঝে মাঝে পুলিশে ধরছে। হাজতে পুরে দিচ্ছে। ভবঘুরেদের নিয়ে পুলিশ যা করে তাই আর কি।

হিটলার ফুটপাতে হকারি করতেন

জীবনযাপনের জন্য হিটলার বাধ্য হলেন রাস্তায় বরফ পরিষ্কার করার ঠিকা মজুরের কাজ নিতে। কখনও কার্পেট বিক্রি করতেন ফুটপাতে বসে। কখনও রাজমিস্ত্রিদের জোগাড়ের কাজ করতেন। একবছর ধরে চেষ্টা করেও তিনি একটা পাকা চাকরির ব্যবস্থা করে উঠতে পারলেন না। হিটলারের তখন দৈন্যদশা। পরনে ছেঁড়া প্যান্ট, একমাথা লম্বা চুল, আজ এখানে, কাল সেখানে। কাল কী খাবেন জানেন না। তবে এই চরম দুরবস্থার মধ্যেও হিটলারের মধ্যে ছিল গভীর আত্মবিশ্বাস। তিনি নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতেন। একজন শিল্পীর মতো তার ছিল গভীর আত্মমর্যাদাবোধ। শেষে এক চিত্রশিল্পী বন্ধুর সঙ্গে মিলে হিটলার দ্রুত পয়সা রোজগারের ধান্ধায় ভাল ভাল চিত্রশিল্পীর ছবির নকল করে বিক্রি করতে লাগলেন। কিন্তু সে টাকাটাও তাঁর শিল্পীবন্ধু আত্মসাৎ করে। এরপর হিটলার একটি ট্রেড ইউনিয়নে চাকরি নিলেন। কিন্তু তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন রাজনীতিতে। তিনি এমনিতে লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলেই বেশ জোরের সঙ্গে গুছিয়ে বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেন।

অস্ট্রিয়ায় তখন তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল : সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, প্যান জার্মান ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও খ্রিস্টান সোস্যালিস্ট পার্টি। হিটলার সব দলের কাজকর্ম যথেষ্ট খতিয়ে দেখতেন।

অস্ট্রিয়ার অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল জার্মান। কিন্তু অস্ট্রিয়া হাপসবুর্গ সম্রাটের অধীনে। হিটলার চেয়েছিলেন, হাপসবুর্গ সম্রাটকে হটিয়ে দুই দেশের জার্মানভাষীদের নিয়ে এক অখণ্ড জার্মানি।

পেটের দায়ে হিটলারকে মজুরের কাজ নিতে হয়েছিল। তিনি শহরের জঞ্জাল সাফ করার কাজ করতেন। সে সময় মজুরদের শক্তিশালী ইউনিয়ন ছিল সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন। তারা হিটলারকে নানাভাবে টোপ দিতে লাগল তাদের ইউনিয়নে যোগ দেবার জন্য। কিন্তু হিটলার রাজি হলেন না। একদিন তারা ভয় দেখাল, তাদের ইউনিয়নের সদস্য না-হলে হিটলারকে তারা লাথি মেরে দোতলা থেকে নীচে ফেলে দেবে। হিটলার চাকরি ছেড়ে দিলেন, তবু তাঁর মতাদর্শের বাইরে ইউনিয়নে যোগ দিলেন না।

এবার তিনি রেল স্টেশনে কুলির কাজ নিলেন। যাত্রীদের মোট বইতেন। কিন্তু সবদিন ভাল রোজগার হত না।

দুঃখের মধ্যেও হিটলার ভেঙে পড়েননি। বরং তাঁর আত্মজীবনী মেইন ক্যাম্ফ বইতে তিনি লিখেছেন আমাকে দুঃখ দুর্দশা ও দারিদ্র্যের পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে

দেওয়া হয়েছে বলে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ আমি এর ফলে এই সমস্ত মানুষকে বুঝতে পারলাম। এদের জন্যই আমার লড়াই ছিল পরের যুগে।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর দুবছর আগে হিটলার ভিয়েনা ছেড়ে জার্মানির মিউনিখ শহরে চলে আসেন। এখানে এসেও তিনি একটা চাকরি জোটাতে পারলেন না। তাই তিনি একটা ছোটখাটো ফোটোর দোকান খুলে বসলেন। ছবি এঁকেও সামান্য আয় হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজনের সারা মাস চালাবার খরচ উঠত না। পরে তিনি ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করতে থাকেন। তবু অভাবের মধ্যে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯১৩ সালে আর কিছু উপায় খুঁজে না-পেয়ে হিটলার সেনাবিভাগে ভর্তি হতে গেলেন। কিন্তু এখানেও তিনি মেডিকেল টেস্টে পাস করতে পারলেন না। ডাক্তার বলল, ছেলেটি শারীরিকভাবে দুর্বল।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল, তখন হিটলার বেভেরিয়ার সম্রাটের নামে এক আবেদন পাঠালেন তিনি বেভেরিয়ার সৈন্যদলে যোগ দিতে চান। এবার আবেদন মঞ্জুর হল। হিটলার মিউনিখ ছেড়ে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধে তিনি গোলার আঘাতে আহত হলেন। তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জার্মানিতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল। হাসপাতালে কিছুদিন থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাঁকে বার্লিনে যেতে বলা হল। বার্লিনে এসে হিটলার দেখলেন যুদ্ধের ফলে সারা দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। শত শত নরনারী খাদ্যের অভাবে অনাহার বা অর্ধাহারে রয়েছে। হিটলার বার্লিন থেকে আবার মিউনিখে ফিরলেন। দেশের লোক সৈন্যদেরই দুষতে লাগল। যেন তারাই নাগরিকদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী।

সে সময় জার্মানির বড় বড় সরকারি পদে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহুদিরা ছিল সর্বেসর্বা। ইহুদিরা জার্মানদের তুলনায় পরিশ্রমী, কুশলী, ব্যবসা বুদ্ধি ধরে। তাই তারা খুব ধনী ছিল। তার ফলে জার্মানরা ইহুদিদের দুচোখে দেখতে পারত না। হিটলারও মনে করতেন ইহুদিরা জার্মানির ভাল চায় না। তারা শুধু নিজেদেরই ভাল চায়। দেশ জোড়া ইহুদি বিদ্বেষের স্রোতে হিটলার নিজেকে মিশিয়ে দিলেন।

এ পর্যন্ত আমি দেখালাম হিটলারের জীবনে অসাধারণ গুণগুলি। তাঁর কঠোর জীবন-সংগ্রাম। এত কষ্টের মধ্যেও অবিচল থাকা, ফুটপাতে থেকেও চোর-ডাকাত না হয়ে বরং একজন প্রকৃত বিদ্বান হবার চেষ্টা করা, নৈতিক সততা।

কিন্তু এত গুণের মধ্যেও তিনি একের পর এক ভুলের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেন। প্রথম ভুলটা হয়েছিল ইস্কুলে মন দিয়ে লেখাপড়া না করা। ইস্কুলের পড়া শেষ না করায় তিনি কোনও ভদ্র চাকরি জোটাতে পারেননি। এ ভুল তিনি স্বীকার করে পরবর্তীকালে নিজে লাইব্রেরিতে বসে অগাধ পড়াশোনা করেছেন।

তাঁর দ্বিতীয় ভুল ইহুদি বিদ্বেষ। আর সাধারণ জার্মানদের মতো তাঁর মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও ইতিহাস পড়া মানুষের কখনও নেতিবাচক চিন্তা করা উচিত হয়নি। অর্থাৎ তাঁর এই বিদ্বেষকে মূলধন করে পরবর্তীকালে তিনি নৃশংসভাবে হাজার হাজার ইহুদিকে খুন করেছেন। তাঁর আরও ভুলের কথায় পরে আসছি। তার আগে কী করে সামান্য একজন সৈনিক থেকে তিনি জার্মানির হর্তাকর্তা বিধাতা হলেন সে কথা বলি।

প্রথম মহাযুদ্ধে তো চলছে। হিটলার আবার রণক্ষেত্রে। এবার বোমার আঘাতে

আবার আহত হলেন হিটলার। এবার চোখ দুটো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনওক্রমে এ-যাত্রা উদ্ধার পেলেন। হিটলার পড়ে রইলেন হাসপাতালে।

জার্মানির মানুষ প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির জড়িয়ে পড়া মেনে নেয়নি। দেশজুড়ে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এমনকী, অস্ত্রকারখানার কর্মীরা ধর্মঘট করেছিল। নৌসেনারা বিদ্রোহ করেছিল। এমনকী, যুদ্ধরত সৈন্যরাও পরে আত্মসমর্পণ করার জন্য মুখিয়ে ছিল। এইসব অবস্থা সৃষ্টির পিছনে হিটলার ইহুদিদের উস্কানি দেখেছিলেন। অবশেষে জার্মানি আত্মসমর্পণ করল। (১৯১৮) সম্রাট কাইজার দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। রাজতন্ত্রের পতন হল। খুব অপমানজনক শর্ত জার্মানিকে মেনে নিতে হয়েছিল। এর নাম ছিল ভার্সাই এর সন্ধি (জানুয়ারি ১৯১৯)। এর প্রথম শর্তটাই ছিল জার্মানিকে ২৭০০০ বর্গ মাইল এলাকার বিশাল ভূখণ্ড ফ্রান্স ও পোলান্ডকে দিয়ে দিতে হবে। জার্মানির সৈন্য সংখ্যা একলক্ষের বেশি রাখা যাবে না। তা বাদে জার্মানিকে ১৩৩২ কোটি মার্ক (জার্মান মুদ্রা) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বিজেতাদের। এই অপমানজনক শর্ত চাপিয়ে দেওয়াটা ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পক্ষে ভুল হয়েছিল। কারণ এর ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে হিটলারের ক্ষমতায় আসতে সুবিধা হয়। দ্বিতীয়, জার্মানদের ইহুদি বিদ্বেষকেও হিটলার কাজে লাগিয়েছিলেন।

হিটলার ক্ষমতায় এসেছিলেন একরকম দৈববশেই। যুদ্ধের পর মিউনিখে সেনাবাহিনীর ইনস্ট্রাক্টর পদে হিটলারকে নিয়োগ করা হল। হিটলার জার্মান সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে তাদের মন জয় করলেন।

একদিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে নির্দেশ দিলেন মিউনিখে একটি রাজনৈতিক দলের অধিবেশন হবে। হিটলার ওই অধিবেশনে যোগ দিয়ে যেন সরকারকে একটি গোপন রিপোর্ট দেন। রাজনৈতিক দলটির নাম জার্মান ওয়ার্কাস পার্টি। ওই পার্টির মাত্র ছজন সদস্য। হিটলারকে পেয়ে তাঁরা ভাবলেন উনি বুঝি তাঁদের এক নতুন সমর্থক। তাঁরা হিটলারকে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করলেন। হিটলার সেখানে এমন একটি বক্তৃতা দিলেন যাতে সবাই খুব আকৃষ্ট হল। এরপর হিটলার একটি চিঠি পেলেন—জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ হিটলারকে তাদের সদস্য হতে অনুরোধ জানিয়েছে। হিটলারকে শ্রমিক সংঘের পরবর্তীসভায় যোগ দিতে অনুরোধ জানানো হল। মিউনিখের এক অন্ধকার শুঁড়িখানায় পাঁচজন লোক বসেছিল। সেটাই তাঁদের বার্ষিক সভা। কীভাবে জার্মানিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার আলোচনা। অনেক বড় বড় কথা। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আর হিটলারকে নিয়ে উপস্থিতির সংখ্যা সাত জন। তহবিলে সাকুল্যে পড়ে আছে ত্রিশ টাকা।

হিটলার এই সংস্থার সপ্তম সদস্য হলেন। তিনি বুঝেছিলেন বড় পার্টিতে তিনি পাত্তা পাবেন না। তাই তিনি ছোট দলেই যোগ দেওয়া মনস্থ করলেন।

একবছরের মধ্যে হিটলার এই ছোট্ট পার্টির নাম পরিবর্তন করে নাম দিলেন ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি বা নাৎসি পার্টি। বাংলায় নাজি পার্টি

এর উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম যা ঘোষণা করা হল তা সাম্প্রদায়িক। জার্মান ছাড়া অন্যদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার কথা প্রকাশ্যে বলা হল। বলা হল

জার্মানি শুধু জার্মান রক্তের মানুষদের জন্য। হিটলারের নীতি হল হিংসাকে হিংসা দিয়ে রুখতে হবে। হিটলারের সঙ্গে প্রথম লড়াই শুরু হল কমিউনিস্টদের। কারণ, তারাও হিংসায় বিশ্বাস করে। নাজিপার্টির সভা পণ্ড করে দেবার জন্য হামলা চালায়। নাজি পার্টির লোকেরাও পালটা হামলা করে। শেষমেশ গায়ের জোরে বেভেরিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করতে গেলে হিটলার গ্রেফতার হন। তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জেলে বসে তিনি একটি আত্মজীবনী লেখেন। এক বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন তাঁর নাৎসি দল নিষিদ্ধ হয়েছে। তাঁর দলের অনেক নেতা পলাতক। হিটলারকে জার্মানি ছেড়ে অস্ট্রিয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়।

১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে জার্মানি যুদ্ধের খেসারত দিতে গিয়ে খুব আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। তখন লোকজন বলতে থাকে সাধারণতন্ত্রই তাদের এই সর্বনাশ করল। সৈন্যবাহিনী নাৎসিদের প্রকাশ্যে সমর্থন করতে থাকে। প্রবল জনসমর্থনের চাপে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ নাৎসি দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। অবশেষে ১৯৩০ সালের রাইখের নির্বাচনে নাৎসিরা অংশগ্রহণ করল। নাৎসিরা প্রায় ৬০ লক্ষ ভোট পেল। এরপরে ১৯৩২ সালের নির্বাচনে হিটলার বিপুল ভোটে রাইখের (জার্মান সংসদের) সদস্য নির্বাচিত হলেন। জার্মান ন্যাশনাল পার্টির সঙ্গে মিলে ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি হিটলার হলেন জার্মানির প্রধানমন্ত্রী তথা চ্যান্সেলার।

এরপরের ইতিহাস এক কলঙ্কিত অধ্যায়। একজন সংগ্রামী মানুষ, বিদ্বান ও ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এক নেতা জার্মানি তথা বিশ্বের অনেক উপকার করতে পারতেন। কিন্তু ক্ষমতায় উঠে তিনি একটার পর একটা ভুল করে সমূলে ধ্বংস হয়ে গেলেন। হিটলার জীবনী কাহিনী তোমাদের কাছে সংক্ষেপে তুলে ধরার অর্থ এই যে ভুলের মাশুল প্রতিটি মানুষকেই দিতে হয়। একজন আদর্শ চরিত্রের মানুষও সতর্কভাবে না চললে সে একটার পর একটা ভুল করে বসে। সে ক্ষমতালিপ্সু দাম্ভিক ও অহংকারী হয়ে ওঠে। আর দম্ভই তার পতন ডেকে আনে।

ক্ষমতায় এসে হিটলার জার্মানির আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকলক্ষ ইহুদিকে তিনি হত্যা করেন। ইহুদি শিশুদের গ্যাসচেম্বারে পাঠান। যুদ্ধজয়ের নেশায় মেতে উঠে তিনি পোলান্ড আক্রমণ করে পোলান্ড দখল করে নেন ও সেখানকার ইহুদিদের নির্মূল করেন। তাঁর আর একটা বড় ভুল সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ। দীর্ঘপথযাত্রায় রাশিয়ার প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আর সুশিক্ষিত রুশ সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবিলায় জার্মান সৈন্যরা ধ্বংস হয়ে যায়।

হিটলার কেন, হিটলারের বলদর্পী সাকরেদরাও ভুলের মাশুল দিয়ে গেছে জীবন দিয়ে। এঁদের অনেককে হিটলারই মেরে ফেলেন। কেউ আত্মহত্যা করেন। যুদ্ধের পর নুরেনবার্গ বিচারে কারও ফাঁসি হয়। কারও দীর্ঘ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হিটলার নিজে আত্মহত্যা করেন। ক্ষমতার অপব্যবহার যেসব রাষ্ট্রনায়করা করেছেন ইতিহাস তাঁদের কলঙ্কিত নায়ক বলে আখ্যা দিয়েছে। তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও যারা অন্যায় করে গেছে তারাও সমাজের কাছে খারাপ লোক বলেই চিহ্নিত হয়েছে।

চোদ্দ

তোমার চলার পথের কিছু রসদ

সব তো বুঝলাম স্যার
পরীক্ষা পাস করব কী করে?

যা নেই পরীক্ষায় তা নেই অপেক্ষায়। ছন্দ না-মানা কবিতার মতো এই লাইনটি আমারই বানানো। অসম ও পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে আমার এই ধারণা হয়েছে এখন ছাত্ররা পরীক্ষার জন্য যা ইমপর্ট্যান্ট তাই জানতে চায়। জীবনের জন্য যা ইম্পর্ট্যান্ট তা জানার আগ্রহ নেই।

তারা অত ভাবেটাবে না। পড়ছি চাকরি পাবার জন্য। একবার চাকরিটা পেয়ে গেলে আর কে পড়ে। চাকরির জন্য পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাস করতে হয়। কী করে চটজলদি ভাল নম্বর তোলা যায় তা বলুন। না বলতে পারলে ছেড়ে দিন। আমার অনেক কাজ। ইস্কুল, কোচিং ক্লাস বা টিউটোরিয়াল, টেলিভিশনে সিরিয়াল, সিনেমা ও নাচগান দেখা, পারলে এফ. এম. শোনা। এদিক ওদিক ফাংশন, আড্ডা, ঘুম। কাজের কী অভাব আছে স্যার। সে সব কাজ ফেলে আপনার জ্ঞানের বই পড়ার ধৈর্য আমার নেই। টিপস থাকে তো ছাড়ুন— কেমন করে শর্টকাটে পরীক্ষা পাস করা যায়। বেশ তাই হবে। পরীক্ষায় পাসের কথা লিখেই আমার কথা শেষ করব। তবে সেইসঙ্গে এই কথাই বলব, পরীক্ষা পাস সবচেয়ে সোজা। কিন্তু জীবনের নানা পরীক্ষায় পাস করাটাই কঠিন। সেখানে পাঁচ শতাংশ পাস করে। অথচ সে পরীক্ষায় একটু তৎপর হলে সেন্ট পার্সেন্টই পাস করতে পারে। সব পরীক্ষারই সিলেবাস থাকে। এতক্ষণ ধরে যা লিখলাম তা জীবনের পরীক্ষার সিলেবাস। যারা এই সিলেবাসে তেমন আমল দিচ্ছে না বড় হয়ে বুঝবে আমি ঠিক বলেছি কি বলিনি।

সে যাক পরীক্ষা আর পড়াশোনা নিয়েই তা হলে শেষমেশ বলি। পরীক্ষায় পাস করতে গেলে পড়তে হবে। তুমি বলবে ও তো বাবা-মা মাস্টারমশাই সবাই বলেন। ও আর নতুন কথা কী? নতুন কথাটা হল কেমন করে পড়তে হবে তার বিজ্ঞানসম্মত উপায়।

কেমন ভাবে পড়তে হয়

ফ্রান্সিস কেসি ইংলন্ডের সাসেক্সের একটি হাইস্কুলের ডেপুটি হেডমাস্টারমশাই। কীভাবে পড়লে সহজে মনে থাকে ও ভালভাবে বোঝা যায় সে সম্পর্কে তিনি

একটি বই লিখেছেন। তাতে তিনি পড়ার অনেকগুলি পদ্ধতির কথা বলেছেন।

* যে বইটি পড়বে আগে বইটির ভূমিকা পড়ে নেবে। তাতে বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা হবে।

* লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী আগে পড়ে নেবে।

* নোট বই-এর বদলে সব সময় টেক্সট বই পড়বে। বইটির সূচিপত্র ভাল করে পড়ে নেবে। প্রতিটি পরিচ্ছেদ পড়ার সময় শুরুর প্যারাগ্রাফ ও শেষের প্যারাগ্রাফ আগে পড়ে নেবে।

* বই পড়ার সময় ইমপর্ট্যান্ট প্যারাগুলির নিচে লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে নেবে। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্যারার মার্জিনে লিখে রাখবে।

প্রথমে জোরে একবার রিডিং পড়ে নেবে। তারপর আবার ধীরে ধীরে পড়বে। এবারের পড়াটা হবে প্যারাগ্রাফ ধরে পড়া। তারপরে পড়বে শব্দ ধরে ধরে।

* স্পিড রিডিং আর স্লো রিডিং দুরকম রিডিং আছে। স্পিড রিডিং হল অন্তত ঘণ্টায় ৩০০ থেকে ৪০০ শব্দ পড়া।

এটা করতে গেলে প্রথমে ৩০০ শব্দ গুণে সে জায়গাটা দাগ দাও। তারপর ঘড়ি ধরে পড়তে শুরু কর। দেখো এক মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারছ কি না। না পারলে পড়ার গতি বাড়াতে থাকো।

* পড়ার সময় দুচোখ দিয়ে পাতাটা দেখবে। এতে দেখবে একসঙ্গে গোটা লাইনটা দেখতে পাচ্ছ।

ধীরে পড়া

ধীরে পড়ার আর এক নাম আনন্দের জন্য পড়া। যখন নামী লেখকের কোনও বই পড়ার যেমন শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বই পড়বে তখন এমন ধীরে ধীরে শব্দ ধরে ধরে পড়বে এবং শব্দের বানানও পড়বে।

কীভাবে পড়ব?

আমার কাছে অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসেন সাধারণত পড়াশোনার সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য। এঁদের মধ্যে দুধরনের ছেলেমেয়ে দেখতে পাই। এক, যারা পড়াশোনায় ভীষণ অমনোযোগী। দুই, যারা সিরিয়াসলি পড়ে বটে কিন্তু পরীক্ষার আগে নার্ভাস হয়ে পড়ে। নার্ভাসনেস থেকে নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

আমাদের যে শিক্ষাপদ্ধতি তাতে বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের মাথায় ঢুকল কি না সেটা তেমন দেখা হয় না। দেখা হয় সে তিনঘণ্টার মধ্যে কতগুলি প্রশ্ন বাঁধা গৎ ধরে লিখে দিতে পারছে কি না। এর ফলে না বুঝে মুখস্থ করেও অনেকে পাস করে যায়। আমি যাদের পড়িয়েছি তাদেরই খাতা দেখেছি। দেখেছি, যাদের তেমন জ্ঞানগম্যি জন্মেছে বলে মনে হয়নি তারা আমার হাতেই ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর পেয়েছে। কারণ তারা টু দি পয়েন্ট বই থেকে বা নোট থেকে মুখস্থ লিখে দিয়েছে। এখন যাদের তেমন মুখস্থ হয় না। মুখস্থ হলেও ঝটপট মনে আনতে পারে না।

এটা সাধারণত হয় আমরা শিক্ষক ও অভিভাবকেরা ছাত্রছাত্রীদের মনে বিষয় সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা গড়ে দিতে পারি না বলে।

কোনও বস্তু সম্পর্কে ধারণা শুধু কতগুলি তথ্য জানলেই হয় না। সেই বস্তুটি কেমন সেটা চোখের সামনে দেখাতে হয়।

এজন্য পড়ানোর সময় ম্যাপ, চার্ট, ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানের যত তত্ত্ব পড়ানো হয় ল্যাবে তার পরীক্ষা করার সুযোগ থাকা দরকার।

আবার ম্যাপ চার্টের চেয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ফলে ইতিহাস সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা হয়।

ইস্কুলের নীরব পড়াশোনা পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ থেকে চার্চিল, আইনস্টাইন কারও ভাল লাগেনি। তাঁরা এই প্রথাগত শিক্ষায় খুব ভাল মেধা দেখাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ তো ইস্কুল পালিয়ে বাড়িতে বসেই যত পড়া পড়েছেন। আইনস্টাইনের গণিতে উৎসাহ জন্মিয়ে দেন তাঁর কাকা, জ্যাকব আইনস্টাইন। ভদ্রলোক ছিলেন পেশায় ইঞ্জিনিয়র। জ্যামিতি পড়তে পড়তেই তিনি মনস্থ করেছিলেন বড় হয়ে তিনি পৃথিবীর নানা রহস্যের সমাধান করবেন।

কিন্তু তিনি পড়াশোনায় ভাল ছাত্র ছিলেন না, স্ট্যান্ড তো করেনই নি, উপরন্তু সুইস পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে তিনি ভর্তির পরীক্ষাতেও পাস করতে পারেননি।

হিটলারেরও যে এমন দশা হয়েছিল তা এই বইতে দেখিয়েছি (অহংকার থেকে পতন) অথচ হিটলার খারাপ লোক হলেও তিনি যে গবেট ছাত্র ছিলেন তা বলা যাবে না।

আসলে অনেক ব্যক্তি যাঁদের মধ্যে মৌলিকতা আছে, সৃজনশীলতা আছে গতে বাঁধা পড়াশোনা তাদের কাছে নীরস মনে হয়। তাঁরা এই ধরনের পড়াশোনায় মন লাগান না তার ফলে তাঁরা ইস্কুল কলেজে ভাল ফল দেখাতে পারেন না। বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে এম এ পাস করলেই কি কেউ শরৎচন্দ্র হতে পারে? শরৎচন্দ্র তো এফ. এ. (উচ্চমাধ্যমিক) পাস ছিলেন।

আমার কাছে যারা আসে আমি তাদের আগে বোঝাই পড়াশোনার উদ্দেশ্যটা কী? উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাস নয়। পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাস করেছে অথচ কিছুই জ্ঞান নেই—হাজার হাজার এমন ছাত্রছাত্রী আছে। পরীক্ষায় নম্বর দেবার যা নির্দেশ আছে তাতে ভুলভাল লিখেও পাস নম্বর পেয়েছে আমি তা দিয়ে তার গুণপনা বিচার করি না। বিচার করি তার সঙ্গে কথা বলে তার আগ্রহ দেখে। সে বাইরের পাঁচটা বই পড়ে কি না। খবরের কাগজ পত্র-পত্রিকা পড়ে কি না। খেলাধুলা বা শরীরচর্চা করে কি না। পড়া মুখস্থর চেয়ে আমি তার সাধারণ জ্ঞান, চটপটে ভাব, ভদ্র ব্যবহার, উদ্যোগ, ন্যায়বোধ এগুলোকেই বেশি করে দেখি।

পড়াশোনায় মন বসাতে গেলে আগে বুঝতে হবে কেন পড়ছি। কেন পড়ব? পড়াশোনার দুটি উদ্দেশ্য। একটি দীর্ঘমেয়াদী। শিক্ষা তোমাকে এমন জ্ঞান দেবে যাতে করে তুমি সারাজীবন ধরে নানা সমস্যার সমাধান করতে পারো।

তুমি যত ভালভাবে শিক্ষিত হবে তোমার জীবিকা বেছে নেওয়ার সুযোগ তত বেশি হবে।

আর একটি উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিক। সেটি আগামী পরীক্ষায় পাস করা। তোমাকে আপাতত মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই শুধু পরীক্ষার জন্যই পড়ে। সারাজীবন জুড়ে যে পরীক্ষা তার জন্য পড়ে না। তার ফলে পরীক্ষায় পাস করলেও তারা প্রকৃতপক্ষে মূর্খই থেকে যায়।

আর যারা পরীক্ষা পাসের কথাই শুধু ভাবে তারা পরীক্ষা আতঙ্কে ভোগে। পরীক্ষায় বসা তাদের কাছে এক উদ্বেগ। পরীক্ষার আগে তাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে পড়ার কতগুলি পদ্ধতি আছে।

পড়ার জন্য এমন একটা জায়গা বেছে নিতে হয় যেটি তোমার পক্ষে খুব স্বচ্ছন্দ। তবে বেশি আরামপ্রদ জায়গা হলে সেদিকেই মন চলে যাবে। জানালার ধারে বসে যদি পড়ো তাহলে সে জানালা যেন রাস্তার দিকে বা পাশের বাড়ি বা ফ্ল্যাটের লাগোয়া না-হয়। তার চেয়ে দেওয়ালের দিকে টেবিল রেখে পড়া ভাল। মোট কথা গাছতলায় বসেও পড়তে পারো তবে জায়গাটা যেন নিরিবিলি হয়।

পড়ার টেবল সবসময় যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

কতক্ষণ পড়বে সে-সম্পর্কে কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। তবে আধঘণ্টা পড়ার পর পাঁচমিনিটের বিরতি নেবে। লেখার ব্যাপার এক ঘন্টা লেখার পর পাঁচমিনিট বিরতি চাই।

বিরতির সময় একটু পায়চারি করা হাত পা স্ট্রেচ করা দরকার।

প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর যেন একটি ডায়রি থাকে। তাতে লিখে রাখবে কবে ক্লাস টেস্ট। কবে অ্যানুয়াল। তোমার ব্যক্তিগত নানা অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কোনওদিন কোনও বইটা পড়বে। রিভিশন দেবে। যে গল্পের বই পড়লে তার নাম ও বইটির সংক্ষিপ্তসার এসব ডায়রিতে লিখে রাখবে। যখনই পড়তে বসবে তখন মনে মনে বলবে : আমি পড়ছি শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য নয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য। বিশ্বায়নের উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য। আমি বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার জন্য পড়ছি।

সত্যি সত্যি যদি বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠতে চাও তাহলে তোমাকে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির বিষয় পড়তে হবে। তা তুমি যদি বিজ্ঞান বা বাণিজ্য নিয়ে পড়ো তা হলেও।

আমি অনেক ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেছি তারা খুব ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু কোনও নামী সাহিত্যিকের লেখাও পড়েনি। খবরের কাগজ পড়ে না বহু ছেলেমেয়ে। পড়লেও ইংরেজি কাগজ পড়ে না।

বাংলা খবরের কাগজে মুখরোচক ও অপ্রয়োজনীয় খবরই বেশি থাকে। এই কাগজ পড়ে পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা হয় না। সেজন্য ইংরেজি কাগজ পড়তে হয়। তা না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়। তুমি যে পড়ছ তা তোমার বাবা-মা বা মাস্টারমশাই দিদিমণিদের উপকার করার জন্য নয়। তুমি না পড়াশোনা করলে

বাবা-মা বড়জোর মনে দুঃখ পাবেন, এ ছাড়া আর তাঁদের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু তুমি পড়াশোনা করলে তোমারই জ্ঞান বাড়বে। তুমি বিদ্বান হলে তুমিই সম্মান পাবে। সবদেশেই জ্ঞানী গুণী ও ধনীদের কদর। কিন্তু ধনীর চেয়ে জ্ঞানীর কদর বেশি। তোমাদের পাড়ার সবচেয়ে বড়লোক যে তাকে পাড়ার লোকেরা খুব খাতির করে কিন্তু বিদেশে কেউ তাকে পাত্তা দেবে না। কিন্তু অমর্ত্য সেনের মতো মানুষদের পৃথিবীর সবাই সম্মান দেবে। আমেরিকা ও রাশিয়া দুজায়গাতেই দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সরকার সবচেয়ে বেশি খাতির করে। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে রাজা ও বিদ্বানের মধ্যে কোনওও তুলনা হয় না। রাজাকে স্বদেশবাসী পুজো করে কিন্তু বিদ্বান সর্বত্র পূজা পায়।

ইস্কুল পড়ার উদ্দেশ্য হল এই বিদ্যালাভের প্রথম ধাপটা পেরনো। ইওরোপ আমেরিকায় ইস্কুলে পড়াটা সকলের পক্ষে আবশ্যিক। ইস্কুলের পড়া শেষ করে অনেকে আর পড়তে চায় না। চাকরিতে ঢুকে পড়ে। না হয় কারিগরি শেখার জন্য বিশেষ ইস্কুলে ভর্তি হয়। যেহেতু বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের কাছে ইস্কুলের পড়াটা শেষ পড়া তাই যে ছেলে বা মেয়েটি ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে ধরে নেওয়া হয় সে গুছিয়ে ইংরেজি ও মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। সে মোটামুটি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আর সাধারণ বুদ্ধির অঙ্ক করে দিতে পারে। কম্পিউটর চালাতে জানে। ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস মোটামুটি জানে। সে বলতে পারবে ভারতে আর্যরা আসার পর কীভাবে ভারতের ইতিহাস নতুন করে শুরু হল। আর্যদের আসার আগে এদেশে কোনও সভ্যতা ছিল? তারপর বুদ্ধদেব, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব করার সময় ভারতের কী কী পরিবর্তন হল। মুসলিমরা ভারতে কীভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করল। তারপর ইংরেজ কীভাবে এল? দেশ স্বাধীনই বা হল কীভাবে?

ভূগোলেও পৃথিবীর নানা মহাদেশ, নানা দেশ ভূপ্রকৃতির প্রভেদ অনুসারে। বিভিন্ন দেশে কী কী খাদ্যশস্য হয়। তার কতটুকু বিদেশে যায়। এই সব নিয়ে একটা পরিচয় থাকে।

ইস্কুলের পড়া শেষ করার পর তোমার যা জ্ঞান সেটাই তোমার প্রকৃত জ্ঞান।

অনেক বাবা-মা তাদের ফেল করা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসেন। কেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা ফেল করছে, কোথায় তাদের ত্রুটি তা ধরে দেওয়ার জন্য।

পরীক্ষায় যারা কম নম্বর পায় বা ফেল করে তারা খুব ভেঙে পড়ে। পরীক্ষায় ফেল করেছে বলে প্রতি বছরই দু একজন ছাত্র-ছাত্রী আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। এটা তো একেবারে বোকামো। কারণ একবার ফেল করলে পরের বার পাস করার সুযোগ থাকে কিন্তু জীবন একবার গেলে আর তো ফিরে পাওয়া যায় না।

পরীক্ষায় ফেল করে কেন? না ভুলভাল লেখার জন্য। একবার আমি ইস্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছিলাম। একটা প্রশ্ন ছিল, শ্রীরামপুর কী জন্য বিখ্যাত? ছেলেটি লিখেছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান বলে। কলকাতার যিনি এখন মেয়র সেই সুব্রত মুখোপাধ্যায় এক সময় একটা বক্তৃতায় স্বীকার করেন ছোটবেলায় আমি এত অজ্ঞ

ছিলাম যে ভাবতাম বিধানসভার নাম হয়েছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামে।

আমরা অনেকেই অনেক কিছু হয় জানি না, না হয় ভুল জানি। কিন্তু ইচ্ছে করে তো কেউ ভুল জানে না। মানুষ ভুল শেখে অনেকগুলি কারণে। একটা কারণ মাস্টারমশাই বা বাবা-মা যদি ভুল শেখান। অনেক মাস্টারমশাই অনেক বাবা-মা নিজেরাই বহু জিনিস জানেন না। অথচ ছেলেমেয়েদের কাছে প্রেস্টিজ রাখার জন্য যা মনে আসে একটা কিছু বলে দেন। অনেক সময় কতগুলি অনুষঙ্গ দেখে আন্দাজে আমরা কিছু একটা ধরে নেই। অথচ সেটি ভুল। যেমন—শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলি জেলার কামারপুকুরে জন্মেছিলেন। শ্রীরামপুরও হুগলি জেলায়। শ্রীরাম কথাটা আছে। অতএব মনে হল শ্রীরামপুর বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণের নামেই নামকরণ হয়েছে। কোনও কিছু খতিয়ে না-দেখলে, প্রশ্ন না-করলে কখনই আমরা ভুল জানা শোধরাতে পারব না।

আমি সারাজীবন খবরের কাগজে কাজ করেছি। কাগজের সাংবাদিকদের খুব দ্রুত লিখতে হয়। অনেক তথ্য মনে রাখতে হয়। কিন্তু স্মৃতি অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে। অনেক কিছু ভুল বেরিয়ে যায়। পরদিন কারও চোখে পড়লে সংশোধন হয়। সেজন্য সাংবাদিকদের উপদেশ দেওয়া হয়, কোনও কিছুতে খটকা লাগলে সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করে নিন। ছেলেমেয়েরা অনেকে পরীক্ষার হলে অনেক প্রশ্ন ভুলে যায়, তাই পাশের ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করে ফিসফিস করে। এই, এটা কী হবে রে! কিন্তু এটা তো বেআইনি। এই জিজ্ঞাসাটা পরীক্ষায় বসার আগে করে নিতে পারতে।

ক্লাসে যে পড়াটা হয়ে গেল সে পড়া মন দিয়ে শুনলে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না। তা বাদে খটকা লাগলে মাস্টারমশাইকেই জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যায়। পরীক্ষার আগে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা মিলে এক জায়গায় বসে প্রশ্ন ধরে ধরে আলোচনা করে নিলে চট করে মনে ধরে যায়।

যে বিষয়টি ভাল বুঝতে পারি না সেই বিষয়টি নিয়ে বেশি করে আলোচনা করতে হয়। পরীক্ষায় যারা ফেল করে তারা নিজেদের দোষেই করে। দোষটা আর কিছু নয়, তারা বিষয়টি বোঝার জন্য বেশি সময় দেয়নি।

আর একটা কারণে ছেলেমেয়েরা ফেল করে বা রেজাল্ট খারাপ করে সেটা হল পরীক্ষাভীতি বা Examination Phobia।

অনেক ছেলেমেয়ের পরীক্ষার সময় বড্ড ভয় করে। এর কারণ ওই ফোবিয়া। Phobia এই ল্যাটিন শব্দটির অর্থ ভয়। শুধু ভয় বললে কথাটা পুরো বোঝানো যায় না—Phobia হল অহেতুক ভয়। অনেকের আরশোলা আর টিকটিকিতে ভয়। অনেকে প্লেনে চাপতে ভয় পায়। অনেকে রাতে একা শুতে ভয় পায়। এই সব ভয়ই অমূলক। যারা ভয় পায় না তাদের কোনও ফোবিয়া নেই।

এমনই ভয় হল পরীক্ষা-ফোবিয়া। পরীক্ষার আগের দিন থেকেই মাথা ঘুরতে শুরু করে। বুক ধড়ফড় করে। বমি পায়। পেট খারাপ হয়।

পরীক্ষার দিন কিছু খেতে ইচ্ছা করে না। গলা শুকিয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিক কারণে। যারা ভাল করে পড়াশোনা করেনি। যাদের কিছু মনে থাকে না তাদেরই ভয়

হয় তারা পরীক্ষা দিলে পাস করতে পারবে না। আর যত এমন আশঙ্কা হবে তত ভয় চেপে ধরবে।

পরীক্ষার এই ভয় কাটাতে গেলে সর্বপ্রথম তোমার স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হবে। এ নিয়ে আমার একটি বই (কেমন করে স্মৃতিশক্তি বাড়াবেন?) শীঘ্রই বেরুবে।

এই বইতে ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলি :

যা তুমি বোঝ না তা কখনও মনে রাখতে পারবে না। কাজেই যা পড়বে বুঝে পড়বে। বুঝতে না পারলে শিক্ষকদের সাহায্য নেবে।

একসঙ্গে বড় একটা কিছু মনে রাখতে পারবে না। যা মুখস্থ করবে সেটাকে ছোট ছোট প্যারা করে ভেঙে নাও। তারপর একটু ব্রেক নাও। এরপর আবার পরের প্যারা মুখস্থ করো।

এক নাগাড়ে আধ ঘণ্টা পড়ার পর একটু সামান্য বিরতি দাও। এই সময়টা জলটল খেয়ে এসো। অথবা স্রেফ চোখ বুজে খুব জোরে জোরে নিশ্বাস ছাড়ো।

মনে রাখবে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে যা পড়ে তার ৭৫ শতাংশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভুলে যায়। সেজন্য মনে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে মনে রাখায় কার সাধ্যি?

কীভাবে মনে রাখবে?

প্রত্যেক পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর বই দেখে বুঝে নেবে মুখস্থ হচ্ছে কি না। পড়ার সময় একটা কাগজে ছোট ছোট পয়েন্ট বা নোট লিখবে।

মুখস্থ হয়েছে কিনা দেখার সময় যদি দ্যাখো নোটটি একটু বাড়াতে হবে তাহলে বাড়াও। আজ যা পড়লে আগামী কাল ২৪ ঘণ্টা পরে আবার মুখস্থ বলার চেষ্টা করবে। দেখবে অনেক পয়েন্ট মিস করেছ। সংশোধন করে নেবে।

প্রতি মাসে প্রথম রবিবারটা গত মাসের পড়া মনে করার চেষ্টা করবে। তারপর ছমাস হয়ে গেলে আবার ছমাসের পড়া একদিনে একটা একটা করে মনে করার চেষ্টা করবে।

তারপর এক বছর পরে পরীক্ষা দেবার সময় দেখবে সবই তোমার মনে আছে এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে LARI (Learn and Review).

যে সব বিষয় সহজে মুখস্থ হতে চাইছে না সেগুলিকে নিয়ে মজার শব্দ খেলা বানাতে পারো। সেটি হল অনেকগুলি নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে একটা মজার বাক্য বানানো।

যেমন ধরো মুগল সম্রাটদের পরপর নাম বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, সাজাহান, ঔরংজিব। প্রতিটি নামের প্রথম অক্ষর আছে এমন একটি মজার বাক্য বানাও। এই ব্যাপারে একটি মজার বাক্য খুবই চালু—

বাবার হইল আবার জ্বর, সারিল ঔষধে।

বা = বাবর	হ = হুমায়ুন	আ = আকবর
জ = জাহাঙ্গির	সা = সাজাহান	ঔ = ঔরংজিব

পরীক্ষায় কি ভাল ফল করতে চাও?

তাহলে শিক্ষাবিদ ফ্রান্সিস কেসির উপদেশ শোন।

* পরীক্ষার অন্তত আট সপ্তাহ আগে থেকে রিভিশন শুরু করবে।

* যে যে বিষয়ে রিভিশন করবে তার একটা লিস্ট বানাও। তারপর কোনও চ্যাপ্টারগুলি রিভিশন দেবে তার চার্ট বানাও। গত বছরের পরীক্ষার প্রশ্ন, ক্লাসে পড়ানোর ভিত্তিতে এই চ্যাপ্টারগুলি তৈরি করো। এর আগে ক্লাসের অন্তত তিন চারজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে জেনে নাও তারা কোনও কোনও বিষয়গুলির ওপর জোর দিচ্ছে।

* রিভিশনের সময় নতুন কোনও বিষয় আর যুক্ত কোরো না। যেটুকু আগে পড়েছ সেটুকু কতখানি মনে আছে তা দেখাই রিভিশন। তবে রিভিশনের সময় ওই বিষয়ের ওপর প্রশ্নগুলি সামনে রাখতে হবে। প্রশ্নগুলির উত্তর যথাযথ বুঝে নেওয়াই রিভিশনের উদ্দেশ্য। রিভিশন হচ্ছে পরীক্ষা দেবার রিহার্স্যাল। অন্তত প্রত্যেক পেপারে একটি দুটি প্রশ্ন না দেখে লেখার অভ্যাস করতে হবে। ঘড়ি ধরে দেখবে কত সময় লাগছে। সব প্রশ্নের উত্তর লেখাটা বড় কথা। এজন্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য সময় ভাগ করে নিতে হবে।

পরীক্ষার ভাল ফল করতে গেলে যেমন মনে রাখাটা দরকার তেমনি দরকার নির্ভুল বানান। আর পরিষ্কার হাতের লেখা। সবার হাতের লেখা ভাল হয় না। কিন্তু সবাই পরিষ্কার করে লিখতে পারে। দুটি লাইনের মধ্যে যেন এক আঙুল ফাঁক থাকে। দুপাশে যেন মার্জিন থাকে। জ, ন, ণ, শ, স, ষ, ড়, র এগুলি যেন গুলিয়ে না যায়। ল ও ন লেখার সময় যেন তফাতটা বোঝা যায়। কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ, কোটেশন চিহ্ন এগুলি যথাযথ দেবে। কোনও প্যারা যেন খুব বড় না হয়। একটা প্যারা শেষ হয়ে পরের প্যারায় যখন আসবে তখন একটু গ্যাপ থাকবে।

প্রশ্ন ভাল করে পড়তে হবে। বুঝতে হবে। অনেক ভাল ছেলে ভাল লিখেও এই সব কারণে কম নম্বর পায়।

পরীক্ষার আগের দিন কিন্তু প্রশ্ন ধরে ধরে পড়ার চেষ্টা কোর না। তখন শুধু পয়েন্টগুলি ঝালিয়ে নেবে। প্রত্যেক প্রশ্নই হবে কতগুলি পয়েন্টে ভাগ করা। আগে পড়ার সময় এই ভাগ করে নেবে। পরীক্ষার আগের দিন শুধু পয়েন্ট দেখবে।

পরীক্ষার আগের দিন বেশি রাত জাগবে না। তা হলে পরীক্ষার হলে গিয়ে ঘুম পাবে। আগের দিন রাতে একটা চেকলিস্ট করে নেবে কী কী লাগবে। যেমন ড্রইংবক্স, জিওমেট্রি বক্স, অ্যাডমিট কার্ড, রাবার, বল পেনের রিফিল, ঘড়ি, পেন্সিল কাটার কল, জলের বোতল।

পরীক্ষার দিন ভোরবেলা উঠবে। উঠেই ঠাকুর প্রণাম করবে। ছাদে বা উঠোনে পায়চারি করে নেবে। ১০টায় পরীক্ষা হলে আটটায় খেয়ে নেবে। ভরপেটে অথবা খালিপেটে পরীক্ষা দেবে না। পরীক্ষা দিতে যাবার আগে বাবা-মা, দাদা-দাদু-দিদিকে প্রণাম করে যাবে।

আর পরীক্ষার সাতদিন আগে থেকে শরীরটা সুস্থ রাখতে হবে। ঠাণ্ডা লাগাবে না। ভাজাভুজি, দোকানের খাবার একদম খাবে না। খেলাধুলোর অভ্যাস থাকলে খুব হাল্কাভাবে খেলবে। হাতে পায়ে চোট না লাগে যেন।

পড়তে পড়তে উঠে গিয়ে পায়চারি করে নিতে পারো। জল খেয়ে আসতে পারো কিন্তু টিভি দেখা একদম নয়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি পরীক্ষার মাসে টিভি একদম না দ্যাখো। একমাস টিভি না-দেখলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

টিভিতে তুমি যাই দেখো না কেন, তোমার অবচেতন মনে বিভিন্ন দৃশ্য ঘটনা এমনকী, বিজ্ঞাপনেরও প্রতিক্রিয়া ঘটে। যার ফলে তোমার স্মৃতিশক্তি জট পাকিয়ে যেতে পারে। পরীক্ষার হলে যাবার সময় অনেক ছাত্র-ছাত্রীই বই নিয়ে যায়। তারপর পরীক্ষার ঘন্টা বাজার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পড়তে থাকে। এটি খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস।

কেন ক্ষতিকর?

না। সারা বছর ধরে যা পড়লে তার ওপর নির্ভর করতে পারলে না। পরীক্ষার হলে গিয়ে কতটুকু পড়তে পাবে। তড়িঘড়ি করে দু একটা প্রশ্ন দেখার ফলে আগের সব পড়া ভুলে যাবার সম্ভাবনা। কারণ একটি টেপড করা ক্যাসেটের ওপর যদি তুমি নতুন রেকর্ড করতে যাও আগের রেকর্ড মুছে যায়। এটাও অনেকটা তেমন।

পরীক্ষার হলে খালি হাতে যাবে। মনটা হাল্কা রাখবে। সব সময় ভাববে তুমি তৈরি। পরীক্ষাকে ভয় পাও না। হলে গিয়ে যেই প্রশ্ন পাবে অমনি তোমার সব মনে পড়ে যাবে। তোমার হাতঘড়িটা খুলে টেবলের ওপর রাখবে। জলের বোতল রাখবে সামনে এমন জায়গায় যাতে চট করে পাও। বাইরে জল খেতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না।

হল থেকে বেরিয়ে আর বই-এর সঙ্গে মেলাতে যাবে না। যদি দেখা যায় কয়েকটি প্রশ্ন ভুল লিখে দিয়ে এসেছ তাতে করে তোমার মনে অসম্ভব চাপ পড়বে। পরের পরীক্ষাগুলি খারাপ হয়ে যাবে।

সব পরীক্ষা হয়ে গেলে এবার বই-এর সঙ্গে প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দ্যাখো তুমি ঠিকঠাক লিখেছ কি না।

আশঙ্কা এক অসুখ

আশঙ্কা হল কল্পিত ব্যর্থতার কথা বার বার ভেবে ভয় পাওয়া।

বেশিরভাগ মনের অসুখের উৎপত্তি আশঙ্কা থেকে।

আশঙ্কা জাগে মনের জোর কমে গেলে। আবার আশংকা থেকে মনের জোরও কমে যায়।

আশঙ্কা বস্তুটির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও বাস্তব ভিত্তি থাকে না।

যখন পড়ছ তখন মনে আশঙ্কা হচ্ছে ফেল করে যাবে। ফেল করলে কী বিশ্রী কাণ্ড হবে। বন্ধুদের কাছে কীভাবে মুখ দেখাবে।

একটি গ্রামের ছেলে কলকাতায় এক নামী স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। ভর্তি হওয়ার

পর তার সব সময় মনে হতে থাকল এরা কত ভাল ছেলে। এরা সব শহরের ছেলে। কত চালাক-চতুর। আমি বোধহয় এদের সঙ্গে পেরে উঠব না। আর যেই ভাবা অমনি সে কল্পনা করতে লাগল, সে পারছে না। সত্যি সত্যি তাই হল। মাধ্যমিকে ৭৫ শতাংশ নিয়ে পাস করা ছেলেটির এমন অবস্থা হল যে সে আর পড়াশোনা করতেই পারল না। এই অবস্থায় সে এক বছর ড্রপ দিতে বাধ্য হয়। তখন সে আমার কাছে আসে। আমি তাকে মনের জোর বাড়াবার প্রক্রিয়া বলে দিলাম। সে সেগুলি প্রয়োগ করে বেশ ফল পেল। কিছুকাল পরে সে জানাল সে দেশে চলে গিয়ে পড়াশোনা করছে কিন্তু আবার মনে হচ্ছে কলকাতায় এসে ওই ইস্কুলে না-গেলে সে বুঝি পরীক্ষায় ফেল করবে।

আমি তাকে কলকাতায় আসতে বললাম। যাই হোক শুধু আশঙ্কা করে একটি ছেলে একটা বছর নষ্ট করল।

আশঙ্কার কোনওও শেষ নেই। কারণ যা ঘটেনি তা ঘটতে পারে এটা মনে মনে ভেবে নার্ভাস হয়ে পড়াটা আশঙ্কা।

সারা বিশ্ব জুড়ে যখন সার্স হচ্ছিল (২০০৩ মে) তখন আমার এক বন্ধুর নিউমোনিয়া হয়। কিছুদিন আগে তার ছেলে ব্যাঙ্কক থেকে ফিরেছিল। দমদম এয়ারপোর্টে ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় তার কিছু হয়নি। কিন্তু ছেলে ফেরার পর বাবার নিউমোনিয়া হওয়ায় বাড়িশুদ্ধ সকলের ধারণা হয় নির্ঘাত সার্স। এমনকী, ডাক্তারও বন্ধুটিকে আইডি হাসপাতালে স্থানান্তর করতে পরামর্শ দেন। বন্ধুটি অবশ্য সে কথা শোনেনি। বাড়িতে সাধারণ নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় সে ভাল হয়ে ওঠে। অথচ সার্সের আশঙ্কায় তার অসুখটা আরও বেড়ে যায়।

তোমাদের মতো বয়সে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য কোনওও আশঙ্কা কারও মধ্যে দেখিনি। আমাদের কী হবে এটা নিয়ে ভাবতাম না। তবে আমি অঙ্কে খুব খারাপ ছিলাম বলে আমার সব সময় আশঙ্কা হত অঙ্কে ফেল করব। আমার আশঙ্কা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে আমি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রধানকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলাম যে আমি গরিবের ছেলে স্যার—আমায় যে করে হোক পাস করিয়ে দিন। দেখো কাজটা বোকার মতো করেছিলাম। চিঠি লিখে ফেল করা ছাত্রকে কি পাস করানো যায়? এর মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু আশঙ্কিত হলে মানুষের যুক্তিজ্ঞান থাকে না। আমি অঙ্কে তেত্রিশ পেয়ে পাস করেছিলাম। অবশ্য চিঠি লেখার জন্য নয়।

তেমনি দেখো, আশঙ্কা থেকে অনেক ছেলেমেয়ে রাতারাতি ঠাকুর ভক্ত হয়ে ওঠে। আমি দেখতাম পরীক্ষার আগে সবাই রোজ সন্ধ্যায় একবার করে কালীবাড়ি আসছে। তারপর পরীক্ষা হয়ে গেলে আর মন্দিরমুখো হচ্ছে না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস ভাল। তাতে মনের জোর বাড়ে। কেউ যদি ঈশ্বর না-মানে তা হলেও ভাল। কারণ সে তখন নিজেকে মানে।

ভয় থেকে ভক্তি নয়

কিন্তু আশঙ্কা থেকে যে ভয় বা ভক্তি তার কানাকড়ি দাম নেই। সেটা আত্মপ্রবঞ্চনা। ২০০৩ সালে আফ্রিকায় বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে সৌরভ একটি কবচ পরেছিলেন। তাঁর বাড়িতে যজ্ঞও হয়েছিল। তিনি যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হন তাহলে তিনি এইসব যাগযজ্ঞ তাবিজ কবজে বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু যত তুমি বাইরের শক্তিতে বিশ্বাস করবে তত তোমার ভেতরের শক্তি কমে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন না। জ্যোতিষ যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে যা হবার তা হবে। আর জ্যোতিষ যদি মিথ্যা হয় তাহলেও যা হবার তা হবে। জ্যোতিষ যদি বলে তুমি ফেল করবে তাহলে তোমার মধ্যে এমন আশঙ্কা জাগবে যা এখনও তোমার ঘটেনি। অর্থাৎ ফেল করার আগেই তোমার আশঙ্কা শুরু হয়ে যাবে। মনটা খারাপ হয়ে থাকবে।

যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী ও যারা নাস্তিক উভয়েই বিশ্বাস করে প্রত্যেক ঘটনা ঘটার পিছনে কারণ আছে। তবে কারণটা উভয়ের ক্ষেত্রে আলাদা। যেমন ভগবান বিশ্বাসীরা বলবেন, দুঃখ দিয়ে ঈশ্বর পরীক্ষা করেন। দেখেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের ভালবাসা ঠুনকো কি না। প্রকৃত ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ ভগবানকে ভালবাসেন নিঃশর্তভাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসে শর্তাধীনভাবে। অর্থাৎ মা আমার ছেলেকে পাস করিয়ে দাও, তোমাকে জোড়া পাঁঠা দেব। ফেল করলে একটা বাতাসাও নয়। ঈশ্বর কি ঘুষখোর সরকারি কর্মচারী নাকি? তিনি কি একজন লোভী, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি?

যিনি নাস্তিক, সত্যি সত্যি ঈশ্বর মানেন না, তিনি বলেন, পড়াশোনা না-করলে তুমি ফেল করবে। পরীক্ষার সময় শরীর ও মন যদি ভাল না থাকে, যদি টু দি পয়েন্ট গুছিয়ে না লিখতে পারো তাহলে ফেল করবে। এর মধ্যে ঈশ্বর আসছে কোথায়? ঠাণ্ডা লাগালে তোমার জ্বর হবে। জ্বর থেকে আরও বড় ধরনের অসুখ হতে পারে। সিগারেট খেলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা। তবে যারা সিগারেট খায় না তাদেরও কি ক্যান্সার হয় না? হয়। কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে চট করে হয়। হলে সেটা গুরুতর হয়। চুরি করলে জেল হয়। সব চোরের জেল হয় কী? তবে অনেক চোরেরই হয়। জেলখানায় গেলেই দেখবে কত চোর জেল খাটছে।

আসলে প্রকৃতির রাজ্যে নিশ্চিত বলে কিছু নেই। সবই সম্ভাবনা। কোনোটার সম্ভাবনা বেশি। কোনোটার কম। ভাল করে পড়াশোনা করলে ভাল ফল করার সম্ভাবনা বেশি। আমার মেয়ে বৈশালী প্রতিবারই খেটে পড়ত। কিন্তু সে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পাস করল। কিন্তু প্রত্যাশিত রেজাল্ট হল না। ইংরাজি অনার্সে ৫৯.৭ পেল। মাত্র কয়েকটি নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পেল না। এই প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা, যা থেকে তোমার আমার মুক্তি নেই তাকেই আমরা ভাগ্য বলি।

আমাদের প্রতিটি সাফল্য ও প্রতিটি ব্যর্থতা কতগুলি পজিটিভ ও নেগেটিভ

ঘটনার কাটাকুটি খেলার মতো। এসব নিয়ে অকারণ আশঙ্কা করে লাভ নেই। আমি গ্রামে জন্মেছি গ্রামের ইস্কুলে পড়েছি, কলকাতায় জন্মালে, কোনওও সেন্ট মার্কা ইস্কুলে পড়লে আমার ভাল হত কি না জানি না। তবে আচার-আচরণ চিন্তা কালচার অন্যরকম হত। আবার সেটা ভাল হত কী মন্দ হত তা বলা যায় না। এইভাবে যে সব ছেলে লেখাপড়া শিখেছে তাদের সবারই কী ভাল হয়েছে?

গ্রামের ইস্কুলে পড়ে আমার চেয়েও কত বড় হয়েছে কত ছেলেমেয়ে। তুমি যেভাবে বড় হয়েছ, যে ইস্কুলে পড়ছ তোমার পরিবার, গ্রাম, জেলা এককথায় তোমার অবস্থানটাকে মেনে নাও। তুমি হিন্দু, সাউথ পয়েন্ট কিংবা সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়লে তুমি তোমার ইস্কুল নিয়ে গর্ব করতে কিন্তু অখ্যাত ইস্কুলে পড়ে কৃতী হলে তোমার ইস্কুল তোমায় নিয়ে গর্ব করবে।

একথা ঠিক জহরলাল নেহরু হ্যারোর ছাত্র ছিলেন। ইংলন্ডের অভিজাত ইস্কুল হ্যারো। সুভাষচন্দ্র কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট ইস্কুল থেকে পড়েছিলেন। কিন্তু জাতির জনক গান্ধীজী কোনও ইস্কুল থেকে পড়েছিলেন বলতে পারো? রাজকোটের একটি প্রাথমিক পাঠশালায়, সেখান থেকে রাজকোটের একটি সাধারণ ইস্কুলে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রাথমিক শিক্ষা যশোর জেলার গ্রামের পাঠশালায়। সেখান থেকে তিনি কলকাতায় এসে হেয়ার ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন, আমি গেঁয়ো ছিলাম বলে আমায় ছেলেরা বাঙাল বলে খেপাতো।

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এনট্রান্স পাস করেছিলেন কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে। কবি ও তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম ইস্কুলে পড়তেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় সিলেটের এক সাধারণ স্কুল থেকে এনট্রান্স ও সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স পাস করেন। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর স্কুলে পড়াশোনা করেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি বঙ্গবাসী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো অত বড় পণ্ডিত এন্ট্রান্স পাশ করেছিলেন মতিলাল শীল ফ্রি স্কুল থেকে। কলকাতার জগবন্ধু স্কুল, সাউথ সুবার্বন স্কুল, টাউন স্কুল, শ্যামবাজার এভি স্কুলের মত স্কুল থেকে কত মনীষী পাস করেছেন। যেমন আইসিএস হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় জগবন্ধু স্কুল থেকে পাস করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ্ অমিয়কুমার দাশগুপ্ত বরিশালের গৈলা হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন।

এই তালিকা বাড়াতে চাই না। ছাত্রছাত্রীদের ওপর অভিজাত স্কুলের একটা প্রভাব নিশ্চয়ই পড়ে। কিন্তু যদি কারও প্রতিভা থাকে, বড় হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ইস্কুল নিয়ে কিছু যায় আসে না। যেটা বলতে চাইছি সেটা হল এই ইস্কুল নিয়ে তোমার মধ্যে যেন হীনমন্যতা না জাগে।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন? আমি তখন গর্বের সঙ্গে বলি-না, আমি গ্রামের ইস্কুল ও কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি। আমার ছেলে তথাগত প্রেসিডেন্সি ও জেএনইউ-র ছাত্র। কিন্তু আমি মনে করি আমি যদি বিখ্যাত হতে পারতাম তাহলে গ্রামের কলেজে পড়েও হতাম।

আমি শুধু আমার লেখার ক্ষমতাটাকে সারাজীবন ভাঙিয়ে খেয়েছি। এটা যদি না-থাকত তাহলে কলকাতার নামী ইস্কুলে পড়লেও আমায় কেউ চিনত না।

ইস্কুল ছেলেমেয়েদের এডস সচেতনতা

AIDS কথাটির পুরো অর্থ হল অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) সংক্ষেপে AIDS.

এটি একধরনের মারাত্মক ভাইরাস যা খুবই সংক্রামক। তবে এই সংক্রমণ শুধুমাত্র পাঁচভাবে হতে পারে।

১. যার এডস আছে এমন নারী বা পুরুষের সঙ্গে দৈহিক মিলন হলে। ধরো একটি ছেলে না জেনে এডস-এর জীবাণুবাহিকা একটি মেয়ের সঙ্গে যৌন সঙ্গম করল, ছেলেটি সংক্রমিত হবে। আবার কোনও ছেলে এডসের বাহক তার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করলে মেয়েটিরও এডস হবে।

এই সংক্রমণকে HIV Positive বলে। HIV মানে Human Immuno Deficiency Virus অর্থাৎ কারও ভেতরে এই ভাইরাস ঢুকে বসে আছে। ভাইরাস ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে AIDS রোগ লক্ষণ দেখা দেয় না। অনেক বছর পরেও এটা দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এডস রোগীর রক্ত যদি কোনওভাবে সুস্থ মানুষের দেহে ঢুকে যায় তারও এডস হতে পারে। একই সিরিঞ্জে একাধিক ব্যক্তিকে ইঞ্জেকশন দিলে এটি হতে পারে। এজন্য আজকাল ডিজপজেবেল বা বর্জনযোগ্য সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হচ্ছে।

এডস রোগীর রক্ত অনেক সময় ব্লাড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চলে আসে। সেই রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে দিলে তার এডস হয়।

এডস রোগে আক্রান্ত মায়ের গর্ভের শিশু এডস নিয়ে জন্মায়।

আশি শতাংশ ক্ষেত্রে যৌন মিলনের মাধ্যমে এডস হয়ে থাকে। তাই অবিবাহিত পুরুষ-নারীর মধ্যে অবাধ যৌন মিলন অত্যন্ত ক্ষতিকর। এইজন্যই আমি বারবার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের সাবধান করে দিচ্ছি তোমরা সচেতন হও। খারাপ বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে বয়ঃসন্ধির সময় অনেক ছেলে সমকামী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে হস্টেলে যে সব ছেলে থাকে তাদের মধ্যে এই কু-অভ্যাস দেখা দিতে পারে। সমকামীদেরও সহজে এডস হয়।

বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেমেয়েদের যৌনজ্ঞান জন্মায় না। অথচ এই বয়সে তারা অনেক সময় কামনার দ্বারা তাড়িত হয়। তখন পরিণতির কথা না ভেবেই কোনওও কোনওও ছেলে-মেয়ে গোপনে দৈহিক সম্পর্ক তৈরি করে ফেলতে পারে। এর ফলে যেমন এডস হতে পারে তেমনি এডস না হলেও মেয়েটি প্রেগন্যান্ট বা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যেতে পারে। তখনতো কেলেংকারির একশেষ। এটা আইনের চোখে কিন্তু রেপ বলেই গণ্য হবে।

এইজন্য বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই সব ছেলেমেয়েকে সচেতন হতে হবে।

কীভাবে সচেতন হবে?

সচেতনতার প্রথম ধাপই হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। এইজন্যই ইস্কুল স্তর থেকেই ছেলেমেয়েদের নিজেদের দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার। যৌনাঙ্গ মানুষের নিজেরই অঙ্গ। তার কার্যকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানকে অশ্লীলতা বলে আখ্যা দিয়ে আসছিল মানুষ। আজ যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লোকে বুঝতে পারছে। একে যৌন শিক্ষা না বলে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বলেই আমি অভিহিত করতে চাই।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য সঙ্গমের সময় কনডোম অর্থাৎ পাতলা রবারের একটি বেলুন দিয়ে যৌনাঙ্গ ঢেকে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে পুরুষের স্পার্ম আর স্ত্রী যোনির ভেতর ঢুকতে পারে না। এজন্য এডস প্রতিরোধের জন্য পুরুষদের কনডোম ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হয়। এটি পশ্চিমী ধ্যানধারণা। কারণ ওদেশে ছেলেমেয়েরা যখন তখন যৌনসঙ্গী বদল করে। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা কেন ওই ধরনের ভোগবাদী জীবন বেছে নেব? কামনাকে প্রশমিত করার একমাত্র উপায় কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকা। কনডোম কখনই ঝুঁকিশূন্য নয়। সুতরাং কনডোম ব্যবহার করলেও সংক্রমণের ও প্রেগন্যান্সির ঝুঁকি থেকেই যায়।

এসব কথা ক্লাসে মাস্টারমশাইরা তো আলোচনা করবেন না। আর বাবা-মায়েরা ভাবেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে এসব বুঝবে এখন তারা খুব ছোট—Immature.

কিন্তু প্রকৃতি তার কাজ ঠিক করে যাচ্ছে। প্রকৃতি তোমাদের অনেক আগে থেকেই প্রজননক্ষম করে দিয়েছে। এর প্রমাণ মাঝে মাঝেই যৌন উত্তেজনা দেখা দেওয়া।

এই যৌন উত্তেজনা প্রশমনের জন্য প্রতিটি ছেলেমেয়েই স্বমেহন বা হস্তমৈথুন করে। পরে আবার শঙ্কিত হয়ে পড়ে এতে যদি শরীরের কোনও ক্ষতি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে পরিমিত স্বমেহনে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। পুরুষের যৌনাঙ্গ থেকে যেটি বেরিয়ে যায় সেটি রক্ত নয়। একধরনের রস। এর মধ্যে কয়েক কোটি শুক্রকীট থাকে। যাদের মধ্যে অন্তত একটি সতেজ কীট নারীর জঠরে ঢুকে ডিম্বকে সিক্ত করে। তা থেকে সন্তানের ভ্রূণ তৈরি হয়ে যায়। এই স্পার্ম (যার মধ্যে শুক্রকীট থাকে) তা বয়ঃসন্ধির সময় থেকে পুরুষের দেহে আপনা-আপনি জন্মায়। বহু ব্যবহারেও তার ক্ষয় হয় না। যেটুকু বেরিয়ে যায় তা আবার তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও কিছু বেশি ভাল নয়। তাই যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখা দরকার তা নাহলে এই সব কুচিন্তা মনের ক্ষতি করবে। মনের ভেতর জাগাবে অপরাধবোধ। মনের ক্ষতি হলেই দেহের ক্ষতি।

যৌন স্বাস্থ্য পালনের জন্য এখন প্রকাশ্যেই ছাত্রছাত্রীদের নানা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। একটি স্যানিটরি ন্যাপকিন কোম্পানি (Whisper) ইস্কুলে ইস্কুলে গিয়ে মেয়েদের মাসিক ঋতু সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছে। বিদেশে আমি এমন অনেক বইপত্র দেখেছি। ওই পুস্তিকা থেকে কিছুটা প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিয়ে এই বই এখানেই শেষ করব। তার আগে কয়েকটি কথা আবার বলি : যৌনতা জীবনের অপরিহার্য

অঙ্গ। বড় হয়ে এ সম্পর্কে বিশদ জানবে। কলেজে যা শেখানো হয় না বইটি পড়লে আরও বিস্তৃতভাবে জানবে। জানা দরকারও।

কিন্তু তোমরা যারা ইস্কুলে পড়ছ তারা এটুকু জেনে রাখো যে যৌনতা খেলা করার বিষয় নয়। প্রকৃতি মানুষকে যৌন ক্ষমতা দিয়েছে সন্তান উৎপাদন বা প্রজননের জন্য। জীবজগতে সব সৃষ্টির পিছনেই আছে পুরুষ ও নারীর মিলন। এই মিলন ছাড়া বংশবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু এর জন্য একটা বয়স আছে। এর কতগুলো সামাজিক নিয়ম কানুন আছে। আইনও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে বিবাহিত নরনারী ছাড়া অন্য পুরুষ-নারীর মিলন নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ সম্পর্ক থেকে সন্তান জন্মালে তার কোনও পিতৃপরিচয় থাকবে না। পশ্চিমদেশের তরুণ তরুণীরা এই নৈতিকতা ও সামাজিক বিধিনিষেধ মানছে না। সেজন্য সে দেশে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অবিবাহিতা মেয়েদের অসংখ্য সন্তান হচ্ছে। এই সব সন্তানরা কিছুটা বঞ্চনার মধ্য দিয়েই বড় হচ্ছে। এজন্য তাদের নানা মানসিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

আমরা ভারতীয়, আমাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা।

আমরা মনে করি না এডস প্রতিরোধের জন্য কনডোম ব্যবহার করলেই আমরা যথেচ্ছ যৌন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারব। এটা পশ্চিমী ধারণা। আমাদের ছেলেমেয়েরা পশ্চিমের কার্বন কপি হয়ে উঠলে তাদের খারাপ দিকটা আমাদের সর্বনাশ করবে। ছেলেমেয়েদের দরকার সংযম।

তাহলে এবইতে এতক্ষণ ধরে যা বললাম সবই বৃথা প্রতিপন্ন হবে।

আমি চাইব আমাদের ছেলেমেয়েরা সুস্থ স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছল ও স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল নাগরিক হয়ে উঠুক। সেজন্য তাদের সুস্থ জীবন নৈপুণ্য গড়ে তুলতে হবে যার ভিত্তি হবে মূল্যবোধ।

মেয়েদের সব সংশয় দূর করছেন একজন ডাক্তার

প্র. ঋতুস্রাব কি একধরনের রোগ?

উ. মোটেই নয়। ঋতুস্রাব মেয়েদের সবচেয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক ঘটনা। এটি ৯ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে সব মেয়েদেরই হয়, এবং চলে ৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত।

প্র. ঋতুস্রাবের সময়ে নির্গত রক্ত কি বদরক্ত?

উ. কথাটা সত্যি নয়। ঋতুস্রাবের সময়কালীন রক্ত হ'ল তোমাদেরই শরীরের রক্ত ও টিস্যুর এক মিশ্রণ। তোমাদের শরীর প্রতি ২৮ দিন অন্তর এই অবাঞ্ছিত টিস্যু ও রক্ত বার ক'রে দেয়, যদি না কেউ গর্ভবতী হয়।

প্র. ঋতুস্রাবের সময়ে আমাদের শরীরে কি দুর্গন্ধ হয়?

উ. কিছু ক্ষেত্রে এই তরল পদার্থটি থেকে দুর্গন্ধ আসতে পারে, তবে নিয়মিতভাবে প্যাড বদলালে আর নিজেকে পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে সচেতন হলে এ সমস্যা সহজেই সামলানো যায়।

প্র. ঐ দিনগুলোয় রান্নাঘরে ঢোকা কি অস্বাস্থ্যকর?

উ. যতক্ষণ তুমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকছ এবং যতক্ষণ না তোমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা উঠছে, তুমি রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া, পরিবেশন এবং যা মন চায় তাই করতে পারো। রান্নাঘরে এসময় না ঢোকার কোনো বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই।

প্র. ঐসব দিনে আচার খাওয়া কি স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ?

উ. ঋতুস্রাব হ'ল জীবনেরই একটি অঙ্গ। তাই তোমার ঋতুস্রাবের দিনগুলিতেও তুমি অন্যসময়ে যা সাধারণত খাও তাই খেতে পারো। ঐ দিনগুলিতে কোনো বিশেষ খাদ্যসূচি মেনে চলার দরকার নেই।

প্র. ঐ দিনগুলোতে পরিবারের সবার থেকে কি আলাদা বসে খাওয়াদাওয়া করা উচিত?

উ. কেন তা করবে? ঋতুস্রাব তো কোনো অভিশাপ নয়। মাসের ঐসব দিনেও তুমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারো।

প্র. ঐসব দিনে কি স্নান করা বা চুল ধোয়া অনুচিত?

উ. আদৌ নয়। বরং ঐ দিনগুলিতে তোমার নিজেকে পরিষ্কার রাখা আর স্নান করার বিষয়ে আরো বেশি সচেতন হতে হবে, যাতে তুমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শুকনো আর সুস্থ থাকো।

প্র. ঐসব দিনে কি ধর্মীয়/সামাজিক কাজকর্ম করা অনুচিত?

উ. ঋতুস্রাব হ'ল স্বাভাবিক জীবনের এক অঙ্গ এবং তাই দৈনন্দিন কাজকর্ম ক'রে চলা উচিত। তুমি যখন ইচ্ছে ভগবানকে ডাকতে পারো। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যতক্ষণ তুমি নিজে তা উপভোগ করছ। কিছু-কিছু পরিবারে বিধিনিষেধ থাকে বটে, তবে তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত বা মনোবৈজ্ঞানিক কারণ নেই।

প্র. ঐ দিনগুলোয় খেলাধুলা করায় কি ঝুঁকি আছে?

উ. আবারও ভুল করছ। ঐসব দিনে তোমরা খেলাধুলা, বেড়াতে যাওয়া, বেরোনো এমনকী, ব্যায়ামও করতে পারো। শুধু দেখো এসবের দরুন পেটের ওপর যেন খুব বেশি চাপ না-পড়ে।

প্র. ব্যবহৃত প্যাড অথবা ঋতুমতী কোনো মেয়ের ওপর দিয়ে কাক উড়ে যাওয়াটা কি অশুভ?

উ. এর কোনো ব্যাখ্যাই নেই এবং এটি একটি নিছক কুসংস্কার। এসব নিয়ে অযথা না ভেবে পড়াশুনায় মন দাও।

প্র. একটি ছেলে একটি মেয়েকে ছুঁলে বা চুমু খেলে কি মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে?

উ. ঐসব দিনে ছোঁয়ার সঙ্গে গর্ভবতী হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। একটি মেয়ে তখনই গর্ভবতী হয়, যদি সে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়।

প্র. **ঋতুস্রাব কি শুধুমাত্র বিয়ের পরেই ঘটে?**

উ. না। ঋতুস্রাব হয় ৯ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। এর সঙ্গে বিয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এ হ'ল এক হর্মোনাল পদ্ধতি যা তোমার শরীরের মধ্যে ঘটে।

প্র. **প্যাডগুলি কি শুধু বাড়ির বাইরে ব্যবহারের জন্যেই?**

উ. মোটেই না। বাড়িতেও প্যাড ব্যবহার করা উচিত। ওগুলি তোমাকে পরিচ্ছন্ন, শুকনো আর স্বাস্থ্যসম্মত রাখে। আর তোমার ঋতুস্রাবের দিনগুলিতে তোমার সবসময়েই স্বাস্থ্যসম্মত সুরক্ষার প্রয়োজন, তা সে তুমি ঘরে-বাইরে, যেখানেই থাকো।

প্র. **আমি ভাবতাম ভেজাভাব থেকে জীবাণু কখনোই জন্মাতে পারে না?**

উ. কথাটা ঠিক নয়। তোমার শরীরের যে কোনো অংশ ভিজে থাকলেই তা থেকে জীবাণুরা জন্মাতে পারে, যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ভেজা হাত-পা খুব বিশ্রীভাবে ফেটে যায়। ভেজা জামাকাপড়ও তোমার ক্ষতি করে। ভেজা চুলও সমানভাবে খারাপ। ঐসব দিনে তোমার গায়ে লেগে-থাকা একটানা ভেজাভাব অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারে।

প্র. **প্যাডগুলো ফেলে দেওয়া কি কঠিন কাজ?**

উ. একেবারেই না। শুধু ওগুলো কাগজে মুড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দাও। কখনও ফ্লাশ কোরো না, কারণ যাতে ড্রেনের মুখ আটকে যেতে পারে।

প্র. **কেবল অপরিষ্কার আর নোংরা লোকেরই সংক্রমণ হয়?**

উ. তার কোনো মানে নেই। তবে ঐসব দিনে পরিষ্কার থাকার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো থাকারও দরকার।

প্র. **রক্তশূন্যতা কী? এটা কি খুব প্রচলিত? এ সমস্যা হলে কী করব?**

উ. রক্তশূন্যতা হ'ল রক্তের অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা কমে যাওয়া, এবং আয়রনের পরিমাণ কমে গেলে এটি দেখা দেয়। কাউকে অসুস্থ বা ফ্যাকাসে দেখালে বুঝবে সে রক্তশূন্যতায় ভুগছে। প্রজননের বয়সের মেয়েদের মধ্যে এটি খুব বেশিমাত্রায় দেখা যায়। রক্তশূন্যতা সারানোর সেরা উপায় হ'ল তাকে প্রতিরোধ করা। যদি খুব বেশি স্রাব হয় তাহলে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যসূচি মেনে চলে, আর ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একে প্রতিরোধ কোরো। যদি তুমি আগে থাকতেই রক্তাল্পতায় ভোগো, তাহলে মৌখিকভাবে আয়রন বড়ি খেতে সুপারিশ করা হয়।

সৌজন্য স্বীকার : হুইসপার

পরিশিষ্ট

তোমার প্রতিদিনের আদর্শ রুটিন

ভোর ৬টা—	ঘুম থেকে ওঠা। প্রাতঃকৃত্য অন্তত পাঁচমিনিট ধরে টুথব্রাশ করা। এক গেলাশ ঠাণ্ডা জল পান।
৬টা ৩০ মি. থেকে ৭টা—	ব্যায়াম। দৌড়নো। যোগাসন অথবা স্কিপিং। এই সময় গান শোনা যেতে পারে।
৭টা থেকে ৭টা ৩০মি.—	প্রাতরাশ। খবরের কাগজে চোখ বোলানো।
৭টা ৩০ থেকে ৮টা ৩০ মি.—	স্কুলের পড়া রিভিশন।
৮টা ৩০-৯টা ৩০মি.—	স্নান ও আহার।
৯টা ৩০ মি.—	স্কুল বাস ধরা। ** যাদের আরও আগে ইস্কুলে বেরুতে হয় তাদের ক্ষেত্রে ভোর ৫টায় শয্যাত্যাগ করে রুটিনটা এগিয়ে আনতে হবে।*
৪টা—	স্কুল থেকে ফেরা, টিফিন।
৪টা ৩০-৫টা—	খবরের কাগজ পড়া।
৫-৬টা—	টিভি দেখা
৬-৬টা ৩০মি.—	প্রার্থনা। অথবা শবাসনে শুয়ে রেডিওর গান শোনা।
৬টা ৩০ থেকে ১০টা—	স্কুলের বই পড়া।
১০টা ১১টা—	রাতের ডিনার খেতে খেতে টিভি দেখা। গল্পের বই-এর একটি পরিচ্ছেদ পড়া।
১১টা—	ঘুমতে যাওয়া। তার আগে আবার টুথ ব্রাশ করা।

রবিবার ও ছুটির দিন রুটিনকে ইচ্ছামতো করা যাবে। চিঠিপত্র লেখা, ইন্টারনেট সার্ফিং, গল্পের বই পড়া। বিকেলের দিকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা অথবা খেলাধুলা। ছবি আঁকা, গান শেখা, সাঁতারের জন্য সপ্তাহে দুটি ছুটির দিন নির্দিষ্ট রাখা যেতে পারে।

প্রতিজ্ঞা

শ্রদ্ধা করব :	বৃদ্ধকে, মনুষ্যত্বকে, আইনকে, বাবা-মাকে আর নিজেকে।
ভালবাসব :	পবিত্রতা, সততা, কঠোর পরিশ্রম, অসহায় ব্যক্তি আর প্রকৃতিকে
প্রশংসা করব :	সৌন্দর্য, বুদ্ধিমান ও সৎ চরিত্রের মানুষকে
চর্চা করব :	সমাজ, দেশ ও বিশ্ব।
হব :	সাহসী, হাসিখুশি ও সন্তুষ্ট।
রক্ষা করব :	প্রতিজ্ঞা, বন্ধুত্ব ও মূল্যবোধ।
লক্ষ্য করব :	অপরের কথাবার্তা, সুবক্তার বক্তব্য, ব্যক্তির আচরণ
প্রতিরোধ করব :	আলস্য, মিথ্যা অকারণ বদনাম।

চরিত্র লক্ষণ

আমি করতে পারি, কেন করব?	পলায়নবাদী
আমি জানি না	অলস
যদি করতাম	ভাবুক
কেন করব	স্বার্থপর
চেষ্টা করব	আশাবাদী
আমি পারব	কর্মী
আমি পেরেছি	নেতা

জীবনবাদী-আন্দোলনে শামিল হবার প্রতিজ্ঞা

১.

যাহার প্রতিকার পারি
প্রতিকারে দেব প্রাণমন
যাহার প্রতিকার মোর সাধ্যাতীত
কুণ্ঠাহীন ভাবে তাহা করিব গ্রহণ।

২.

আমি কারও চেয়ে ছোট নই।
'মানুষ'—এই মোর পরিচয়
আমি কারও চেয়ে বড় নই।
আমি আমিই—নেই মোর সংশয়।

দল নয়, গোষ্ঠী নয়, নয় সম্প্রদায়।
আমার ধর্ম মানবতা-মানবের হবে জয়।

৩.

কারও সাথে নিজেকে তুলনা করে
পাব না দুঃখ, পাব না বেদনা মনে,
জাগিয়া উঠেছি নব চেতনার ভোরে
হিসাব মেলাতে যাব না কাহারও সনে।

রোপণ করিব মাটিতে যেমন চারা
তেমনই হবে সে গাছের বাঁচা-বাড়া
আমিই পিছব, যদি না চলি সবার আগে।
সব জীবনেই আছে ওঠা ও পড়া।
নাগর দোলায় কখনও ওপরে,
কখনও নিচে।
সাফল্য নয় মনোভাব হামবড়া।
ব্যর্থ সে নয়, যে থাকে সবার পিছে।

সাফল্য তাই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া
থেমে না থাকা—এইটাই বড় পাওয়া।
শপথ নিলাম বড় হব নিজ চেষ্টায়
দেখে যাব ভাগ্যে কী লেখা আছে শেষটায়।

ছোটদের জন্য এই লেখকের পরবর্তী বই

এখনও সুযোগ আছে

বাংলার তরুণ ও যুব সমাজকে অক্লান্তভাবে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছেন ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সারাদেশের অসংখ্য তরুণ-তরুণী তাঁর বই পড়ে নতুন করে বাঁচতে শিখেছে।

যারা বড় হতে চাও, ইস্কুলে যা পড়ানো হয় না, কলেজে যা শেখানো হয় না-র পর ছোটদের আর একটি জীবনবাদী বই : এখনও সুযোগ আছে। এতে থাকছে চলার পথে নানা বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে কীভাবে একা লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জীবন থেকে নেওয়া অজস্র উদাহরণ যারা নিজেদের শেষ হয়ে গেছে ভেবেছিলেন কিন্তু আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন কেমন করে কীভাবে? কীভাবে চাকরি বাকরির ওপর নির্ভর না করে বহু মানুষ স্বনির্ভর হয়েছেন। ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে যাঁরা অতি সামান্য অবস্থান থেকে বড় ব্যবসা, শিল্প ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

এখন থেকে ভাবো নিজের পায়ে দাঁড়াবার কথা।

দে'জ পাবলিশিং